ত্রয়ী

(গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায় ও প্রিয়ম্বদা দেবী
—তিন কবির জীবনকথা ও কাব্য পরিচয়)

সুপ্রভা মজুমদার

পরিবেষক
অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

রবীন্দ্র সমকালীন তিন মহিলাকবি সম্পর্কে এই আলোচনা গ্রন্থটি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রির গবেষণা-নিবন্ধেরই মুদ্রিত রূপ। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮—১৯২৪), কামিনী রায় (১৮৬৪—১৯৩৩) ও প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১—১৯৩৫) ভিন্ন স্বভাবের তিন কবি-ব্যক্তিত্ব। গিরীন্দ্রমোহিনী কোমল স্বভাবের, চিরকালের বাঙালী মায়ের প্রতিনিধি। সহিষ্ণুতা, বাৎসল্য ও সহজাত প্রীতিবোধ তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। রচনাশৈলীর দিক থেকে তিনি যতটা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছের মানুষ, ততটা রবীন্দ্র-ভাবলোকের আত্মীয় নন। তবু 'জাহ্নবী' পত্রিকার সম্পাদনায় গিরীন্দ্রমোহিনীর কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

কামিনী রায় ঔপন্যাসিক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা; প্রগতিশীল ব্রাহ্ম সমাজের লোক হয়েও গ্রামে চণ্ডীচরণ মেয়ের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন নি। কিভাবে কামিনী রায় সব বাধা জয় করে কৃতী ছাত্রী এবং সুকবি হয়ে উঠলেন, তাঁর কাহিনী যথেষ্ট কৌতূহল জাগায়। 'শ্রাদ্ধিকী' যেমন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের করুণ কোমল অনুভূতির পরিচয় দেয়, তাঁর নাট্যকাব্য 'অম্বা' তেমনি নারীমর্যাদা বিষয়ে কবির স্বাধীন ভাবনা-চিন্তার সাক্ষ্যবহ।

প্রিয়ম্বদা দেবী কবি-মাতা প্রসন্নময়ীর যোগ্য কন্যা। প্রমথ চৌধুরীর ঘরানা তাঁর কাব্যশৈলীকে একটা স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত আবেগের প্রকাশে প্রিয়ম্বদা আজও বিশিষ্ট।

সুপ্রভা মজুমদার শিক্ষকতাসূত্রে দীর্ঘকাল সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত। তিনি লক্ষ্য করেছেন, বনস্পতির আওতায় ভালোগাছেরও বাড়-বাড়ন্ত হয় না। অর্থাৎ মধুসূদন-হেমচন্দ্র ইত্যাদির মহাকাব্যধারার পরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধীরে ধীরে মাথা তুলে সবাইকে আড়ালে রেখে দিলেন। দুই শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁর বহুমুখী সৃষ্টিকর্ম বিস্ময়কর। কিন্তু পাঠকদের দৃষ্টি সম্মোহিত হল ঐদিকে। তাই এ-বইয়ের আলোচ্য তিন কবি এবং আরও অনেকে সমকালে প্রাপ্য সমাদর পান নি।

বর্তমান গ্রন্থের লেখিকা গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী ও প্রিয়ম্বদা সম্পর্কে সশ্রদ্ধ আলোচনার দ্বারা কেবল ঐতিহাসিক কর্তব্যই পালন করেন নি, তাঁদের কাব্য-কৃতিরও বিশদ পরিচয় দিয়েছেন। হারানো সৌন্দর্যের জগৎ যেন হঠাৎ আবিষ্কৃত হল। তথ্য সংগ্রহে লেখিকার প্রযত্ন ও পরিশ্রম এবং কাব্য বিশ্লেষণে তাঁর রসজ্ঞতা বইটির মান বাড়িয়েছে।

বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

রবীন্দ্র গুপ্ত
রীডার, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি সময়ের কবিদের রচনা পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল, তাঁদের সম্পর্কে 'গৌণ-কবি' অভিধাটি কি যথেষ্ট ? ছোট পরিসরে হলেও তাঁদের কবি-কল্পনায় অনেক মৌলিক ভাব প্রকাশ পেয়েছে, যেগুলি উপেক্ষার যোগ্য নয়। তাঁদের মধ্যে মাত্র তিনজন কবিকে বিশেষ আলোচনার জন্য বেছে নিই। যদিও গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায় বা প্রিয়ম্বদা দেবী খুবই নিকট অতীতের, কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানেই তাঁদের জীবন সম্পর্কে তথ্যাদি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। এমনকি এঁদের কাব্যগ্রন্থও দুর্লভ ; কোন এক জনেরও রচনাবলী বাজারে চালু নেই।

ড. রবীন্দ্র গুপ্তের নির্দেশনায় 'ত্রয়ী' কবি বিষয়ে গবেষণা নিবন্ধটি রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি (আর্টস) লাভ করে (১৯৮৫)। অন্য দুজন পরীক্ষক ছিলেন ড. জীবেন্দ্র সিংহ রায় এবং ড. চিত্তরঞ্জন লাহা। উক্ত তিনজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। গবেষণা কর্মে নানাভাবে সহায়তা করেছেন শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, সিন্ধু মিত্র, ড. গোপাল মিত্র, মহেন্দ্র মিত্র, ড. জগন্নাথ চক্রবর্তী। শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজের সাহায্য ছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগারের দুর্লভ পত্রপত্রিকা পাওয়া সম্ভব ছিল না।

এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চৈতন্য লাইব্রেরী ও জাতীয় গ্রন্থাগারে অনেক দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার ফাইল দেখেছি। এই সুযোগে বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্য পরিষদ কর্মীদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে পথিক চক্রবর্তী ও অরুণা চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ভানুস্মৃতা ঘোষ, বাবু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মালা ঘোষ দস্তিদারের সহযোগিতা স্মরণীয়। উৎসাহ দিয়েছেন বেলা ঘোষ, শাশ্বতী ঘোষ, শুভ্রা ঘোষ। শ্রীযুক্তা নমিতা ঘোষের উৎসাহ ও প্রেরণা শেষের কাজ ত্বরান্বিত করেছে।

এই গ্রন্থে ত্রয়ী কবির যে পরিচয় উপস্থিত করা হল, সুধী কাব্যরসিকদের কাছে তা যদি তৃপ্তিদায়ক হয়, তাহলেই আমার প্রয়াস সার্থক মনে করব।

বিনীতা

সুপ্রভা মজুমদার

সূচীপত্র

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

জীবনকথা

"বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্গ সমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল।"[১]

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে বিপিন চন্দ্র পালের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট গিরীন্দ্রমোহিনীর জন্ম হয় তাঁর মাতুলালয় ভবানীপুরে। এছাড়া আরো দুজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীর জন্ম বঙ্গমাতার গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। এঁরা দুজন আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র; যথাক্রমে ১৮৫৮ ও ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যেকের জীবনেই কমবেশি এই মাহেন্দ্রক্ষণের স্পর্শ লেগেছিল। রবীন্দ্রনাথ কালজয়ী পুরুষ। বিপিন চন্দ্র পালও স্বনামধন্য। আর গিরীন্দ্রমোহিনী নারীমুক্তির উষাযুগে স্বকৃত চেষ্টায় যে সাহিত্য সাধনা করেছিলেন, তাও উপেক্ষণীয় নয়।

রেনেসাঁসের আলো গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে নারীর চেতনালোককে স্পর্শ করেছিল। তাঁদের সাহিত্য প্রচেষ্টা কম বিস্ময়কর নয়। গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবন পর্যালোচনায় এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত হবে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর পিতা হারাণচন্দ্র মিত্র বারুইপুর কোর্টের এডভোকেট ছিলেন। তাঁর আদি নিবাস পানিহাটি বা পেনেটিতে। সেখানকার বাস তুলে সিমুলিয়ায় গৃহ নির্মাণ করে চলে আসেন। বিবাহ হল মজিলপুরের দত্তবাড়িতে। ওখান থেকে বারুইপুর কোর্টে যাতায়াত সুবিধা হবে বলে শ্বশুরের কথামত মজিলপুরে বসবাস শুরু করেন।

মজিলপুরের বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণের জন্য কর্তৃপক্ষ ১৩২০ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীকে অনুরোধ করেছিলেন। এই অনুরোধ রক্ষার জন্য তিনি গিরীন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃসদন ও মাতুলালয়ে যান এবং সেখানে দু'দিন কাটিয়ে আসেন।

তাঁর বর্ণনায় মজিলপুরের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়,—

"মজিলপুরের প্রাসাদ আমার বড় সুন্দর লাগিল। সেকালের জমিদারদের বাসভবন কিরূপে নিরাপদ দুর্গরূপে নির্মিত হইত এই প্রাসাদ দেখিলে তাহা বেশ

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২০২, নিউ এজ পাবলিশার্স, ২য় সংস্করণ।

বুঝা যায়। পরিখা বেষ্টনের মধ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশের প্রথম পথ একটি বৃহৎ সিংহদ্বার। দ্বার দিয়া কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিলে যে প্রাসাদ নজরে পড়ে তাহা বহির্ভবন ; এ ভবনও একটি মাত্র প্রবেশ দ্বারে সুরক্ষিত, এই প্রাসাদের উঠানে দালান প্রভৃতি আবার আর এক কম্পাউণ্ড ও অন্য প্রাসাদ। এইরূপ কম্পাউণ্ডের পর কম্পাউণ্ড, প্রাসাদের পর প্রাসাদ এক একখানি বৃহৎ প্রবেশদ্বার সুরক্ষিত হইয়া যেন কৌটার মধ্যে কৌটারূপে অবস্থিত।

প্রাসাদের পারিপার্শ্বিক কত না ঠাকুর দালান, কম্পাউণ্ডের আশেপাশে কত না রঙ্গমঞ্চ, দোলমঞ্চ দেবদেবীর মন্দির।

কোন বাড়ীরই ঘরগুলি সেকালে ধরণে ঘুবচি খুবচি নহে। বেশ বড় বড় হাওয়া রৌদ্র খেলিবার উপযুক্ত। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদ এখন ভিন্ন ভিন্ন শরিকের ভাগে পড়িয়াছে। ইচ্ছা করিলেই এক শরিক অন্য শরিকের বাড়ী যাতায়াত করিতে পারেন অথচ সকলেই দূরে দূরে আছেন।

আমি ছিলাম সখীর বহির্প্রাসাদে। শুনিলাম বঙ্কিমবাবু যখন এই অঞ্চলের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন তিনি এইখানে আসিয়া থাকিতেন এবং এই প্রাসাদের আদর্শেই নাকি তিনি বিষবৃক্ষের প্রাসাদ রচনা করিয়াছিলেন।

মজিলপুর বহু বিদ্বান ব্রাহ্মণ ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থের বাসস্থান। রামায়ণ অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবর হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং খ্যাতনামা শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্মস্থানও এইখানেই।

প্রাসাদেরই একটি দালানে মজিলপুরের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। গিরীন্দ্রমোহিনীও এইখানেই পড়িতেন।"[১]

মজিলপুরের জমিদারভবনের সেদিনকার সেই সৌন্দর্য আজ আর নেই। খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত সেদিনকার সেই প্রাসাদ যেন এক একটি পাড়া। কত অলিগলি! অথচ একদিন যে এর ঐশ্বর্য ছিল, গেট দিয়ে ঢুকে বিরাট চত্বর, শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দির ও স্বর্ণকুমারী বর্ণিত থামওয়ালা বাড়িটা (আজ যতই হতশ্রী হোক) দেখলে বোঝা যায়।

গিরীন্দ্রমোহিনীর ভ্রাতুষ্পুত্র সিন্ধু মিত্র বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জীবনে মজিলপুরের বাড়িতে অবস্থান করছেন। তিনিই লেখিকাকে বলেছেন, '১৭২ ঘর জ্ঞাতির মধ্যে এখন (১৯৮২) ১৫ ঘরের বাসিন্দা বর্তমান। পুরো একটা গ্রামের মত জমিদার বাড়ি বিভিন্ন স্থানে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। সুযোগ পেলেই চোর ইঁট, কাঠ শুদ্ধ খুলে নিয়ে যায়।'

তাঁর কাছেই শোনা যায়, 'গিরীন্দ্রমোহিনীর মা তাঁর পিতার একমাত্র কন্যা ছিলেন। খুঁজে পেতে শিক্ষিত, উপযুক্ত পাত্রের হাতে কন্যাকে অর্পণ করেছিলেন

এবং কন্যা, জামাতাকে নিজগৃহেই রেখেছিলেন।০ পরে দৌহিত্রগণকে সম্পত্তির ভাগও দিয়েছিলেন।'

দত্তবাড়ির বধূ এক বৃদ্ধা বললেন, 'দত্তবংশের জমিদারগণ অধিকাংশই অপুত্রক। সুতরাং সম্পত্তি দৌহিত্র এবং তাঁর বংশধরেরা ভোগ করেছেন।' দীর্ঘদিনের প্রাসাদ সংস্কারের অভাবে ভেঙে পড়ছে। অন্যদিকে কত ছোট ছোট বাড়ি গড়ে তুলছেন নতুন নতুন ভাগীদার।

বৃদ্ধা আগ্রহ করে দেখালেন বেলতলায় যে ঘরটিতে বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘদিন বাস করেছেন। ঐ ঘরে বসে নীচের দুর্গামণ্ডপ দেখা যায়। 'বন্দেমাতরম' কবিতাটির হয়ত ওখানেই জন্ম।

সিন্ধু মিত্রের কথায়, 'গিরীন্দ্রমোহিনী যে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং যেখানে পরে স্বর্ণকুমারী দেবী পুরস্কার বিতরণের জন্য গিয়েছিলেন, সেই বিদ্যালয়টি ত্রিশ বছর যাবৎ উঠে গেছে।'

এখানকার বৃদ্ধ, বিদগ্ধ গোপেনকৃষ্ণ বসুর কাছে জানা গেল, গিরীন্দ্রমোহিনীর বালিকাবয়সে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপক্রম করতেই কয়েকজন শিক্ষা-বিরোধীর চেষ্টায় ঐ গৃহটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। কিন্তু হারাণচন্দ্র মিত্র এতে বিন্দুমাত্র দমেন নি। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি তখন জমিদার বাড়ির ভিতরেই বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং শিক্ষাদানের জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। এখানেই গিরীন্দ্রমোহিনীর বাল্যশিক্ষা হয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভগ্নী তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন। শিশু বয়সেই শিক্ষার প্রতি গিরীন্দ্রমোহিনীর ছিল গভীর অনুরাগ। বই পড়েই অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিতেন। বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাঁর ভাগ্যেই জুটত। শিশুকাল থেকেই আরেকটি গুণের বিকাশ দেখা গিয়েছিল : তিনি অত্যন্ত পরদুঃখকাতর ছিলেন। কারোর দুঃখ অভাবেই তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। একদিন তাঁর এক সহপাঠিনী কান বিঁধিয়ে কানে সুতো পরে এসেছিল। কানে সুতো পরবার কারণ জিজ্ঞেস করাতে সে উত্তর করল, "আমরা গরীব মানুষ, সোনার মাকড়ি কোথা পাব ভাই তোমাদের মত?" গিরীন্দ্রমোহিনীর শিশুহৃদয় এত বিচলিত হয়ে ওঠে যে, তৎক্ষণাৎ নিজের কানের মুক্তোর মাকড়ি খুলে তার কানে পরিয়ে দেন। মায়ের অনুমতির অপেক্ষাতে থাকতেন না, জামা, কাপড় গরীবদের বিলিয়ে দিতেন। মা কিছু বললে সকাতরে বলতেন, "ওদের যে নেই মা।"

শিশুবয়স থেকেই গিরীন্দ্রমোহিনীর পাঠে ছিল অখণ্ড মনোযোগ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যশক্তির বিকাশ দেখা যেতে লাগল। কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে বালিকা উত্তর করতেন,

"আমার নামটি বাবু চাঁদা
পাখি মারি, ভাত খাই, চোখে লাগাই ধাঁধা।"

পিতা হারাণচন্দ্র কন্যার শিক্ষা বিষয়ে খুব আগ্রহী ছিলেন। তাঁর নানাবিধ

শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ফলিত জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন গিরীন্দ্রমোহিনী।

পিতা কন্যার কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে তাকে বিকাশিত করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজে ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখতেন মাঝে মাঝে। গিরীন্দ্রমোহিনীর বারো বছর বয়সে পিতা একটি কবিতা তর্জমা করে শুনিয়েছিলেন, তিনি এটিকে ছন্দোগাথা করে পিতাকে দেখিয়েছিলেন। এই কবিতাটি পরে 'তপোবন' নামে 'ভারতকুসুমে' প্রকাশিত হয়েছিল। হারাণচন্দ্র তখন পরম উৎসাহে কন্যার কল্পনাবিকাশের জন্য Paul and Virginia, Theodosius, Constancia প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে শোনাতেন। এগুলি এবং মাতামহীর সংগৃহীত 'মহানাটক', 'কোকিল দূত', 'যোজনগন্ধা', 'বাসবদত্তা', 'ইসফজোলেখা', 'কবিকঙ্কণ চন্ডী' প্রভৃতি গিরীন্দ্রমোহিনীর কবি প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হয়ে ওঠে।

দশ বছর বয়সে গিরীন্দ্রমোহিনীর বিবাহ হয় বউবাজার নিবাসী বিখ্যাত ধনী জমিদার ও অক্রূরচন্দ্র দত্তের প্র-পৌত্র নরেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে। তিনি দুর্গাচরণ দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র।

নরেশচন্দ্র বিবাহের পরে স্ত্রীর বিদ্যানুরাগের পরিচয় পেয়ে, এ বিষয়ে সাহায্যের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি নিজে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে উৎসাহী ছিলেন। নরেশচন্দ্র নিজেই স্ত্রীকে ইংরাজী শেখাতেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই গিরীন্দ্রমোহিনী পড়া ছেড়ে দিলেন। বিশাল পরিবারের অনেকেই গৃহবধূর এই পড়াশুনার ব্যাপার প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন নি। স্বামীর অনুযোগের উত্তরে বলেন. "গুরু মহাশয়ের কাছে না পড়িলে বিদ্যাশিক্ষা হয় না।"

বিয়ের পর লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটলেও স্বামীর উৎসাহে তিনি রীতিমত কাব্যচর্চা আরম্ভ করেন। এ সময় বহু পত্র পদ্যে লিখেছেন। স্বামীকে লেখা কয়েকটি পত্র পুস্তিকাকারে বেরোয়, 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' নাম দিয়ে। গোপন পত্র এভাবে প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় তিনি রীতিমত বিরক্ত হন। এরপর থেকে তিনি আজীবন কাব্য সাধনা করেন। 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' প্রকাশের পরের বছর প্রথম কবিতার বই 'কবিতাহার' প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে।

ইতিমধ্যে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে চোদ্দ বছর বয়সে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় গিরীন্দ্রমোহিনী পড়ে যান। আট মাসে একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে তিনি নিজেও মৃত্যুর মুখোমুখি হন। গিরীন্দ্রমোহিনীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন সেই সময়কার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ মহেন্দ্রলাল সরকার। বহু যত্ন ও পরিশ্রমে মহেন্দ্রলাল জীবন মরণের সীমানা থেকে গিরীন্দ্রমোহিনীকে ফিরিয়ে আনেন। সকলেই যখন প্রসূতির জীবনরক্ষায় ব্যস্ত, নবজাত শিশুটিকে মৃত ভেবে একপাশে ফেলে রেখেছিল, সে সময় ডাক্তারের দৃষ্টি তার প্রতি পড়ে। শিশুটির মধ্যে জীবনের লক্ষণ দেখে তাকে কোলে নিয়ে অদ্ভুত চিকিৎসাবলে সুস্থ করে তোলেন। এই শিশুটিই গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম

সন্তান প্রকাশ চন্দ্র দত্ত। মহেন্দ্রলাল মাঝে মাঝে বলতেন, "ছেলেটি আমার, তোমরা ও ছেলেকে ফেলিয়া দিয়াছিলে।" গিরীন্দ্রমোহিনী এই স্নেহের অধিকার স্বীকার করতেন এবং গদ্যে পদ্যে লিখিত একটি চিঠিতে তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।[১]

অনেকের ধারণা 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী'র পঞ্চমটি এই পত্র।[২] প্রথম চারটি স্বামীকে লেখা।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'কবিতাহার' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ও বাংলা বহু পত্র-পত্রিকা উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধারায় অভিনন্দন জানান এই কিশোরী কবিকে। স্বয়ং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র অকুণ্ঠ প্রশংসায় সাহিত্যে এই নবীনাকে ধন্য করলেন। দীনবন্ধু মিত্র তো তাঁর রচনাবলীই কবিকে উপহার দিলেন।

এই অভাবিত যশোলাভে স্বাভাবিক ভাবেই কিশোরী কবি প্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু ঘরের বধূর এমনভাবে আত্মপ্রকাশ রক্ষণশীল পরিবারের অনেককেই বিরূপ করেছিল। তাই দ্বিতীয় কাব্য প্রকাশিত হয় দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে। নরেশচন্দ্রের প্রবল উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় গ্রন্থ দশ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। এবারও কবির ভাগ্যে জুটল যশের শিরোপা। এরপর তাঁর কাব্য রচনা আর থামেনি।

গিরীন্দ্রমোহিনীর স্বভাব মাধুর্য ছিল অতুলনীয়। নম্র, ধীর এই তরুণী বধূর গর্ব বা আত্মম্ভরিতা ছিল না। সুদক্ষ, গম্ভীর গৃহিণী হওয়া তাঁর কোন কালেই হয়ে ওঠেনি। তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'ভারতী'র সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই স্বাভাবিক, সেখানে এমন বন্ধুত্ব প্রায় অচিন্তনীয়। তাঁদের এই সখিত্ব আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। স্বর্ণকুমারী স্বরচিত 'স্নেহলতা' গিরীন্দ্রমোহিনীকে উৎসর্গ করেছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর 'শিখা' স্বর্ণকুমারীকে নিবেদিত।

গিরীন্দ্রমোহিনীর মৃত্যুর পর স্বর্ণকুমারী তাঁর স্মৃতিচারণে সখির কবি-হৃদয়ের নম্র-মাধুর্যের পরিচয় দিয়েছেন, "কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর সহিত আমার মিলন পাতানো ছিল। মানুষে মানুষে মনের মিলন এখন কদাচিৎ ঘটে। যে সুন্দর মনোমোহন রূপে তিনি আমাকে ধরা দিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণও সকলে তাঁহাকে সেরূপে দেখিয়াছেন কিনা জানিনা। কারণ সমাজের বাহিরে মুক্ত সখ্যতার নির্ম্মল আলোকে আমি দেখিয়াছি, কবি-হৃদয়ের খোলসহীন যে সৌন্দর্যটুকু— সমাজের বেড়া, সংস্কারের, স্বার্থ-সংঘর্ষণের বেড়ার ভিতর দিয়া নিকটের লোকের নয়নে তাহা সহসা না পড়িবারই কথা। আটেঘাটে বাঁধা সেকালের সংস্কারে লালিত-পালিত হইয়াও স্বাধীন বিচার শক্তির অভাব তাঁহাতে দেখি নাই; তাঁহার

১। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, গিরীন্দ্রমোহিনীর বাল্যরচনা, মানসী ও মর্ম্মবাণী, কার্ত্তিক, ১৩৩২ থেকে সংগৃহীত।

২। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

চিন্তার পরিসর ছিল প্রকৃতই মুক্ত, উদার। বলিতে কি, সংকীর্ণতার ভাব-দ্বন্দ্বের মধ্যে কোনদিনই আমাদের মতবিচ্ছেদ ঘটে নাই। তাই বুঝি আমাদের সখ্যতা-সম্বন্ধ এমন মধুর স্থায়ী হইয়াছিল। মিলন দিনে আমরা কি আনন্দই না উপভোগ করিতাম। দেখা হইলেই নীরব উল্লাসিত দৃষ্টিতে উভয়ের প্রাণ যেন কোলাকুলি করিয়া উঠিত। তাহার পর তাঁহার পালায় তিনি আমার হাত ধরিয়া সাগ্রহ সমাদরে পালঙ্ক একখানির উপর বসাইতেন, আর আমার পালাতে আমিও সেইরূপ সাদর যত্নে তাঁহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া আমার ঘরের শ্রেষ্ঠ শোফাসনের উপর তাঁহার শুভ প্রতিষ্ঠা করিতাম। অতঃপর মুখোমুখি হইয়া বসিবামাত্র দু'জনের অদর্শন-কালের মনের চাপা উৎস খুলিয়া যাইত। কত না রঙ্গরস রহস্যে, কত না গোপন মনের কথায়, প্রকাশ্য সুখ-দুঃখ কাহিনীতে, সমাজ এবং কাব্য-সমালোচনায় দিবসের আলো ক্রমশঃ যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘনীভূত হইয়া পড়িত তখনো কিন্তু আমাদের কথা ফুরাইত না; বিদায় লইতে মন চাহিত না।"[১]

পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে স্বর্ণকুমারী গিরীন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে তাঁদের মজিলপুরের বাড়িতে দু'দিন ছিলেন। সেই সুখস্মৃতি স্বর্ণকুমারী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। "মজিলপুরে অবস্থানের এই স্বল্প সময়টুকু সখীর আত্মীয়গণের আন্তরিক আত্মীয়তাপূর্ণ সমাদর যত্নে পরমসুখে কাটিয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের সেই অকৃত্রিম প্রীতি সৌজন্য আমার জীবনপাতে চির মুদ্রিত থাকিবে।

এই স্বল্পসময় সখী গিরীন্দ্রমোহিনীকে আমি যেরূপ প্রাণ ভরিয়া পাইয়াছিলাম, পূর্বে সেরূপ সুযোগ আর কখনও ঘটে নাই। আহারে, বিহারে, শয়নে, ভ্রমণে আমরা সাথী ছিলাম। অল্পক্ষণের নিমিত্তও তিনি আমার চোখের আড়াল হইলে তৃষিত চিত্তে আমি তাঁহার পথ চাহিয়া থাকিতাম। কাছে আসিলে তখন কি পরিতৃপ্তি।"[২]

গিরীন্দ্রমোহিনী ও স্বর্ণকুমারী গভীর হৃদ্যতায় আবদ্ধ ছিলেন চিরদিন। স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে যোগাযোগে গিরীন্দ্রমোহিনীর অন্তঃপুরের বাইরে এসে জীবনের পথে স্বচ্ছন্দগতি হওয়া সম্ভব হয়েছিল। গোবিন্দলাল দত্ত রক্ষণশীল নীতির সমর্থক হলেও প্রকৃত গুণানুরাগী ছিলেন। স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনীর ঘনিষ্ঠতা হলে দত্ত পরিবারের অনেকেই তাঁর গুণে আকৃষ্ট হলেন। স্বর্ণকুমারীর গৃহে যাতায়াতে গিরীন্দ্রমোহিনীর বিঘ্ন কেটে গেল।

মাত্র দশ বছর বয়সে গিরীন্দ্রমোহিনী বধূরূপে দত্ত বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি স্বামীর ছায়াসঙ্গিনী ছিলেন বললেই হয়। নরেশচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় জীবনের দীর্ঘ সময় কখনও প্রবাসে, কখনও স্বাস্থ্যনিবাসে কেটেছে।

মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ১৮৮৪ খ্রীঃ (১২৯০ সাল) গিরীন্দ্রমোহিনী স্বামীকে

১। ভারতী, আশ্বিন, ১৩৩১

২। ভারতী, আশ্বিন, ১৩৩১

হারালেন। দুঃসহ শোকে তাঁর জীবন তখন দুর্বহ প্রায়। কবিতা রচনাই ছিল এই দুঃখের হাত থেকে মুক্তির উপায়। 'অশ্রুকণা' তাঁর গভীর অন্তর্বেদনার বাণীবহ। বেদনা-নির্যাসের মর্মকথাই তাঁকে খ্যাতি ও সম্মানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করল। দুঃখের ছায়াবৃত পথে জীবনের যে যাত্রাপথ সূচিত হয়েছিল স্বামীর মৃত্যুতে, তাকে অনেকটাই সুগম করেছিল সে যুগের মনীষীদের অভিনন্দন। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশের পর থেকে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'অশ্রুকণা'র চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এ থেকেই 'অশ্রুকণা'র সমাদর বোঝা যায়। দ্বিতীয় সংস্করণে বাড়তি লাভ কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর প্রশংসা ভরা কবিতার সংযোজন।[১] অক্ষয়চন্দ্র লিখেছিলেন,

"তাঁর কাব্য পড়িতে পড়িতে এমন মনে হয় না যে, তিনি কাগজ কলম লইয়া কখনো কবিতা লিখিতে বসিয়াছিলেন—যেমন শিশিরকণা দূর্বাদলে পড়িয়া মুক্তা-রূপে ফুটিয়া উঠে, সেইরকম গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যে তাঁহার কল্পনার উচ্ছ্বাসগুলি যেন অক্ষররূপে পরিণত হইয়াছে। কল্পনা 'স্নিগ্ধ বিদ্যুতের' ন্যায় উজ্জ্বল, অথচ তীব্র নহে, লীলাময়ী অথচ দুরন্ত নহে, মুগ্ধকরী অথচ মর্ম্মভেদী নহে।"

মনস্বী চন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন,

"This is poetry in life and as expression of that poetry Asrukana is the history of the soul of a noble Hindu woman.' সাহিত্য জগৎ থেকে এভাবে স্বীকৃতি, সম্বর্ধনা সেকালে রক্ষণশীল দত্ত পরিবারের অনেকেই সু-নজরে দেখেননি। গিরীন্দ্রমোহিনীর কিছু কিছু কবিতাতেও এর আভাস পাওয়া যায়। তবে সাবিত্রী লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দলাল দত্ত প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। 'অশ্রুকণা'র প্রকাশনায় গোবিন্দলালের যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তাঁর আগ্রহেই কবি অক্ষয়কুমার বড়াল 'অশ্রুকণা'র কবিতাগুলির পরিশোধন ও পরি-মার্জনা করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে অক্ষয়কুমার বড়ালের সঙ্গে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল গোবিন্দলাল দত্ত ও গিরীন্দ্রমোহিনীর। গিরীন্দ্রমোহিনীর কয়েকটি কবিতা অক্ষয়কুমার আত্মসাৎ করেন, এমন অভিযোগও ওঠে। 'নববিভাকর সাধারণী'র সম্পাদক অক্ষয় চন্দ্র সরকারও একথা স্বীকার করেন। এ নিয়ে উক্ত পত্রিকায় দীর্ঘ বাদানুবাদ হয়েছিল।[২]

যাহোক, সাহিত্য জগতের স্বীকৃতিতে গিরীন্দ্রমোহিনীর আত্মবিশ্বাসে এল পরিপূর্ণতা। এরপর সারাজীবন তাঁর কঠোর কাব্য-সাধনার ইতিহাস। 'অশ্রু-কণা'র যুগেই অন্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি আদর্শে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই তিনি পুত্রদের নিয়ে বউবাজার থেকে

১। কবিতাটি পরে সংযোজিত। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁর উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা করে-ছিলেন। সেটিও পরে দ্রষ্টব্য। অশ্রুকণা পাঠান্তে আরেকটি।

২। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

দক্ষিণ কলকাতার সেবক বৈদ্য স্ট্রীটে চলে এসেছিলেন, তাঁর নবনির্মিত গৃহে। তাঁর প্র-পৌত্র ও প্র-পৌত্রীর কাছে শোনা যায়, সুদৃশ্য বাগান ছিল বাড়িতে, হরিণ, ময়ূর ও নানা ধরনের পাখী সে বাগানের বাহার বাড়িয়ে দিয়েছিল। বিক্রী হতে হতে এখন শুধু বসতবাড়িটুকুই আছে।

নানা পত্রপত্রিকায় গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতা অজস্রধারায় প্রকাশিত হতে থাকে। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়—আভাষ (১৮৯০), ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য মীরা (১৮৯২), শিখা (১৮৯৬), অর্ঘ্য (১৯০২), স্বদেশিনী (১৯০৬), সিন্ধুগাথা (১৯০৭)।

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় প্রথম জীবনের তীব্র শোক স্বাভাবিক ভাবেই প্রশমিত হয়ে আসে। 'অর্ঘ্য' রচনাকালে এক ক্লান্ত বিধুরতার সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। কবিতার নাম 'জীবন সন্ধ্যা'—বক্তব্য—

গাহিতে প্রেমের গান আর ত চাহে না প্রাণ
হের ম্লান আলোকের ভাতি ;
দ্বিতীয়ার চন্দ্রলেখা ক্ষীণ বাসনার রেখা
নিশি শেষ নিভ নিভ বাতি।

প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন কবি,—এ জগতের হিসাব নিকাশ চুকিয়ে দিয়ে যেন আরেক জীবনের প্রস্তুতি চলছে মনে মনে। মনে তাঁর গুঞ্জন ওঠে,—

অপূর্ণ বাসনা যত অস্ফুট মুকুল মত
ধূলায় রহিয়া গেল পড়ি।
জীবনের কত ব্রত অসম্পূর্ণ চিত্রমত
হেথা হোথা রল ছড়াছড়ি।

সাহিত্যসৃজন ছাড়াও তাঁর মধ্যে বহুগুণের সমাবেশ ছিল। 'অর্ঘ্যে'র 'চিত্রাঙ্কনে' কবিতায় তাঁর সেই শিল্পচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়।—

রং আর তুলি নিয়ে কাটে সারাবেলা ;
গুরুজনে বলে ওরে একি ছেলেখেলা।
চল্লিশ হয়েছে পার, গিন্নি আখ্যা গৃহে যার,
গৃহধর্ম কাজকর্ম সব অবহেলা
দূর করে ফেল দেখি ছাই ভস্মগুলা।

গৃহ পরিবেশের এই চিত্রে তাঁর সঙ্গে অন্য সকলের মৌল পার্থক্য অনুমেয়। নিজস্ব নবনীড়ে এসে তাঁর সৃজন কর্ম অবাধ মুক্ত ধারার মত অব্যাহত হল।

সাহিত্য কর্ম ছাড়াও বিবিধ শিল্পে তাঁর পারদর্শিতা উল্লেখ্য। রন্ধনাদি গৃহ-কর্মে ছিল অসাধারণ নৈপুণ্য। চিত্রশিল্পে ও মৃৎশিল্পে তাঁর কৃতিত্বের বহু স্বাক্ষর রেখে গেছেন তিনি। অনেক কবিতাকে তিনি চিত্ররূপ দিয়েছেন।

তাঁর শিল্পরচনা সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারী লিখেছিলেন, "গিরীন্দ্রমোহিনী শুধু কবি ছিলেন, এমন নহে, তিনি চিত্রকরও ছিলেন।

তাঁহার হস্তাঙ্কিত নানাভাবের চিত্র এখনো তাঁহার গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চিত্র শিক্ষার অভাবে যদিও নির্দোষ হইতে পারে নাই—তবে তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা খুবই স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

গিরীন্দ্রমোহিনী মাটির পুতুলও বড় সুন্দর গড়িতে পারিতেন, মহিলা শিল্পমেলায় তিনি ও তাঁহার মাতা ভগ্নী নানারূপ পুতুল গড়িয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের গঠিত কুঁড়েঘর দেখিয়া কৃষ্ণনগরের পটুয়া নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া লোকে ভুল করিত। সখি-সমিতির শিল্পমেলা সম্বন্ধে গিরীন্দ্রমোহিনী তাঁহার মিলন কথায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে এখানে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। 'আমাদের মহিলা সমাজে সখি-সমিতির নূতন সৃষ্ট অসূর্য্যম্পশ্যা অবরুদ্ধাদিগের জন্য এক বিশুদ্ধ নরোজার দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছিল, এইরূপ নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ তাঁহারা আর কখনও ইতিপূর্ব্বে উপভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। রমণীতে বেচে, রমণীতে কেনে লেগেছে রমণীরূপের হাট।'

আমার মনে আছে, বেথুনে প্রথম উদ্ঘাটিত শিল্পমেলায় যেদিন মহিলাগণ কর্তৃক মায়ার খেলার অভিনয় হয় এবং মেয়েরা পুরুষের মত সম্মুখ গ্যালারিতে বসিয়া সে অভিনয় দর্শন করেন, সেকি এক নূতন আনন্দ সকলে অনুভব করিয়াছিলেন। মনে আছে, আমারই পার্শ্বোপবিষ্টা একটি মেয়ে বলিয়াছিলেন, 'এরা যদি সকলে চরিত্রবতী হন, তাহা হইলে এমন সুচারু অভিনয় ক্ষমতা প্রশংসাযোগ্য ও ও বাহাদুরির বিষয়।' হায়, হায় যে দেশের মহিলাদের মধ্যে চিত্রকলা, সঙ্গীত ও নৃত্য স্ত্রী-শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল, যে দেশের সতী বেহুলা ইন্দ্রসভায় নৃত্য-গীত করিয়া মৃত পতির জীবন ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, এমন কোন নারীকে কলা-কুশলা দেখিলে, সেই দেশের মহিলাদেরই এইরূপ মনে হয়।

মনে আছে, সখি-সমিতির এই প্রথম সম্পাদিকার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা কয় মায়ে-ঝীয়ে স্বহস্ত নির্ম্মিত নানাবিধ বিচিত্র শিল্পসম্ভার প্রদর্শনীতে পাঠাইতাম। আজ সে দিনও নাই, সে উৎসাহও নাই।"[১]

(ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০)

এমনি করে জীবনকে সার্থকতায় ভরেছিলেন গিরীন্দ্রমোহিনী। গৃহকোণের সংকীর্ণতায়, শোকজালে আবদ্ধ থেকে নিজের সৃজন ক্ষমতার অপচয় হতে দেন নি।

মাঝে মাঝে ওয়ালটেয়ারে গিয়ে থাকতেন। সেখানে তাঁর একটি বাড়ি ছিল। সেখানকার মুক্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য, সমুদ্রের লীলাচঞ্চল রূপ তাঁর বহু কাব্য রচনার মূল প্রেরণা। সখীর জন্য পত্রসম্ভার, 'সিন্ধুগাথা' এই সময়কার রচনা। ঝিনুক দিয়ে বহু শিল্পও গড়ে তুলেছিলেন। ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরলে 'জাহ্নবী' কবিকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়, "অনেকের জানা নাই, চিত্রবিদ্যা না শিখিয়াও কবি গিরীন্দ্রমোহিনী চিত্রশিল্পে বিশেষ দৃশ্যচিত্রে (Landscape Painting) প্রসিদ্ধ

১। ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

সিদ্ধহস্ত, চিত্রকর অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। বর্তমান প্রদর্শনীতে তাঁহার অনেকগুলি চিত্র ও অন্য শিল্পাদি প্রদর্শিত হইতেছে। কবি-প্রতিভার এরূপ নানামুখী বিকাশ বাঙ্গলায় বিরল :"[১]

গিরীন্দ্রমোহিনীর পুত্রগণও তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রকাশচন্দ্রের হাতে ভারতী পত্রিকার সম্পাদনার ভার স্বর্ণকুমারী সাময়িকভাবে দিয়েছিলেন ; যখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। পরবর্তীকালে ইংরাজী ও বাংলা উভয় পত্রিকার সম্পাদনায় স্বীয় যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন তিনি। তাঁর বহু লেখাও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর 'জাহ্নবী'র সম্পাদনাকালে তাঁর অন্যপুত্র পূর্ণচন্দ্র উক্ত পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। 'জাহ্নবী'তে প্রকাশিত কবিতা তাঁর সাহিত্য-কৃতির পরিচায়ক। এই পুত্রের অকালপ্রয়াণে গিরীন্দ্রমোহিনী তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে 'টবী' নামক কবিতা রচনা করেন। 'সাহিত্যে'র পাতা থেকে কবিতাটি উদ্ধৃত হল।

টবী

বাছা !

যে বিবর্ত্তসূত্র-বশে স্নেহের মূরতি ধরি
এসেছিলে অঙ্কেতে আমার.
সে তোমার তুমি নও—জান তা বিশেষ করি'—
কতদিন হয়ে গেছে তা নিয়ে বিচার।
রঙ্গভূমে নট এক—শত মূর্ত্তি করে সে গ্রহণ—

কখনো বালক বৃদ্ধ, কখনো নৃপতি পুত্র,
কে সে কিন্তু আপনারে জ্ঞাত সর্ব্বক্ষণ।
কেন তবে তোমা তরে করিব ক্রন্দন—
প্রাণাধিক হে মোর নন্দন।

এই কবিতাপাঠে বোঝা যায়, এক গভীর উপলব্ধিতে তাঁর অন্তর প্রশান্ত হয়ে উঠেছিল। পুত্রহারা জননীর আর্তনাদ এই কবিতায় নেই বরং জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টির অনন্তলীলার তরঙ্গ, এই সম্যকজ্ঞানে কবিতাটি প্রদীপ্ত।

১৩২২ সালের কার্তিক মাসের 'ভারতবর্ষে' 'আমার দুর্গোৎসব' নামক প্রবন্ধটি তাঁর অন্তরের স্থৈর্য, প্রশান্তি ও গভীর আত্মদর্শনের নিদর্শন। একারণেই পুত্রের অকালমৃত্যু ধীরচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। সাহিত্যে, শিল্পসৃজনে জীবনের শেষ দিনগুলি মাধুর্যে ভরা। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে 'মধুময় এই পৃথিবীর ধূলি'র সন্ধান পাওয়া যায়। 'আমার দুর্গোৎসব' থেকে কিছু উদ্ধৃত করলেই একথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হবে।

১। জাহ্নবী, ১৩১৩

"আমি তখন সুদূর ওয়াল্টেয়ারে সুদীর্ঘ প্রবাস জীবন যাপন করিতেছি। যাহার নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য দেশত্যাগী হইয়া ওয়াল্টেয়ার বাসিনী হইয়াছিলাম, সে আমার অংকশূন্য করিয়া আজ জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছে; কিন্তু তখন যে আশা পোষণ করিয়া গিয়াছিলাম, উদার হৃদয় সিন্ধু তাহাতে নিরাশ করে নাই। ভিষক্ শ্রেষ্ঠ সমুদ্রের শান্তিময় স্পর্শে, তখন তিলে তিলে আরম্ভ করিয়া তাহার পূর্ব-স্বাস্থ্য আবার অক্ষুণ্ণভাবে ফিরিয়া আসিয়াছে। অধিকন্তু, সমুদ্রের তীরজাত স্মৃতিচিহ্ন—প্রবাল অনুরূপ—দুটি নাতি নাতিনীও লাভ করিয়াছি। সেখানকার অধিবাসীদিগের গুণে ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া, সেই সমুদ্রতীরেই আবাস স্থাপন করিয়া, জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটাইবার জল্পনা কল্পনায় ব্যস্ত। সারদার আগমন সূচিতকারিণী সোনামুখী শরৎ আসিয়াছে; সেই স্বর্ণাভ চারিদিক যেন হাসিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে।

সহসা বলিয়া উঠিলাম—'আজ সেখানে কত ধূম' অমনি সরু সরু মিহিকণ্ঠে উত্থিত হইল—'কোথায় ঠাকুমা—কোথায় ঠাকুমা? কিসের ধূম ঠাকুমা? বল না ঠাকুমা।' পার্শ্বেই ছোট ছোট নাতি নাতিনীগুলি বসিয়া আমার সহিত সমুদ্রের ভীমকান্তি দর্শনে নিমগ্ন ছিল, তাহাদেরই কণ্ঠে ঐ ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। এই অবিশ্রান্ত তরঙ্গভঙ্গ—এই ভৈরবগর্জন—এই অনুপমেয় নিসর্গ সৌন্দর্য্য সমাবেশে যদিও এখানে মনে হয় যেন নিত্যই দুর্গোৎসব তবুও 'জন্ম বিটপীমূল ক্রোড়ে মন ধাবিত'—সে ত আর ভুলিবার নহে। বলিলাম 'কিসের ধূম জান না? পরশু যে দুর্গাপূজা।' তাহারা বলিল 'দুর্গাপূজা কেমন ঠাকুমা? আমি ত কই দেখি নি।' আমার চমক ভাঙ্গিল, ভাবিয়া দেখিলাম সত্যই ত। যখন এখানে আসি. তখন উহারা নিতান্ত শিশু, তারপর প্রায় তিনবৎসর হইল এখানে আসিয়াছি।"

"তারপর, পৌত্র পৌত্রীগণের হুকুম হইল, 'ঠাকুমা, দুর্গাপূজা কর আমরা দেখব।' আমি বলিলাম, 'তবে তথাস্তু।'

আজ পঞ্চমী। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চাতালের কোণেই বারান্দা—সেখানে আসিয়া বসিলাম। কি উপায়ে এখন রাতারাতি দুর্গোৎসবের আয়োজন হয়। মনে হইল, পূজা ত ঘটে পটেও হয়; তবে ভাবনা কিসের! বলিলাম—'পাঁজিখানা কেউ আনতে পার?' অমনি, 'আমি পারি আমি পারি' রব উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জিকাও সশরীরে উপস্থিত হইলেন। এইবার প্রতিমা-অংকনের পালা। কার্ডবোর্ড কাটিয়া আকার ও কাঠাম স্থির হইল; পঞ্জিকা সম্মুখে রাখিয়া, তুলি রং প্রভৃতি লইয়া, প্রতিমা অঙ্কনে নিযুক্ত হইলাম। ক্রমে মহামায়া যেমন বর্ণের জালে ধরা পড়িয়া—একটু একটু করিয়া সেই চিরপরিচিত ভক্তবাঞ্ছার মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়া—প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, তখন বধূঠাকুরাণীরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া কহিলেন—'বাঃ, এ ত চমৎকার হয়েছে।

"আজ ষষ্ঠী। প্রত্যূষে উঠিয়াই 'বান্তী ফাটি'তে বলিলাম, অর্থাৎ এখানকার ভাষায়, গাড়ী যুতিতে বলিলাম। অবিলম্বে মালেয়া কোচম্যান গাড়ী তৈয়ার

করিয়া আনিল। বলিলাম, 'পটুম চঙ্গ বেগী বেগী পো'—অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্র যাও।

"পূজার আয়োজনের দ্রব্য সম্ভারের জন্য সওদা করিতে ভাইজাগ্‌ যাইতে হইল। প্রতিমার সাজের জন্য রঙিন কাপড়ের টুকরা, জরী প্রভৃতি লইয়া, বাড়ী ফিরিবার মুখে দেখিলাম—সৌখীন খেলনা জাতীয় দ্রব্য নিলাম হইতেছে, তাহার মধ্যে ছোট ছোট আলোও আছে। আমার আদেশক্রমে, কোচম্যান তখন আমাদের 'সওকার' অর্থাৎ মুদিকে ডাকিয়া আনিলে, সে দর-দস্তুর করিয়া ঐ আলোগুলি এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপযুক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া কিনিয়া দিয়া বলিল,—'আর কি চাই আম্মা?' আমি হাসিয়া বলিলাম—'দুর্গাপূজা হবে যে, এখনো অনেক জিনিস চাই।'

"আসনে, বসনে, বাসনে ভূষণে আলোকে, পুলকে, শঙ্খে, ঘণ্টায়, কাঁসরের সমাবেশে প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। দেবী যেন সত্যই, সেই কার্ডবোর্ডের ছবির মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া হাসিতে লাগিলেন। পূজাবাড়ী জম্‌জম্‌ করিতে লাগিল। প্রতিমা দেখিয়া বউমাদের মুখে হাসি ধরে না। তাঁহারা বলিলেন—'তিন বৎসর এখানে আসিয়াছি পূজা দেখি নাই, মা এবার আমাদের বাস্তবিকই ঠাকুর দেখালেন।

"আজ সপ্তমী।—প্রথমেই নববস্ত্র পরিধান করিয়া স্থানীয় ঝি চাকর বেহারা প্রভৃতি তাহাদের তেলিগু বন্ধুবান্ধব সঙ্গে লইয়া দলে দলে প্রতিমাকে গললগ্নীবাসে প্রণাম করিল। ছেলেদের মানুষ করা পুরাণ ঝি 'মাতু'রও আজ আনন্দের সীমা নাই—সেও স্নাতা, শুচি ও তসর পরিহিতা হইয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া, ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিল—'মায়ের কি শোভাই হয়েছে'।

'দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণ প্রিয়াং' ইত্যাদি যে মন্ত্র পড়িয়া দেশে পুরোহিত মহাশয় পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াইতেন, তাহা কাহারও সম্পূর্ণ মুখস্থ ছিল না এবং এ প্রবাসের পূজায় দেশীয় পুরোহিতও কেহ উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং আমার সদ্যোরচিত দুর্গাস্তোত্রে সে কার্য্য সমাধা হইল। পট্টবস্ত্রাবৃতা বধূমাতারাও সেই মন্ত্র পড়িয়াই পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

"এইবার সন্ধ্যারতি। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর প্রভৃতির সঙ্গে আর একটি অভিনব বাদ্যযন্ত্রধ্বনিত হইতেছে। একটি টিনের ক্যানেস্তারা পিটুনির চোটে সমুদ্রগর্জ্জন মূক হইয়া গিয়াছে ও সমুদ্রতীর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আলোক-মালায় বারান্দা প্রভাময়ী। সহসা দেখিলাম, অনেকগুলি লোক বাংলোর সিঁড়িতে উঠিতেছেন। ক্রমে তাঁহাদের কণ্ঠস্বর নিকটবর্ত্তী হইলে, বুঝিলাম, তাহা পরিচিত। চাহিয়া দেখি; ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, মাতুল, মাতুলানী ও আমার পুত্রদিগের বন্ধুবান্ধবে প্রায় ১২।১৩ জন সমাগত—পূজার ছুটিতে একই ট্রেনে সবাই বেড়াইতে আসিয়াছেন। পূজাবাড়িতে, নিমন্ত্রিতের যে অভাবটুকু ছিল, তাহাও পূর্ণ

"আমার এই কুটিরের বারান্দায় পদার্পণ করিয়াই তাঁহাদের দেবীদর্শন হইল। বিস্মিত হৃদয়ে এবং উৎফুল্লচিত্তে বলিয়া উঠিলেন—'ব্যাপার কি? ওয়াল্টেয়ারে দুর্গোৎসব!' ভায়া কহিলেন, 'এসব বড়দিদির কীর্ত্তি'। যা হ'ক সমুদ্রের ওপর মানিয়েছে বেশ।'

"আজ বিজয়া। বাল্যকালের সেই সঙ্গীতটি আমার কানে বাজিতেছিল—

"কি কর শিখরবর
পোহাল নবমী নিশি
মলিন হতেছে দেখ
উমা মায়ের মুখশশী।'

কিন্তু আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখর বর দিগের মুখ মলিন হওয়া দূরে থাক, আরও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। 'আজ ভাসান-আজ ভাসান করিয়া মহা উল্লাসে কোলাহল করিয়া বেড়াইতেছে। কাপড়, জামা, পোষাক আসাক বাহির করিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। পূজার ন্যায় ভাসানও আনন্দ উৎসবপূর্ণ মনে করিয়াছে। বিসর্জ্জনের বিষাদ, তখনও তাহাদিগের শিশুহৃদয় স্পর্শ করে নাই।...

"তাহারা বোধ হয় ভাবিয়াছিল তাহারা যেমন প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় সমুদ্র-বায়ু সেবন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসে, ঠাকুরও সেইরূপে আসিবেন। কিন্তু,

যবে বিসর্জ্জিলা শ্রীনিবাস ভৃত্য পুরাতন
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি নীল সিন্ধুজলে,
কাঁদিল বালকবৃন্দ হাহাকার করি
গড়াগড়ি দিয়ে সবে পড়ি বেলাভূমে;
... ...

আজিও নানা সুখের স্মৃতির সহিত মানসনেত্রে সেই দুর্গোৎসব ফুটিয়া ওঠে। পূজা সমাপ্ত হইলে হাসিয়া, তখন সবাইকে বলিলাম—'একদিন এক গণৎকার আমার হাত দেখিয়া বলিয়াছিল—'মায়ী। আপনার যে মহামায়ার পূজাটি করতে হবে'—সেকি এইরূপে ক্রীড়াচ্ছলে সম্পন্ন হইল?—যদি তাই হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি! মহামায়ে! সকলই ত তোমার লীলা।"

আজীবন বাণীর সাধনা করে বহুগুণের ও মধুর স্বভাবের অধিকারিণী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী পরলোক গমন করেন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। দেশের লোকের কাছে তাঁর মর্যাদা কতখানি ছিল জানা যায়, ১৩৩১ সালের ভাদ্রমাসের 'মাসিক বসুমতী'র সাময়িক প্রসঙ্গ ও অন্যান্য রচনা থেকে।

"বিগত ২৮শে শ্রাবণ বুধবার 'অশ্রুকণা', 'সিন্ধুগাথা', 'শিখা', 'অর্ঘ্য' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িত্রী, অমরা প্রতিভার অধিকারিণী, কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৬৮ বৎসর বয়সে ইহধামে নশ্বরদেহ রক্ষা করিয়া অমরায় পতিদেবতার সহিত সম্মিলিতা হইয়াছেন। তিনি আদর্শ হিন্দুললনা ছিলেন। তাঁহার পক্ষে ৪০

বৎসর ব্যাপিনী বৈধব্য ব্যথার অবসান দিবস সুখের সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী তিরোধানে বাঙ্গলার সাহিত্যিক সমাজ যে দৈন্য গ্রস্ত হইল, সে দৈন্য যে সহজে অপনোদিত হইবে, তাহা মনে হয় না। তাঁহার 'অশ্রুকণা'র প্রতি ছত্রে ছত্রে যে মর্ম্মন্তুদ বেদনা ব্যক্ত হইয়া মানবহৃদয়ে সমবেদনার সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। হিন্দুবিধবার যে নিখুঁত চিত্র নানারাগে অভিব্যক্ত করিয়া বাংলার সাহিত্য সম্পদ সংবর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে—তাহা চিরকালই বাংলার সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিবে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কুমারসম্ভবে 'রতিবিলাপ', গিরীন্দ্র মোহিনীর 'অশ্রুকণা' এবং রঘুবংশের 'অজবিলাপ' ও অক্ষয়কুমারের 'এষা' মানবজাতির হৃদয়তন্ত্রীর যে স্থানে আঘাত করে তাহা চিরস্থায়ী যশের অধিকারী। আজ গিরীন্দ্র মোহিনীর সাহিত্যিক প্রতিভা আলোচনার দিন নহে। যিনি বঙ্গবাণীর গলদেশে গজমতি হারের ন্যায় অমূল্য 'অশ্রুকণা'র মালা দোলাইয়া দিয়া তাহার অলংকার সম্পদের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই জন্য নীরবে অশ্রুকণা বিসর্জ্জন করিয়া বাঙ্গালী সাহিত্যিকের শোকভার লাঘবের ও কর্ত্তব্য পালনের দিন।"

৺গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী[১]

নাহি সে ঝংকার আজি হে বীণা-বাদিনী।
সুমধুর-মধুর তান ভাবে ঢলঢল ;
দেবতা দেউলে 'অর্ঘ্য' 'শিখা' বিমোহিনী,
কাব্য কাননের মাঝে ফুল্ল ফুলদল।
ঝলে 'অশ্রুকণা' তব শারদ প্রভাতে,
শিশির-বিন্দুর সম চিত্ত-শতদলে,
শান্ত সুধাংশুর কম্র কৌমুদী-সম্পাতে,
উদার সে 'সিন্ধুগাথা' তরঙ্গ উথলে।
'আভাসে' বিকশে কত অতীতের স্মৃতি,
প্রাণের নিরুদ্ধ ব্যথা ফুটে কি ভাষায়।
মর্ম্মের বিষাদ-মাখা সকরুণ গীতি,
নিভৃতে নিকুঞ্জে উঠে যৌবন সন্ধ্যায়।
স্মৃতির সুবর্ণ দীপ হৃদয়-মন্দিরে
আনিবে স্বর্গের আলো মর্ত্ত্যের তিমিরে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

১। ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৩১

গিরীন্দ্রমোহিনী[1]
ও
মানকুমারী

"It was woman at first,
In knowledge that tasted delight,
And sages agree
The laws should degree
To the first possessor the right."—Pope.

কবিতা কানন মাঝে দুইটি বল্লরী,
পল্লবিনী তেজস্বিনী উভয়ে সুন্দর ;
সমান সুরভি শোভা উভয়ে বিতরি
শোভিছে এ বঙ্গ-ভূমে ; মুগ্ধনারী নর।
দীপ্ত দুটি তারা কাব্য গগন উপরি
স্নিগ্ধ কিরণের ধারা ঢালে তরতর ;
ফুল্ল যুগ্ম তামরস কাব্যসরে, মরি !
বিতরে অপূর্ব্ব শোভা ! মুগ্ধ চরাচর !
ধন্য বঙ্গভাষা, ধন্য কবিতা বঙ্গের,
অনন্ত বসন্ত জাগে তব উপবনে,
হেন পিক কুলেশ্বরী মধুর স্বনলে
তোষে যারে অনুক্ষণ, অভাব কিসের
আছে তার ? হেমচন্দ্র দেখ চেয়ে চেয়ে,
চেন কি ? ওই যে বাঙালিনী মেয়ে।

সাহিত্য চর্চা—কবিতাহার

গিরীন্দ্রমোহিনীর সচেতন সাহিত্যপ্রয়াস 'কবিতাহার' ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত। ব্যক্তিগত পত্রসমষ্টির (জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী) মুদ্রীকরণে বিক্ষুব্ধ, লজ্জিত জনৈক মহিলার কাব্যকৃতির প্রথম ফলশ্রুতি এই 'কবিতাহার'। তবে একথা সত্য-গদ্যে পদ্যে লেখা পত্রগুলির পুস্তিকাকারে সন্নিবদ্ধ রূপ দেখেই বিচলিত মহিলা আত্মশক্তিতে সচেতন হয়েছিলেন। 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী'র প্রকাশকাল ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ। ঠিক একবছর বাদে তাঁর প্রথম কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসেই। সাহিত্য সম্রাট

১। পূর্ণিমা, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩০১

বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, অন্যান্য বহু পত্রপত্রিকার অভিনন্দনে বইখানি রাতারাতি কবিকে বিখ্যাত করে দিল। কিন্তু পুস্তিকাটির যথার্থ কাব্যমূল্য কতটা ছিল, সেটাই হল বিচার্য। আসলে সেই যুগের নবপ্রত্যয়নিষ্ঠ ব্যক্তি চেতনা নারীত্বের সম্মানদানে উন্মুখ। নারী তখন আর নরকের দ্বার নয়, কেবলমাত্র পুরুষের ভোগ্যবস্তু নয়, বরং

> কেহ বলে প্রিয়া মুখ বিদ্যুৎবরণ
> সুকুমার জ্যোৎস্না কোথা বিদ্যুৎ বিভায়।
> যদি কিছু থাকে মোর কবিত্ব বড়াই
> অবাক ও মুখ হেরে সব ভুলে যাই।[১]

এই সেই যুগ, যে যুগের মন্ত্রোচ্চারণ—

> হৃদয়ে জেগেছে তান,
> পুলকে আকুল প্রাণ
> গাবো গীত খুলি দ্বার
> মহিয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।[২]

কোন একটা উপলক্ষ পেলেই, সেই যুগ নারী বন্দনায় মুখর হয়ে উঠত।

বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়, 'কবিতাহারে'র কবিতা-পঞ্চক কোন মৌলিকত্ব বা কোন বিশিষ্টতা দাবী করতে পারে না; ভাব, ভাষা সকল দিক দিয়েই স্বীকরণের অভাব স্পষ্ট প্রত্যক্ষ।

বায়রণ বলেছিলেন, গ্রীষ্মকালে ছায়ায় একলা বসে ভাবুক জনের জন্য সহজসুরে গান গাওয়াতেই তাঁর আনন্দ।[৩]

এই সঙ্গীতময়তা 'কবিতাহারে' অনুপস্থিত। অবশ্য সেই যুগে নারীর অবস্থা, বয়স ও শিক্ষার অপূর্ণতা বিচার করে কবির কাছে কাব্যের পরিণতি আশা করা শুধু বৃথা নয়, অযৌক্তিকও বটে। একজন কিশোরী অন্তঃপুরচারিণীর প্রথম কবিতা রচনায় যে যুগধর্মের প্রভাব প্রতিফলিত সেটাই বিস্ময় এবং প্রশংসার সহস্রধারে বর্ষণের কারণও তাই। তাঁর রচনার যে প্রধান গুণগুলি সকলের হৃদয় জয় করেছে, তা হল সহৃদয়তা, মর্ত্যদৃষ্টি, মানবিকতা, আন্তরিক সহানুভূতি। তাঁর পূর্বগামিনী কবি ঠাকুরাণী দাসীর 'সন্ধ্যাবর্ণনা'র সঙ্গে গিরীন্দ্র মোহিনীর 'ঊষাবর্ণন' বা 'শরৎবর্ণন' এর তুলনা করলেই পার্থক্য স্পষ্ট হবে।

১। দেবেন্দ্রনাথ সেন, নারী মঙ্গল
২। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, মহিলা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) অবতরণিকা—পৃঃ ১
৩। 'Tis my delight, alone in summer shade
To pipe a single song for thinking hearts.
—Byron.

ঠাকুরাণী দাসীর ভাষাতেই তাঁর মনোমত বাসনার প্রকাশ—

"কৃপাকর কৃপাময় যে সময়ে যাহা হয়
সেই সব করিয়া রচনা।
পুরাই মনের সাধ করি তব গুণবাদ
উপলক্ষ্যে সন্ধ্যার বর্ণনা।"[১]

(৩) অপরপক্ষে গিরীন্দ্র মোহিনীর 'উষাবর্ণন এ মধ্যযুগীয় ধর্মভাব বিযুক্ত প্রকৃতি তন্ময়তা।

হে! শুভ্রবসনা, লোহিত বরণা
তোমার উদয়ে জগৎ মাঝে;
সকলেই সুখী, সবারি বাসনা,
হেরিতে তোমায় মোহিনী সাজে।

(উষাবর্ণন, কবিতাহার)

ভগবানে পুরোপুরি বিশ্বাস রেখেও তিনি শুদ্ধ নিসর্গ কবিতা রচনা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য মানবতাবাদ, আত্মচেতনা, ইহমুখিনতা তাঁর বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। 'সঙ্গিনীর বৈধব্য' এবং 'লর্ড মেয়ো'র অপমৃত্যু'তে তার আন্তরিকতা অকৃত্রিম। প্রথমটাতে সমাজ সচেতনতা, নিষ্ঠুর সমাজের নির্মম আঘাতের কথা চিন্তা করেই তার দুঃখবোধ গভীর। দ্বিতীয়টায় একজন অচেনা, অদেখা বিদেশিনী মহিলার প্রতি সহানুভূতির গভীরতা হৃদয়স্পর্শী।

'বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা' নিঃসংশয়ে গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠ কবিতা। নারীগণ নিজেদের পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে উঠছেন, তার প্রমাণ ছত্রে ছত্রে। যুগধর্মে এতদিনকার অবহেলিত, বঞ্চিত নারী অনেকের লেখাতেই বন্দনীয় হয়ে উঠেছেন। কিন্তু একজন নারীর রচনায় তাদের দুঃখ, বেদনা, অন্ধ গৃহকোণে বন্দী বঙ্গললনার ব্যর্থ জীবনের জন্য আর্তি, বিদ্যালাভের জন্য ব্যাকুলতা, সাজুতির ব্রতানুষ্ঠানে জীবনের অপচয়, ব্যর্থতা থেকে মুক্তির জন্য নানা উপায়ের অনুসন্ধান তাঁর কবিতাটিকে বিশেষ মূল্য দিয়েছে।

শিখে বিদ্যা হায় মোরা যত কুলবতী।
পাইব কি মোরা উত্তম প্রকৃতি!
হইবে কি মন হ'তে নীচত্ব অন্তর।
মহত্ত্ব প্রভায় উজ্জ্বলিবে কলেবর।

(বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা, কবিতাহার)

হেমচন্দ্রের নারী প্রগতি বিষয়ক কবিতাপুঞ্জ 'ভারতকামিনী' 'বিধবারমণী' 'কামিনীকুসুম' এ যুগে যে মূল্যই পাক, সেই সময় কিন্তু যুগোপযোগী হয়েছিল।

মধুসূদনের বীরাঙ্গনা, বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরী, সুরেন্দ্রনাথের মহিলা প্রভৃতি কাব্যে নারী বন্দনীয় হয়ে উঠেছে। গিরীন্দ্রমোহিনীর চিন্তা ও সৃজনশীলতা এই ধারাতেই সম্পৃক্ত। বরং পুরুষ কবিগণ বাইরে থেকে নারীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছেন আর গিরীন্দ্রমোহিনীর দুঃখবোধ অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত। তাছাড়া সমাজচেতনা এবং সংস্কারহীনতাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভগবানে অবিচল ভক্তি-বিশ্বাস রেখেও গিরীন্দ্রমোহিনীর মন মর্ত্যনিবিষ্ট। সেই যুগে একজন পঞ্চদশী কুলবধূর কাছে এধরণের আত্মনিরীক্ষণ প্রায় অচিন্তনীয়।

কাব্যরচনার এই প্রথম যুগটা গিরীন্দ্র মোহিনীর অনুকরণের কাল, হেমচন্দ্র বিহারীলালের প্রভাব তো আছেই, ঈশ্বর গুপ্তের রচনার অনুকরণও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এমনকি মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষায় অনুকরণ প্রচেষ্টাও দেখা যায়[১] 'সঙ্গিনীর বৈধব্যে'র 'লিখিতে লেখনী মোর কাঁদিল নীরবে' এই ছত্রটি মেঘনাদবধ কাব্যের

তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ম শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে।' এর প্রতিচ্ছায়া।

ভাষা ও ছন্দে যাই থাক, বিষয় নির্বাচনে কিন্তু কবির মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

Page 110
March 10, 1873.

The Hindoo Patriot

Kavitahara is a collection of some exquisite pieces of poetry in Bengali by a Hindu lady of high respectability in Calcutta. It may be interesting to the reader to know that the poetess is only fifteen years of age.

Pages 129
March 17, 1873

In Quoting from our last issue a short notice of a book of poems in Bengali by a Hindu girl of fifteen the Friend of India calls upon us to give translations. Thanks to our obliging poetic friend, we are enabled to give a few "elegant extract". The subjoined are the first two stanzas of a beautiful description of Dawn :

O ! beautiful and sweet faced Morn,
It seems to me thou hast thy birth,

To gladden all created things,
And fill with happiness and earth !

* * * *

With looks of pique thy rival Night,
Who ruled erewhile o'er land and sea,
Wrapt in her sable veil retreats,
And leaves the sovereignty to thee.

The following extract is from Lines on Lord Mayo's death :

To the lofty Council chamber
Where in state thy body lies,
All thy councillors are wending,
With sad hearts and moisten'd eyes.

* * * *

And to thee our lady-mother
What shall now our offering be ?—
Heart-wrung tears—a nation's homage—
Love—respectful sympathy—

Here is a choice morceau from a pathetic piece entitled "My Widowed Friend". The exquisite beauty and touching pathos of the original are, however almost wholly lost in the translation :

I little thought in tender infancy
My cherish'd darlings ye would orphans be ;
Ah me ! all sudden from my arms was torn
Life of my life—and I am left to mourn.
—Seated upon his lap, in accents sweet,
Short-broken words no more will ye repeat ;
What joy was mine to watch, unseen the while,
Those tender lispings and his loving smile !
Reft of my lord, there's nothing now for me.
But days of torture, nights of misery.

We hope the above extracts will satisfy our contemporary that we have not exaggerated the merits of poems by this Hindu girl.

The Friend of India

March 13, 1873

A Bengalee girl of fifteen has published Kavitahara which the Hindoo Patriot describes as "a collection of exquisite piece of poetry" in Bengalee. The Critic should translate them.

March 20, 1873

The Hindoo Patriot has responded to our request for a translation of specimens of the poems by a Bengalee girl of fifteen, which it praised so highly. We quote the following as giving a side of the Hindoo widow's life rarely represented, although the critic declares that the beauty and pathos of the original are lost in the translation :

I little thought in tender infancy

... ...

But the days of torture ; nights misery.

ভারত কুসুম

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ দীর্ঘ-বিলম্বিত। প্রায় দশ বছর বাদে 'ভারত-কুসুমে'র গ্রন্থনাকালে ভূমিকায় স্বয়ং গিরীন্দ্রমোহিনী একটা জবাবদিহি করেছেন : "হিন্দুবালার কোন পুস্তক প্রণয়নে যে কত ব্যাঘাত, তাহা বোধহয় সকলেই জানেন।" কথাটা তাঁর সাংসারিক জীবন থেকে সত্য, আবার এও সত্য যে, এই সময়ে তাঁর অন্তরলোকে একটা প্রস্তুতি চলছিল। 'কবিতাহারে'র আশাতীত মূল্য তাঁকে আত্মহারা করেনি। 'ভারতকুসুম' রচনাকালে তাঁর দৃষ্টি মধুসূদনের কাব্যের দিকেই নিবদ্ধ ছিল। অবশ্য হেমচন্দ্রের প্রভাব তখনও তাঁকে পরিচালনা করছে, এমন কি গ্রন্থের নাম নির্বাচনেও হেমচন্দ্রের প্রভাব, তবে লক্ষ্য মধুসূদনের কাব্য।

"ভারতি ! যেমতি মাতঃ বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায়, (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চ বধূসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা
তেমনি দাসেরে আসি দয়া কর সতি।"[১]

ভারতী বন্দনা দিয়ে 'মেঘনাদবধ কাব্য' যেমন শুরু হয়েছে, 'ভারত কুসুমে'ও দেবীবন্দনা দিয়ে কাব্যের সূচনায় তিনি মহাকবির কাছে ঋণী—

অমল কমল 'পরে
চরণ অর্পণ ক'রে
মনের আনন্দে বীণা বাজাও হরষে।

(বসন্ত পঞ্চমী—'ভারতকুসুম')

১। মেঘনাদবধ কাব্য, মধুসূদন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, পৃঃ ২৪৩।

বিষয় নির্বাচনেও মধুসূদনের অনুসৃতি লক্ষণীয়। মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মত 'ভারতকুসুমে'ও বিষয়ের বৈচিত্র্যের চমকতৃতি চিত্তহারী। দুকূল-প্লাবী হৃদয়োচ্ছ্বাসে বিদেশের নিঃসঙ্গজীবনে মধুসূদন ওজস্বিনীভাব ও ভাষায় শতাধিক সনেটে স্বদেশের স্মৃতিচারণা করেছেন। জ্ঞান ও প্রতিভার যুক্ত ধারায় 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' তুলনাহীন। মধুসূদনের কবিত্বের বিস্ফোরণী শক্তি গিরীন্দ্রমোহিনীর কাছে প্রত্যাশিত নয়। মধুসূদনের 'শ্রীপঞ্চমী' তাঁর ভারতকুসুমে হয়েছে 'বসন্তপঞ্চমী'। মধুসূদন দেশীবিদেশী কবিগণের উদ্দেশে এক একটি সনেট রচনা করেছেন। আর গিরীন্দ্রমোহিনী 'বসন্ত পঞ্চমী'তে আমাদের দেশের যুগযুগের কবিগণকে, এমন কি মধুকবিকেও আহ্বান করেছেন। 'নদীর প্রতি' কবিতাটিতে ভাষা ও ছন্দের দিক থেকে তিনি মধু-রীতি অনুকরণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সনেটের দৃঢ়পিনদ্ধ সংহতরূপ রচনা তাঁর সাধ্যাতীত। তিনি তখনও হেমচন্দ্রের প্রভাব থেকেই মুক্ত হতে পারেননি। এই সময়ে তাঁর কবিতাগুলি একটু তত্ত্বপ্রধান হয়েছে। 'নিশীথিনী'তে 'আইল নিশি সু-রূপসী' বলে নিসর্গ সৌন্দর্যের বর্ণনায় শুরু করে শেষে তত্ত্বকথায় মগ্ন হয়েছেন,

> "হায়! এ রজনী যাপিও না ঘুমে,
> মরি দেখ দেখ! আঁখি মেলি
> যাঁহার সৃজিত এ সুখের নিশি,
> সবে গাও তাঁর জয় বলি।"

(নিশীথিনী, 'ভারতকুসুম')

তবে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য বা ইজম্ তিনি প্রচার করার চেষ্টা করেননি। যখন যে কোন ভাব মনে এসেছে তাকেই ছন্দোবদ্ধ করেছেন। বহু কবিতায় গঠিত এই কাব্যটি বিচিত্র ভাবের তরঙ্গায়িত সমষ্টি। অবশ্য দৃষ্টি তাঁর প্রবৃত্তিতেই আবদ্ধ। 'নিশীথে বংশীধ্বনি'তে গীতি কবিতার ললিত মাধুর্য অস্বীকার করা যায় না। নারী হৃদয়ের কোমল স্পর্শের আভাস আছে এতে। নিসর্গের চিত্তহারিণী শোভাতেই তাঁর অন্তরের তৃপ্তি। অনেক ভাবনাচিন্তার পরে এই সিদ্ধান্তে এলেন শেষ কবিতা 'হৃদয়'-এ।

Reis and Royyet

June 11, 1887.

A Bengalee Poetess

The muse of the lady writer of Kavitahar which was reviewed at some length in Mookherjee's Magazine and other periodicals some years ago, has not been idle. She has given another proof of her powers and Bharata Kusuma (Indian-flowers—of poesy) of which an advertisement has been appearing in this journal, has rather too

long been lying on our table. For this apparent neglect, we appologise to the authoress, although the compliment she has paid, in dedicating the work to us made the grateful task of reviewing it in our columns one of some delicacy. The more is this the case, as it is impossible to speak of the work except in terms of high praise. Some of the poems originally appeared in high class vernacular periodicals like the Arya Darsan and the Banga Darsan, which fact in itself is no small testimony to their merits. Others are productions of her girlhood, which, good in their way, are like her maiden work, Kabitahar, still more interesting for the promise of future excellence which has been realized. What constitutes a special merit of the ever-unhappy poetess, now cast out of all hope in this world by the death of her valetudinarian lord, is the fact of her owing little to others for the culture she has attained. Belonging to the most respectable rank of Hindu society, but on her father's and father-in-law's side, immured in the zenana and never having even the advantage of the foreign zenana teaching, the progress of her mind has chiefly been her own work, being only the easy development of considerable natural gifts. And a gem of a woman is she, in the perspicacity and delicacy of her mind, the richness of her infancy and above all the purity of her life and conversation. And a true representative Hindu lady in her cheerful spirit of sacrifice. It is much to be regretted that the merit of Bharat Kusuma has received but scant encouragement from the public.

The book has been edited by Baboo Mohindra Nath Roy, sub-editor Arya Darsana and author of the Lives of Hannemana and Aukhoy Kumar Dutt in Bengali. Considering the difficulties of a zenana lady's appearance in print, Baboo Roy has, by kindly seeing this work through the press, done a public service.

অশ্রুকণা

বিভিন্ন ভূমিতে পদচারণা, ও হেমচন্দ্র বিহারীলালের অনুকরণের পর অবশেষে স্বচ্ছন্দচারণের জন্য গিরীন্দ্রমোহিনী পায়ের নীচে শক্ত জমি পেলেন 'অশ্রুকণা' পর্বে। আদিকবির শোক শ্লোক হয়ে উঠেছিল 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং' বলে কিন্তু গিরীন্দ্রমোহিনী ব্যাধরূপী মৃত্যুকে অভিশাপ দিতে পারেননি, বরঞ্চ বিরহবিধুরা

ক্রৌঞ্চীর মত অশ্রান্ত ক্রন্দনে তাঁর শোক ছন্দোময়ী হয়ে উঠতে লাগল। দুঃখের দুঃসহ তাপে তাঁর যেন অগ্নি পরীক্ষা সমাপ্ত হল, কাব্যের একটি স্থির আসনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। এর পূর্বেকার সময়টাকে উদ্যোগপর্ব বলা যেতে পারে। ক্রম বিবর্তনের ধারাপথে নিজস্ব কাব্য-রীতি খুঁজে পেয়েছেন 'অশ্রুকণা' সৃজন-কালে। স্বামীবিয়োগের চরম আঘাতই তাঁর অন্তরের রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়েছিল।

কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের আনন্দের পরমোপলব্ধি—"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।" দুঃখের সংঘাতেই তেমনি যেন কাব্য রচনার সকল বাধা অপসৃত হয়ে গেল গিরীন্দ্র মোহিনীর ক্ষেত্রে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীর মৃত্যু এবং 'অশ্রুকণা'র প্রকাশ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই 'অশ্রুকণা' কবির গভীর মর্মবেদনার তীব্রপ্রদাহের বাণীরূপ।

গিরীন্দ্র মোহিনীর এই শোককাব্য (অশ্রুকণা) রচনার আগে বাংলায় আরো দুটি শোকগাথা প্রকাশিত হয়েছে, একটি বিহারীলালের বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০)। অপরটি মানকুমারীর গদ্যপদ্যে রচিত প্রিয়প্রসঙ্গ (১৮৮৪?) কাব্য-রচনার প্রথম পর্বে গিরীন্দ্র মোহিনীর উপর বিহারীলালের প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হয়। নবযুগের রোমাণ্টিসিজমের পথিকৃৎ বিহারীলালের রোমাণ্টিক বিষাদ পাশ্চাত্য-সাহিত্যের প্রভাবেই এসেছে। ইংরাজী সাহিত্যিক রোমাণ্টিক যুগে এলিজি রচনার একটা ঝোঁক দেখা গিয়েছিক। বিহারীলালের বন্ধুবিয়োগ রচনায় গ্রের এলিজির প্রভাব স্পষ্ট প্রত্যক্ষ।

গিরীন্দ্রমোহিনীর 'অশ্রুকণা' সদ্য পতিহারার গভীর দুঃখের অতলান্ত-প্রদেশ থেকে সৃষ্টি। গিরীন্দ্র মোহিনীর কাব্য পর্যালোচনে দেখা যায়, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে জ্ঞান তাঁর গভীরই ছিল। সুতরাং সংস্কৃত শাস্ত্রের বিলাপ কাহিনী যে পরোক্ষে তাঁর অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সেটা বলা খুব অযৌক্তিক নয়। কালিদাসের কুমার সম্ভবের চতুর্থসর্গের ৩৮টি শ্লোক রচিত বিলাপে পূর্ণ।

পরলোক নবপ্রবাসিনঃ প্রতিপৎস্যে পদবী মহং তব।
বিধিনা জন এষ বঞ্চিতস্তদধীনং খলু দেহিনাং সুখম্।[১] ১০

(হে পরলোক পথ যাত্রি। তুমি এইমাত্র নবীন দেশের পথে যাত্রা করেছ, আমি তোমার পথানুসরণ করব। বিধাতা কর্তৃক সমস্ত জগৎ বঞ্চিৎ হল, তোমার অভাবে সমস্ত দেহীর সুখ অন্তর্হিত হল)।

... ...

প্রভুর বদন চাইয়া। দগধে আমার হিয়া॥
কপালে কি মোর ছিল। বিভা রাত্রে পতি মৈল॥

১। কালিদাসের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির পৃ. ৬৩, মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলার বিলাপও স্মরণীয়।

চরণ যুগল ধরি। ক্ষণে ক্ষণে কান্দে নারী ॥
কখন শ্রবণ মূলে— "মোরে সাথে লহ" বলে ॥[১]

(কেতকাদাস)

স্বামীর বিয়োগব্যথায় এই নারীদের গভীর শোক গিরীন্দ্র মোহিনীর 'অশ্রুকণা'র অনেক কাছের বলে মনে হয়। সে তুলনায় বিহারীলালের বন্ধুবিয়োগ' অনেকাংশই যেন প্রথাসর্বস্ব, ফলে অগভীর ও আন্তরিকতাশূন্য। শোকবাক্যে অমরত্ব লাভ করেছেন টেনিসন 'ইন্ মেমোরিয়মে'। 'ইন্ মেমোরিয়ম' কিংবা শেলির 'এডোনিসে'র (Adonais) লাইনের সঙ্গে তুলনা করলে বিহারীলালের কাব্যের তরল উচ্ছ্বাস ধরা পড়ে। পূর্ণচন্দ্র, কৈলাস, বিজয় এবং সরলার মৃত্যুতে শোকে গভীরতার তুলনায় উচ্ছ্বাস অনেক বেশী। এযেন হৃদয়ের উচ্চতলে কান্না—তলদেশ পর্যন্ত এর গভীরতা পৌঁছায়নি। শোকের মিছিল বসেছে মনে হয়।

'হা হা রে হৃদয়-ধন সরলা আমার,
কোথা গেলে ত্রিভুবন করি অন্ধকার !
উহু উহু বুক ফাটে হায় হায় হায়,
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল মাথায়।[২]

কীটসের মৃত্যুতে শেলির—উক্তি—

Oh, weep for Adonais—he is dead !
Wake, melancholy Mother, wake and weep ![৩]

সমস্ত প্রকৃতিতে আপন বেদনার্ত হৃদয়ের প্রকাশ প্রতিবিম্বিত দেখছেন কবি। আরো গম্ভীর, আরো অর্থবহ নিম্নোক্ত কথা—

He lives, he wakes—'its Death is dead, not he ;
Mourn not for Adonais—Thou young Dawn,
Turn all thy dew to splendour, far from thee
The spirit thou lamentest is not gone.[৪]

[ঐ]

এই উক্তি রবীন্দ্রবাণীকেই স্মরণ করায়—

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই ॥
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই ॥[৫]

বাইশ কবির মনসামঙ্গল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ১৯৬২, পৃঃ ২৬২
'সরলা'-বন্ধুবিয়োগ, গ্রন্থাবলী, বিহারীলাল চক্রবর্তী, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৪৫
Adonais, P. B. Shelley
Adonais, Shelley.
পূজা, ৫৯৬ সংখ্যা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড।

টেনিসন তো 'ইন্ মেমোরিয়মে' অমরত্ব লাভ করেছেন। তাঁর—

'Tis better to hnve loved and lost
Than never to have loved at all.[১]
(IN MEMORIAM : A. L. Tennyson)

প্রবাদে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া যে কোন লাইন বাঙময়,

Forgive my grief for one removed,
Thy creature, whom I found so fair.
I trust he lives in thee, and these
I find him worthies to be loved.[২]

[ঐ]

রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' শোকের ঔদার্যে, অর্থের গভীরতায় এঁদের গোষ্ঠীভুক্ত।

অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা', মানকুমারীর 'প্রিয়প্রসঙ্গ, গিরীন্দ্র মোহিনীর 'অশ্রুকণা' সবাই শোক সঞ্জাত, একই পর্যায়ের। যে অক্ষয়কুমার গিরীন্দ্র মোহিনীর 'অশ্রুকণা'র কবিতা নির্বাচন, সম্পাদনার কাজ যত্ন ভরে করেছিলেন, কয়েকবছর পর পত্নীর মৃত্যুর পর তিনিও একটি শোকবাক্য রচনা করেন।

'এষা' কাব্যকে অতি উচ্চমূল্য দিয়েছেন বিপিনচন্দ্র পাল। এর বস্তুতন্ত্রতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। 'In memoriam' এর সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে 'এষা'কে অনেক বড় করে দেখিয়েছেন। আর 'In memoriam' এ অনেক অভাব, অনেক অসংগতি, এবং করুণরসের অপূর্ণতা তাঁর দৃষ্টিতে পড়েছে। তাঁর কাছে 'এষা' পরিপূর্ণ রসমূর্তি। এই রসমূর্তির কথা বলতে গিয়ে তিনি ম্যাডোনা বা যশোদার মাতৃমূর্তির উল্লেখ করেছেন।

অন্তরের মর্মস্থল থেকে গিরীন্দ্রমোহিনীর শোক উৎসারিত হয়েছে, এর স্বাভাবিক কারুণ্য সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছে। 'এষা'তে এই স্বাভাবিক বিকাশের অভাব। মোহিতলাল মজুমদার অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিকৃতির পূর্বাপর আলোচনায় দেখিয়েছেন, এতকাল তাঁর কাব্য ভাব, কল্পনা ও বাস্তবতায় যে বিরোধ ছিল, যে অপূর্ণতা ছিল, সেটা ঘুচে গিয়ে, অহং এর বিলোপ হয়ে একটা রসসিদ্ধি এসেছে। এখানে কাব্যবিচার যথোচিত হয়েছে।

বিপিনচন্দ্র পাল আদ্যন্ত কোন বিচার না করে 'এষা'কে চরমমূল্য দিয়েছেন। শোকের আর্তনাদের মধ্যে যে গভীর কারুণ্যের কথা বললেন, তাঁর মতে যা রবীন্দ্রনাথে নেই, যা কালিদাসে নেই, তারই বলে 'এষা' অনন্যা। অথচ সমকালীন রচনা গিরীন্দ্র মোহিনীর অশ্রুকণা' অনুল্লেখ রয়ে গেল। কেন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, তা অবোধ্য। এই কাব্যে গিরীন্দ্রমোহিনীর ক্রন্দন অকৃত্রিম এবং আন্তরিক।

১। In memoriam, A. L. Tennyson.
২। In memoriam, A. L. Tennyson.

এই আন্তরিকতাই 'অশ্রুকণা'কে বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছে। ক্যালকাটা রিভিউ-র মতে।

"This is poetry in life and as the expression of that poetry, Aśrukana is the History of the soul of a noble Hindu woman."[১]

গভীর শোকে মানুষ তার চারপাশের জগৎ থেকে সাময়িক বিচ্ছিন্নতা লাভ করে। অন্তরের শূন্যতায় এক প্রস্তরীভূত নীরবতা আসে, তারপর জাগে চেতনাসমৃদ্ধ নব জীবনপ্রত্যয়।

মৃত্যুর পর হিন্দু সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠানের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় 'এষা'তে গভীরতার অভাব যেমন, অনির্বচনীয়তা তেমনি অদৃশ্য।

বলতে গেলে 'অশ্রুকণা'র অশ্রুধারা সম্বল করেই গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যজগতে প্রবেশ। 'কবিতাহার', 'ভারতকুসুম' এর তুলনায় কাব্যকৃতির চেষ্টামাত্র। অনুকরণই এসময়ে প্রধান, স্বকীয়তা তখনও অনেক দূরে। 'অশ্রুকণা'তে কাব্যের গতি ভিন্নমুখী ছিল।

নির্মল অশ্রুতে তিনি স্বর্গত স্বামীর উদ্দেশে অর্ঘ্য রচনা করেছেন,—

যা ছিল আমার, দেছি মোর যা—তোমারি সব
সবি পুরাতন, সখা, আছে অশ্রুকণা নব।

(উপহার, অশ্রুকণা)

শোকাশ্রুকে সম্বল করে বিচিত্র ভাব ও ভাবনার সংযোজন করেছেন অশ্রুকণাতে।

'পূর্বছায়া'তে এক অশুভ ছায়ার আশঙ্কা, তাঁর জীবন ঘিরে যেন অস্ফুটপ্রায় এক করুণ বিলাপধ্বনি, অন্তরে তার প্রতিধ্বনি অনুভব করেন। 'স্বপ্ন'তে অতীতের সুখস্মৃতিতে ফিরে যাবার আনন্দে স্বপ্নের প্রতি কৃতজ্ঞতা, আবার 'হায় কেন'তে মোহভঙ্গের জ্বালা।—

কেন মরীচিকা হয়ে
ভুলাও এ শ্রান্ত হিয়ে ?—
তৃষিতে যাতনা দিয়ে, মিছে আর কিবা ফল ?

(হায় কেন, অশ্রুকণা)

'একি' কবিতাটি 'পূর্বছায়া'র প্রতিরূপ। এক অশান্ত ঝড় মনকে অন্ধকার করে রাখে। 'কতদিন' এ আছে এই জীবন যন্ত্রণা।

কতদিন হৃদি এই ভগন কুটীরে,
রুদ্ধকণ্ঠে, ব'সে, ব'সে গাবে গান হায় !

(কতদিন, অশ্রুকণা)

১। Calcutta Review, October 1887.

স্বর্ণকুমারী বলেন, "যে কবিতায় হৃদয় যত অভাবের ভাবে পূর্ণ করে, সেই কবিতা তত ভাবময়, তত শ্রেষ্ঠ।"[১]

গিরীন্দ্র মোহিনীর 'অশ্রুকণা'তে আশা, আনন্দ, ভরসা সবকিছুর অভাব পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে কাব্য হয়ে উঠছে। আর সীমাহীন দুঃখকে আত্মশক্তি দ্বারা জয় করে ধীরে ধীরে কবির জীবনে আসছে উত্তরণ। 'মরীচিকা'তেই জীবনের প্রতি আস্থার পুনঃ উদয়।

হেথা আছে দুখ শেষে সুখ, দিবা পরে রাতি,
নিরাশায় সুখস্মৃতি অন্ধকারে বাতি।

(মরীচিকা, অশ্রুকণা)

এই আস্তিক্যবোধ কবির জীবনে এনেছে প্রশান্তি আর কাব্যে প্রতিষ্ঠা। অশ্রুধৌত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তিনি পান নবলব্ধ জীবনচেতনা। 'আপনা হতে বাহির হয়ে বাইরে' দাঁড়াবার আকুলতা যেমন এলো, সেই মুহূর্তে তাঁর হৃদয় অনুভব করে,—

আছে বিহঙ্গের গান, কুসুম বিকাশ,
রবি, শশী, তারা আছে, অনন্ত আকাশ।

জীবনের প্রতি ভালবাসাই তাঁর কাজের গতিপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, আত্ম-ভাবনায় তিনি স্থিত হয়েছেন। স্বীয় রচনার ধারাটি আত্মস্থ করে স্বচ্ছন্দগতিতে কাব্যরচনা করে গেলেন জীবনের শেষ অবধি! তাঁর কাব্যের পরিক্রমা অনুসারে 'অশ্রুকণা'কে কাব্যের প্রতিষ্ঠার যুগ বলা যেতে পারে। কাব্যালোচনায় গিরীন্দ্র মোহিনীর ক্রমবিকাশের ধারাটি স্পষ্ট অবলোক্য। 'কোথায়' কবিতায় জীবনের সুষমা, জীবনের প্রতি অনুরাগ ফিরে আসছে, দৃষ্টি এসে ঠেকেছে সংসার সীমায়—

দেহান্তে কি আছে? কে মোরে বলিবে?
দেহান্তে পাব কি তায়?
যদি নাই পাই দেহান্ত না চাই
হারাব কেন এ দুখ! (কোথায়)

শোকের তীব্রতা কমলে ভাবনা চিন্তা আপনাকে ছেড়ে যখন বাইরে এলো। দূরে স্থিত অনাহত অভিমানী সন্তানদের ম্লানমুখ দেখে জননীর চিত্ত উদ্বেল হয়ে ওঠে।

মৃতবোন্ধার স্ত্রীর 'Sweet my chiid, I live for thee-র মত তিনিও স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকেন,

ভয় কি, মা, আয় কোলে;
ডাকি দেখ, 'মা মা' বলে, আয় বুকে, রাণি রে!
—আয় বুকে অবশিষ্ট, সুখ-হাসি খানি রে! (ভয়ে ভয়ে)

১। স্বর্ণকুমারী দেবী, 'অভাব', গ্রন্থাবলী, ৫৫ পৃঃ ৭৭।

'অশ্রুকণা' কাব্যটিতে বহুভাবের বিচিত্র সমন্বয়। শোকের উন্মত্ততায় এক একবার আকুল ক্রন্দন করেন, পরক্ষণেই জীবনের প্রতি মমত্ববোধে ভাবান্তর ঘটে।
'প্রাণের সমুদ্র', 'ভাব', 'জগৎ' সবগুলিই আমিত্ববোধে—জীবনরসে রসায়িত। তাই ব্যাকুলতা জাগে -

এ ধরা-স্বপ্ন না সত্য ? কে কবে নিশ্চয় ?
সত্য কভু একেবারে হয় কিরে লয় ?
আহা শুকাইবে ফুল, শুকাইবে তুমি !
মিলাইয়া যাব হায় এ সাধের আমি ! (জগৎ)

ভালবাসার রঙে প্রতিটি কবিতা অমৃতরসে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এক একটা কবিতায় তার প্রকাশ।

গেছে সুখ, যায় দুখ, নীরবে যেতেছে প্রাণ ,
বুঝাবারে পারিনু না একটি প্রাণের গান !
এ জনমে কিছু ভবে বলা হইল না কথা ।
মরমে রহিল ভাব, হৃদয়ে রহিল ব্যথা । (ভাব, অশ্রুকণা)

এই আক্ষেপ জীবনের আসক্তির রূপান্তর মাত্র। স্পষ্ট চেতনা না হলেও জড়ের জীবনের স্বর্গীয় সুষমা বিনষ্ট হয় না, এরকম বোধে তাঁর আকুলতা লক্ষণীয়।

দয়া ক'রে ফেলো মোরে ভাসাইয়া উপকূলে,
নহিলে যে ডুবে মরি, প্রাণের অতল-তলে।
তীরে প'ড়ে শুকাইতে ভালবাসি—তাই চায়
শুকাতে জীবন মোর ; শুকায়ে ত্যজিব কায় !

জীবনের ধূলি মধুময় হয়ে ওঠার উপলব্ধি এই স্তরে হয়নি। কিন্তু বিচ্ছেদের বিষাদ, জীবনের প্রতি আগ্রহ অবিশ্রাম আলোছায়া রচনা করে চলেছে তাঁর মনে। নাহলে 'ধ্রুব'কে পাওয়ার কল্পনা তিনি এখনি করতে পারতেন না। খণ্ডিত, সীমিত জীবনে দৃষ্টি যখন ব্যথাবাষ্পে আচ্ছন্ন, তখনও প্রকৃতি তন্ময়তা উল্লেখ-যোগ্য। মর্মান্তিক দুঃখে ভগবানে বিশ্বাস যেমন দৃঢ়, ভক্তিতে তেমনি নম্রমধুর। তাঁর শিশু বিষয় কবিতা বা গার্হস্থ্যচিত্র সম্বলিত কবিতা অমৃতরসে ঋদ্ধ, আবার চিন্ময়তায় নয়নরঞ্জন। জীবন জিজ্ঞাসা জেগেছে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট পরিণামে পৌঁছতে পারেন না। জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়েছে এটাই আশার কথা। চেতনা সমৃদ্ধ মুক্ত হৃদয়ের জীবন দর্শন হয়তো একদিন লাভ করবেন কিন্তু জিজ্ঞাসা সংশয়ে হৃদয় যে এখন ক্ষুব্ধ আন্দোলিত। কাজেই যিনি পরম নির্ভর, তাঁকে আশ্রয় করাই সর্বাপেক্ষা সমীচীন।

ধরায় সকলি যদি ছাই,
জীবনের পরপার নাই,
বৃথা কেন ইন্দ্রজাল মেলা ?
খেলা, মৃত্যু, ছায়েরই খেলা।

ছাই যদি পরিণাম তবে এজগতে ভাললাগা, ভালবাসা, আলো, হাসি সবই নিরর্থক। জীবনের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, জীবন বিমুখ হয়ে,—

মরিয়া বাঁচিয়া যাই, চলে যাই সে নগর,
প্রাণের দেবতা মম বাঁধিছেন যেথা ঘর।

(জীবন হইতে যদি, অশ্রুকণা)

দ্বিধা, দ্বন্দ্বে নিরন্তর ক্ষত বিক্ষত না হয়ে ভাবনা-চিন্তা সব পরমপিতার পায়ে অর্পণ করাই শ্রেয়।

অকূল জগত পারে, তুমি পিতা, ধ্রুবতারা।
তোমারি পানেতে চেয়ে মুছে ফেলি আঁখি-ধারা।

(প্রভাতে, অশ্রুকণা)

'প্রভাতে'র বন্দনার পর 'সন্ধ্যায়' পরম নির্ভরতা এসেছে।

তুমি সর্ব্ব-সুখ হেতু
তুমি ভূমানন্দ কেতু
তুমি সর্ব্ব শান্তি-সেতু ভাবে নাক মোহে ভুলে।

(সন্ধ্যায়, অশ্রুকণা)

বাসনাপূর্ণ হৃদয়ের অশ্রু ক্রমশ অঞ্জলি হয়ে উঠছে। আত্মনিবেদনের ভিতর দিয়েই আসছে নির্মোহ প্রশান্তি। বিশ্বাসে দৃঢ়তা জেগেছে, মনে এসেছে নব প্রত্যয়।

গুটিকার কাল যাবে।
প্রজাপতি হব তবে;
বিশ্বাস হারায়ে ভবে কি ফল জীবনে
তোমাকে পাইব হেন আশা আছে মনে।

দুঃখও অমৃত হয়ে ওঠে, যখন মনে হয়, দুঃখেও সেই অমৃতময়ের স্পর্শ আছে। তাই কবি অনায়াসেই বলতে পারেন।—

তুমি যদি চাও, বিধি!
ভাঙিতে এ নারী হৃদি
ভাঙুক সে শতবার, যাতনায় নাহি ডরি।
না জানি কি সুধামাখা ওই তব পা দুখানি:
যত দুখ পাই ভবে, তত করি টানাটানি।

[ভিক্ষাগীতি, অশ্রুকণা

এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়, রজনীকান্তের গানে,—

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ,
তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি অনুভব।[১]

১। রজনীকান্ত সেন, বাণী ও কল্যাণী, চিরন্তনীর প্রথম মুদ্রণ, পৃঃ ১৩

দেবতার পায়ে আপন সত্তা বিলিয়ে দিতে চান কিন্তু দেবে প্রিয়ে একাকার হয়ে যায়। ধ্যানলীন নয়নে প্রিয়জনের ছবিই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দেবতার আসন অধিকার করেন তাঁর প্রিয়তম। দেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রিয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য রচনা করেন,—

পারি না ভাবিতে প্রভু, তোমার চরণ !
অধিকৃত করি নাথ, হৃদি-সিংহাসন !
হে নাথ, অনাথ নাথ, ক্ষম পাপিনীরে
তব আগে প্রেমাঞ্জলি দিই প্রাণেশ্বরে। [প্রেমাঞ্জলি]

এখানেও আমরা রবীন্দ্র কাব্য স্মরণ না করে থাকতে পারি না।

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই,
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা !
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।[১]

রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব-কবিতা (১৮ আষাঢ়, ১২৯৯) 'অশ্রুকণা'র (১২৯৪) পরে রচিত না হলে উক্ত 'প্রেমাঞ্জলি' কবিতাটি রবীন্দ্র-ভাবনা-দীপ্ত বলে ধরে নিতে কারোর দ্বিমত থাকত না।

'তুমি' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের 'ছবি' কবিতায় ভাবনার সুর বিদ্যুৎ চমকের মত দেখা দেয়।

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।[২]

ভাব ও ভাষায় এই কবিতা যতই উধ্বর্চারী হোক, মূল ভাবনায় 'তুমি' একই কেন্দ্রজ। রবীন্দ্রবাণী তুলনাহীন কিন্তু বয়সে নবীনা দুঃখিনী বধূর বেদনা রঞ্জিত বিষাদগীতি—

আমার জীবন যে গো শুধু তোমাময়
তুমি ছাড়া আমি কেবা—শূন্য শূন্য মম।
তুমি কি গিয়াছ চ'লে তাত নয়, নয়।
স্মৃতির মন্দিরে মম, প্রতিষ্ঠিত দেবসম। [তুমি]

শুধুমাত্র আন্তরিকতার জোরে কাব্য জগতে একটু স্থান পেয়েছে।

দুঃখের গীতি, দেবতা স্মরণ, ছাড়াও ভিন্নতর ভাবনায় 'অশ্রুকণা' কাব্য বাস্তব রসাশ্রিত হয়েছে। প্রকৃতি-তন্ময়তা তাঁর মনকে শান্তরসে বিভিন্ন সময়ে স্নিগ্ধ

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ৩৬৮
২। রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ৪৭৭

করেছে। বৈষ্ণব কাব্যের ছবি এঁকেছেন 'চন্দ্রাবলী', 'মথুরাধামে', 'মানভঞ্জন' প্রভৃতি কবিতায়। আবার 'গ্রাম্যছবি', 'গার্হস্থ্য চিত্র' প্রভৃতি কবিতা চিত্রধর্মিতার নিদর্শন। যে অঙ্কন বিদ্যায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন পরবর্তীকালে, এগুলি যেন তার প্রাথমিক অভিজ্ঞা। কাজেই মূলে তাঁর কবিতাগুচ্ছকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—ভাবকল্প এবং চিত্রকল্প।

কবি ধীরে ধীরে শোকের সংকীর্ণ সীমা থেকে নিজের শক্তিবলে বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করছেন। এই ঊর্ধ্বগতি না হলে যে সৃজন চেষ্টা নিরর্থক। বিশেষ থেকে নির্বিশেষ না হলে কাব্যমূল্য থাকে না।

'স্মরণ'-এর কবিতা নিচয় কবি সাধকের বৃহত্তর ভাবনার প্রতিফলন। মৃত্যু তাঁর জীবনে বহু বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। সর্বংসহা 'ধরিত্রীর মত' প্রশান্তচিত্তে সব অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছেন। তাঁর দর্শনে তো অসীমের রাজ্যে কোথাও বিচ্ছেদ কোথাও দুঃখ নেই। তাই গভীর বেদনাতেও রবীন্দ্রনাথের শোকার্ত কণ্ঠ একবারও শোনা যায় না। ধীর, শান্ত চিত্তে তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব,—

আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন,
আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক—
এই কথা মনে জানি নাই মোর শোক।[১]

'স্মরণ'-এর সকল কবিতা অমৃতরসসিক্ত। এ শুধু কথার কথা নয়, এ তাঁর পরমোপলব্ধি। এ পর্যন্ত যত elegy রচিত হয়েছে, 'স্মরণ' তাদের সকলকে পেছনে ফেলে অনন্ত আকাশে মিশে গেছে। এর সঙ্গে তুলনায় গিরীন্দ্রমোহিনীর শোক-কাব্যের স্থান যেখানেই হোক, সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে তাঁর বয়স আর পরিবেশ। জীবনের পথে যাত্রা সবে শুরু, ঠিক সেইক্ষণে মৃত্যু জীবনসঙ্গীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, অসহায়া ভীত রমণীকে পথপ্রান্তে ফেলে। আপন ব্যথাভারে বাষ্পাকুল নয়ন দুটি যখনি মেলে ধরতে চেয়েছেন, সংকীর্ণ সীমা তখনি তাঁকে পিষ্ট করেছে। এই গণ্ডির মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রাখা তো জীবন থেকে সরে যাওয়া। এই পলায়নী-বৃত্তি মৃত্যুরই নামান্তর। প্রাণরস ধীরে ধীরে তাঁকে সঞ্জীবিত করেছে। নিজের অন্তরের মধ্যে শক্তি নিজেই জুগিয়েছেন।

জগতে উথলে বান আকাশে আহ্বান গান
সবে 'ডাকে 'আয় আয়' বলি।
ওরে তুই ধূলিকণা ধূলি হইবার আগে
একবার দেখ্ মাথা তুলি।

এই মাথা তুলে দেখার ক্ষমতা না-হলে জগতে প্রাণে প্রাণ মিলাত না। সুখে দুঃখ ভরা স্বার্থের ক্ষুদ্র জগৎ থেকে দৃষ্টি মেলে প্রাত্যহিকতা থেকে ক্রমে ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন। তাঁর প্রার্থনাও জীবনপ্রেমে রসমধুর।

১। রবীন্দ্রনাথ-স্মরণ (১৭ নং), রবীন্দ্র রচনাবলী (খণ্ড ১), জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ৯২০

দেখাও মৃত্যুর মাঝে প্রশান্ত মূরতি তব
হে শিব সুন্দর
মরণ হইয়া যাক্ জীবনের অন্তরঙ্গ
প্রিয় সহচর।

[হেমা, অশ্রুকণা]

কোথাও তিনি প্রকৃতিতে আত্মমগ্ন হয়ে গেছেন। নিজের দুঃখময় জীবনের প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছেন সেখানে।

সমবেদনায় তিনি বলেন,

কোন্ নিঠুরের শাপে প্রকৃতি লো কোন্ পাপে
হয়েছিস বিহীন পরাণ ?
সেই নাক, সেই মুখ, সেই হস্ত, সেই বুক
সবই সেই, অহল্যা পাষাণ।

[প্রকৃতির প্রতি]

কিংবা প্রকৃতিতে সবাই যখন আনন্দ বিধুরা, ফুল সাজে সজ্জিতা, তখন মাধবীর রিক্ততা তাঁকে আঘাত করে—

তোমারো কি গেছে, সখি, চিরসুখ, মধুমাসে ?
কাঁদিতে আমারি মত মলিন বৈধব্য-বাসে !

দুঃখ তাপে ব্যথিত চিত্তে কখনও বা কবি অতীত চারিণী হন। মনে পড়ে পিতৃগৃহের সুখদ দিনগুলি, পিতার স্নেহ, তাঁর দেওয়া আশ্বাস।

ঊনবিংশ শতকের কবি ভাবনা দাম্পত্য রসের মাধুর্যে বা ঘরোয়া জীবনের পরিপূর্ণ চিত্ররচনাতে মগ্ন হয়েছিল। নারী কবি-হৃদয়ের একটা প্রধান ভাগ অধিকার করাতে গার্হস্থ্য জীবনের দৈনন্দিন চিত্রলিপি কাব্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল মোহিনীরূপে। চিরপরিচিত জীবন যাত্রায় নিত্য নব সৌন্দর্য উদ্ঘাটনে তাঁদের প্রয়াস স্মরণযোগ্য। 'নব নব রূপে এসো প্রাণে' এই যেন ছিল ও জাতীয় কাব্যের অবলম্বনীয় বিষয়। রোমান্সের প্রতিফলন তাঁরা দেখেছেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে। আপন মনের মাধুরী যোজনায় তা হয়েছে অপরূপা। সংসার সেদিন হয়েছে সুখে শান্তিতে গড়া আনন্দভবন।

নারীর ঘর-বাঁধার স্বপ্ন চিরকালীন। গত শতকে কেবল নারী কবিই নন, পুরুষ কবিরাও গৃহজীবনের বর্ণাঢ্য রচনাতে আপন আপন কাব্যশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনী, কুসুমকুমারী, মানকুমারী, কামিনী রায়ের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, নিত্যকৃষ্ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম এক-সাথে স্মরণীয়। দাম্পত্য, বাৎসল্য, সখ্য প্রভৃতি রস পরিবেশিত হয়েছে। আর পুরুষের কাব্য নারীর জন্য রচনা করেছে মণিরত্নে খচিত সম্রাজ্ঞীর আসন। আর মহিলা কবিদের রচনায় গার্হস্থ্য চিত্র—মা ও শিশুর অনন্ত লীলায় অপরূপ ছবি।

এরপর গৃহ জীবনের কয়েকটি মনোরম ছবি পাওয়া যায়। সেযুগে গিরীন্দ্র-মোহিনীর সাড়া জাগানো 'মান ভঞ্জন', 'কে তোরা', 'গার্হস্থ্য চিত্র'. 'সরসী জলে শশী' নাম্নী কবিতাগুলি বাৎসল্যরসে মধুর। মা ও শিশুর অন্তহীন প্রেম ভাবের খণ্ড খণ্ড চিত্র,—

শিয়রেতে জেগে শশী যেন সে সৌন্দর্যরাশি
নেহারিছে মগ্ন হয়ে ভাবে।
ছেলে ডাকে 'আয় চাঁদ', মা বলিছে 'আয় চাঁদ'
কি করিবে চাঁদ ভাবে মনে।

[গার্হস্থ্য চিত্র]

কিংবা

হয়ো না, সরসি তুমি, মত্ত অহংকারে
ওই দেখ, মাতৃ-অংকে শিশু শোভা ধরে।

[সরসী জলে শশী]

'সরসী জলে শশী' ১২৯১ সালে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি 'ভারতী'তে প্রকাশ সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারী লিখেছিলেন,—

"সে আজ ৪০ বৎসর পূর্বেকার কথা, তখন আমরা থাকিতাম শ্যামবাজার অঞ্চলে কাশিয়াবাগান বাড়ীতে। সবে মাত্র সেই বৎসর ১২৯১ সালে আমি ভারতীর সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ এখানে আসিয়া একটি কবিতা দিয়া বলিলেন, 'কবিতাটি অক্রুর দত্তের বাড়ীর অন্তঃপুরিকার রচনা। লেখাটি ভালই হয়েছে, ভারতীতে দিও।'

তাঁহার বন্ধু ৺গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত ভারতীতে প্রকাশের জন্য কবিতাটি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর সেই কবিতাটিই ভারতীতে সর্বপ্রথমে প্রকাশিত হয়।"[১]

রবীন্দ্রনাথ কাব্যটি পড়ে নির্বাচন করে কবিতাটি সম্বন্ধে উপরিউক্ত মন্তব্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা নিয়ে 'ভারতী' পত্রিকায় লেখার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন গিরীন্দ্রমোহিনী। এরপর ভারতীর পাতায় বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি সোজাসুজি ভারতীতে এসেছে, ছাপা হয়েছে। 'সখি সংবাদে'র দরুণ দুই মহিলা কবি এক অদৃশ্য, অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছেন। কেবল ঐ প্রথম কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের হাতের জয়টিকা পরে এসেছিল।

জীবনের প্রতি প্রেম, স্নিগ্ধদৃষ্টি গিরীন্দ্রমোহিনীর শোক কাব্যটিকে অসাধারণ মূল্য দিয়েছে। গিরীন্দ্রমোহিনীর 'অশ্রুকণা' পর্যালোচনায় বলা যায়—

দুঃখ তাঁহার অসীম পাথার পার হল গো পার হল।

১। স্বর্ণকুমারী দেবী, কবি গিরীন্দ্রমোহিনী। ভারতী, আশ্বিন ১৩৩১

অসীম পাথার পার হওয়া শুধু নয়,—জীবনের কূলে এসে নব উপলব্ধিতে জীবন ধন্য হয়েছে।

শোকের তীব্রতা—মুক্তির সন্ধান—জীবন রস সঞ্চয়ন এই স্তর বিন্যাসে তাঁর নিজত্বের মধ্যেই গৌরব ; —তাঁকে বিখ্যাত করে দেবার এগুলিই মূল কারণ।

নতুন জীবন-চেতনায় যখন তিনি বলেন,

তোমাদেরি মাঝে থেকে লভি নব প্রাণ,
দেখিবারে পাই যদি সন্তোষের মুখ।
এস সবে, পারি যদি হারাতে আপনা,
জীবন-সমুদ্র জলে ক্ষুদ্র বারি কণা।

চেতনা সম্বন্ধ এই উপলব্ধি তাঁকে ব্যক্তিগত শোকের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে পরম আশ্বাসে ভরা জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে পোঁছে দিল।

রচয়িত্রীর জীবিতকালেই 'অশ্রুকণা'র চারটি সংস্করণ হয়েছিল ; এর থেকেই উক্ত কাব্যের জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করা যায়।

আভাষ

হৃদয়ে উথলে মম যে সিন্ধু উচ্ছ্বাস
'আভাষ' তাহার মাত্রা প্রকাশে আভাস।

অন্তরের সিন্ধু-উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ-ভঙ্গের আভাস দিয়ে 'আভাষ' (১২৯৭) কাব্য রচনা করলেন কবি গিরীন্দ্রমোহিনী। আগের তুলনায় তিনি এখন অনেক বেশী সংযতবাক্। আত্মবিশ্বাসে দৃঢ়, চেতনায় বলিষ্ঠ। শ্রেণীবিন্যাস হিসাবে 'আভাষ' গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যের দ্বিতীয় স্তর। সাহিত্যে অধিকতর নিষ্ঠা নিয়ে 'আভাষে'র প্রত্যন্ত প্রদেশে আবির্ভাব। 'অশ্রুকণা'র সার্থকতা, সর্বজনের মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা এবং সর্বোপরি কবিজীবনে প্রতিষ্ঠা সাহিত্যে নবীনা পথিকের দ্বিধা-সংকোচ দূর করেছে। বাঁধভাঙা জোয়ারে কাব্যের গতি এখন অনেক ত্বরান্বিত। সাহিত্য রসিকদের স্বীকৃতি দুঃখের অসহ তাপ থেকে জীবনের লাবণ্য ফিরিয়ে দিয়েছে। বিশ্বাস আনে প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা থেকে বিস্তার। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত কবির মন যেন আলোর রাজ্যের দিকে চলমান পথিক। চেতনা-সম্বন্ধ মন নিয়ে কবি উপলব্ধি করলেন, জীবনটা কেবল দুঃখের কারাগার নয়, এর নিম্ন পরিধি অতিক্রম করলে পাওয়া যায় অনন্ত আকাশের আহ্বান—তার সঙ্গে মুক্তির আনন্দ। সংসার বেষ্টনীর বাইরে মনকে ছড়িয়ে দেওয়া চলে উদার বিশ্ব-প্রাঙ্গণে।

এই যুগটাকে গিরীন্দ্রমোহিনীর বিকাশ পর্ব বলা যেতে পারে। এ কালের রচনা কবির বিভিন্ন মানসিকতার পরিচয়ে সমৃদ্ধ। রূপ-সচেতন কবি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করছেন। এখানে নিজেই হয়েছেন পুষ্প-নারী। বিনা সূতায় মোহন মালা গেঁথে, তার পরেই প্রিয়-বিরহে আকুল। বিচিত্র কুসুমে গ্রন্থিবন্ধ সেই মালা কাকে দেবেন? প্রকৃতির কত বর্ণ। কত বর্ণনা।

কত বৈচিত্র্য—কখনও নিদাঘের গাত্র দাহ করা দুঃসহ জ্বালা, কখনও কোজাগর নিশির—

প্রেমের উৎসবে যেন আজ শশী নিমগন

[কোজাগর নিশি, আভাষ]

আবার,

বিপুল গগন-হৃদি ঢেকে ফেলে নীলিমায়,
তরু তরু নবঘন কোন্ দেশে চলে যায় ?

এই নব ঘন— ঘন কালো রূপে বয়ে আনে ঝড়ের তাণ্ডব—

গাছপালা শাঁ শাঁ করে আসিতেছে ঝড়,
ধূলা উড়ে, পাতা উড়ে, বাঁশ কড়্ কড়্।

[মেঘ, আভাষ]

'সুনীল আকাশে ভাসে বকাবলী'

[বাদল, আভাষ]

চিত্রে বাদল দিনের সুন্দর বর্ণনা দিয়েও কবির মন ডুব দিয়েছে বিরহের অতল পারাবারে।

একা এ আঁধারে বিরহ পাথারে
ভাসিতে পারি না আর।
নিয়ে যা আমারে নিয়ে যা সজনি,
সে ডাকিছে বারবার।

[বাদল, আভাষ]

সমসাময়িক কালের আরেকটি বাদলের চিত্র, ভারতী ও বালক (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩) থেকে উদ্ধৃত—ভাব ও ভাষাতে কত ভিন্নমুখী। এখানে ভাষার পরীক্ষাও যেন করেছেন হাল্কা সুর, লঘু ছন্দে 'বাদল বা চাষার ভাষা' কবিতাটি রচনা। নতুন নতুন শব্দ চয়নে প্রথম থেকেই গিরীন্দ্রমোহিনীর ঝোঁক। এখানে কবিতাটির 'চাষার ভাষা' নামকরণের মধ্যে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

আঁধার করে এসেছে রে মেঘ
ইঃ ইঃ বড় হানতেছে চিক্কুর !
ও ক্ষেন্তর চট্ করে আয় আয়,
গৈলেতে নে তোল্ গোরু বাছুর
উঠোনেতে ভিজে গেল ধান্,
ঝট্ করে মা, গামছাখেনা আন্।

বাদল দিনের স্পষ্ট, সুন্দর একটি চিত্র।[১]

১। ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩, পৃঃ ১১৩

চাষীর মুখে ভাষা জোগান দিতে নতুন শব্দ যোজনায় কবি যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন—

বৈকালেতে 'রুমশে গেছে ক্ষেতে
কি যে হোল পেলেক্ নাহি থল ?
বড় বড় দোসক আসতেছে
সক্কলেতে মাজের ঘরে চল্।
নিত্তি নিত্তি এমন দুযুগ,
পিথীবী বুঝি যাবেক রোসাতল ?

চাষীর মুখের ভাষা ও ভাবনায় 'বাদল'-এর দুর্যোগপূর্ণ চিত্রটি রূপময় হয়েছে।

আরেকটি বর্ষার ছবি 'আভাষ'-এর (গ্রন্থাবলী) ৪৪নং কবিতায়। ঘন কালো মেঘ, অস্পষ্ট হয়ে আসা সামনের জগৎ—যার 'আনমনে বাতায়নে বিমোহিত কবি'। কিন্তু রূপতন্ময়তা ভেঙে গেল ধারাবর্ষণে; 'এসে ছাট্ ভেজে খাট্ বন্ধ জানলা দোর'—এখানেই সমাপ্তির রেখাঙ্কন।

কবির 'মুগ্ধ আঁখি'তে প্রকৃতির ক্ষুদ্র বৃহৎ কিছুই বাদ পড়েনি। কিন্তু মাঝে মাঝেই সে ছবি বেদনাম্লান—তাঁর নিজের জীবনের প্রতিচ্ছায়ার মত,—

মলিনা অপরাজিতা
চারু লজ্জাবতী লতা,
মৃণালিনী বিকশিত ঢল ঢল সরোবরে।

[মুগ্ধ আঁখি, আভাষ]

এখানে অবশ্য কমলিনী পূর্ণ প্রস্ফুটিতা, কিন্তু একটু আগেই 'প্রভাতে পদ্ম'র বর্ণনায় বলছেন,

প্রতি দল তার সরমে কুণ্ঠিত, অরুণ ঢাল গো আলো।

* * * * * *

না ঢালিলে কর, আধ মোদা থর আর না খুলিবে পাতা।

[প্রভাতে পদ্ম, আভাষ]

একি তাঁর নিজের অপূর্ণ জীবনের অন্য রূপায়ণ! আবার গোলাপের বর্ণনায় দেখা যায়, ফুলের রাণীর পাগল করা রূপ নয়। এ যে বিশীর্ণ—জীবন থেকে খসে পড়া—

রূপের যৌবন গিয়াছে ঝরিয়া, ফুরায়ে গিয়াছে মধু,

... ...

তাই, ঝরা দল চেয়ে ব্যথিত হৃদয়ে, কবি গাঁথে গীতমালা।

[সায়াহ্নে, আভাষ]

কবির সৌন্দর্য পিপাসা তন্ন তন্ন করে দেখে সব, কিন্তু দৃষ্টি যে ব্যথায় মলিন, এজন্য দুঃখভাগই কবিতায় প্রধান হয়ে ওঠে। কাকাতুয়ার বন্দিত্ব তাঁকে আঘাত

করে, শৃঙ্খল-মুক্ত করে দিতে চান অনন্ত আকাশের পাখীকে। পাখী কেবল উড়েই যাবে না—জগতের পথে পথে নারীর দুঃখে সুর তুলবে,—

অযুত নারীর প্রাণ, নর করে বলিদান,
হয়েছে, হতেছে আরও হবে, স্বার্থে ভুলে।

[কাকাতুয়া, আভাষ]

পাখীর 'চোখ গেল' আর্তনাদে জীবনের বিষময় দিক তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়—

চোখ গেল—পরাণের মলিনতা দেখি,
চোখ গেল—সরলতা-হীন বসুন্ধরা,
চোখ গেল—ধনীদের দীনে ঘৃণা করা,
চোখ গেল—মানবের স্বার্থপর প্রাণ,
চোখ গেল—রমণীর নিস্মর্ম পরাণ।

[চোখ গেল, আভাষ]

এই বিষণ্ণ আকুলতা কেন ? একি সেই যুগের রোমান্টিক বিষাদ, না কি নিজের জীবনের ব্যথাবাষ্প, ফাঁক পেলেই ছাড়া পেতে চায়।

'ভগ্ন দেবালয়' অতীত গৌরবের তুলনায় কী করুণ ছবি ?

নরনারী সবে মিলে ভক্তিভাবে গাহিত বন্দনা গান,
শঙ্খ ঘণ্টা রব, ধূপের সৌরভ, পবিত্র করিত প্রাণ।
বিকট করাল নিরদয় কাল, হায় এ কি তার দশা,
সে দেব নিলয় শিবার আলয়, পেঁচক, বায়স বাসা।

[ভগ্ন দেবালয়, আভাষ]

'কল্পনা'য় রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নমন্দিরে'র চিত্র প্রায় এক কিন্তু দৃষ্টিভংগি আলাদা। কাজেই গিরীন্দ্র মোহিনীর, 'বিকট করাল নিরদয় কাল', অতিক্রম করে রবীন্দ্র-বাণী কি বার্তা, কি সুগন্ধ আনে মনে প্রাণে—

যে ফুল রচেনি পূজার অর্ঘ্য
রাখেনি ও রাঙা চরণে,
সে ফুল ফোটার আসে সমাচার
জনহীন ভাঙা পবনে।[১]

১৩০৬ সালে রচিত এই কবিতা গিরীন্দ্র মোহিনীর 'ভগ্ন দেবালয়ে'র বহু পরে রচিত কিন্তু 'স্মরণ' এর দুঃসময় তখনও আসেনি। রবীন্দ্র কাব্যভাবনা প্রভাত কুসুমের মত অম্লান।

দীর্ঘকাল পরে ১৩৩০ সালে 'পূরবী'তে লেখা 'ভাঙা মন্দির' রূপের দিক দিয়ে সমগোত্রীয় হলেও ভাবের দিক থেকে একেবারে ভিন্নধর্মী। তিনি তখন রূপ-

---

১। 'রবীন্দ্রনাথ, 'ভগ্নমন্দির', কল্পনা (১৩০৬), রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্ম শত বাঃ সং) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫২।

অরূপের জগৎ অতিক্রান্ত। গীতাঞ্জলি, বলাকার যুগও পার করেছেন ; দৃষ্টি ফিরে এসেছে আবার রূপের সীমানায়, দৃষ্টি রূপ স্নিগ্ধ, রসতৃপ্ত।

'অতীতকালের আনন্দরূপ বর্তমানের বৃন্ত দোলায় দোলে।'[১]

মন শান্ত ও সমাহিত হয়েছে নবীনতর ভাবানুষঙ্গে। জীবনের প্রান্তসীমায় এসে বাণীও তাঁর রসমধুর।

'এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো'।[২]

এই পর্যায়ে 'ভাঙ্গামন্দির' তাঁর চোখে আবার নতুন ভংগিতে দেখা দিল,—

সুন্দর এসে ঐ হেসে হেসে
ভরি দিল তব শূন্যতা
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
ভিত্তিরন্ধ্রে বাজে আনন্দে
ঢাকি দিয়া তব ক্ষুণ্ণতা
রূপের শঙ্খে অসংখ্য জয় জয়।[৩]

জগৎ বা জীবনকে চেয়ে দেখা গিরীন্দ্রমোহিনীর কিন্তু সবসময় হাস্যোজ্জ্বল থাকেনি, মাঝে মাঝেই তাতে ব্যথা ঘনিয়ে এসেছে। অসীম, অনন্তবিহারী মন কেন দেহ কারাগারে বন্দী। কবির এ এক আর্তজিজ্ঞাসা—

বিপুল প্রেমের হৃদি, কোন্ দোষে তার বিধি
অস্থিময় ক্ষুদ্র কারাগার ?

[কারাগার, আভাষ]

গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যরচনা যে কী পরিমাণ সার্থকতা লাভ করেছিল, তা আমরা 'কবিতাহারে'র যুগ থেকেই দেখেছি। 'অশ্রুকণার' প্রকৃত মূল্যায়ন তো হয়েছে বিপুল অভিনন্দনে !

এই উল্লিখিত 'কারাগার' কবিতাটি দৃষ্টি এড়ায়নি পাঠক সমাজের ; একজন রসগ্রাহী পাঠক কাব্যেই উত্তর দিয়েছেন—

দেহ নহে কারাগার নহে অস্থি-চর্ম্মসার,
নহে হেয় তুচ্ছ এ শরীর !
পবিত্র অক্ষয় বট মাটীর মঙ্গলঘট
হৃদি-রূপা দেবতা মন্দির।

[উত্তর, অভাষ]

গিরীন্দ্রমোহিনীর রচনা সার্থক। পাঠকের রসবোধ উদ্দীপ্ত করাই সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

১। পূরবী, পূরবী, রবীন্দ্র রচনাবলী ২য় খণ্ড, (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) পৃঃ ৬১৫
২। ঐ ,, ,, ,, ,, ...
৩। ভাঙা মন্দির, পূরবী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) পৃঃ ৬৩৩

'আভাষে'র কিছু কিছু কবিতা মধুসূদনের কাব্য ও কবিতাকে স্মরণ করায়। খ্রীষ্টধর্মী সাহেববেশী মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা কাব্য বাদ দিয়েও দেখা যায়, পুরাণের নারীরা বারবার তাঁর চিত্রপটে ধরা পড়েছেন। সীতা, শকুন্তলা, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উর্বশীকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেও তাঁর অন্তরের পূর্ণ তৃপ্তি হয়নি। প্রেমের জোরে হিড়িম্বা ও কামনার্ত শূর্পনখা স্থান করে নিয়েছে একপাশে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যেও নারীর বিচিত্ররূপ বহুদর্শিত। রাধা সখীবৃন্দসহ তাঁর কাছে মধুররসে যতখানি অন্তরঙ্গ, বিস্মৃতা শকুন্তলার লাঞ্ছিতা মূর্তিখানিও ততখানি বেদনাদায়ক। প্রকৃতি-মুগ্ধা 'কবির বসন্তে কানন-রঙ্গ' একটি জীবন্ত চিত্রনাট্য।

নারীর রূপাঙ্কনের সুন্দর উপমা রচনা করেছেন, 'মুগ্ধা বা সন্দিগ্ধা', 'বয়ঃসন্ধি', 'নবোঢ়া', 'যুবতী', 'বাসর-সজ্জা', 'প্রোষিতভর্তৃকা', 'বিরূপিনী', 'প্রেমিকা', 'কামিনীগুচ্ছ বা বালিকা বিধবা', 'সুন্দরী' ইত্যাদি নামাঙ্কিত কবিতাবলিতে। রাধার চিত্র ভেসে ওঠে এই আধুনিক পদাবলীতে—রমণীর সুশোভন গতিভঙ্গে!

বসে ওই মেঘের পরে সাধ করে সই যাইলো ভেসে,
হৃদয়ের ধন, প্রাণের রতন আছে যথায়—যাই সে দেশে।

[প্রোষিতভর্তৃকা, আভাষ]

'প্রোষিতভর্তৃকা'য় কবির এই বিরহ কথন, এতো ব্রজবালার দুঃখসংলাপ।

পূর্বরাগ, বয়ঃসন্ধি, মিলন, মাথুর রাধার সবকটি রূপকল্প উল্লিখিত কবিতাবৃন্দে চিত্রিত হয়ে একখানি পদাবলী রচনা করেছে।

'কাহে বালা পুছসি', 'কবে' এবং অন্যান্য কবিতাতেও 'ব্রজবুলি' ভাষা তার ভাবের বাহন হয়েছে।

শিশুরা তাঁর অন্তরের অনেক স্থান জুড়ে আছে। তাদের কলকাকলিতে তাঁর মনের গুরুভার নেমে যায়। দুঃখের সংসারে এরা এনেছে নন্দনের আশীর্বাদ। তাঁর চিত্রগুলি যেন সেখানকার বাণীবহ। 'স্বরগের ভাষ মুখেতে প্রকাশ ফোটে আঁখিপথ দিয়া', 'স্নেহ উপহার' 'অনাহূত', 'অমিয়াবালা' স্বর্গের বর্ণ গন্ধ মাখা এই দেব শিশুরা স্রষ্টাকে স্মরণ করায়—

কি প্রেমিক সেইজন যাঁহার এ সিরজন,
স্মরিয়া, নয়ন নীরে ভাসি।

[অমিয়াবালা, আভাষ]

আলোছায়ার দোলা বা সুখদুঃখের আলোড়ন তাঁর চিত্তে বারবার ওঠানামা করেছে। দুঃখকে চাপা দিতে চেয়েছেন, নানা কথার জালে। কিন্তু অন্যমনস্কতার

অবসরে দুঃখ বেরিয়ে পড়েছে শোকদীর্ণ চেহারা নিয়ে। সচেতন হয়ে মনকে আবার নিষিক্ত করেছেন জীবনরসে—

বৈরাগ্যের নামে কভু নির্ম্মমতা, এসোনা নিকটে মোর।
ভালবেসে সুখ, কেননা বাসিব, ছিঁড়িব, মমতা-ডোর?
... ...
প্রেমের জগতে তুমি হে বিরাগ, বৃথা ভ্রম মিছামিছি।
ফুল, পাতা, পাখী প্রাণে মেশামিশি, সবে লয়ে সুখে আছি।

[নির্ম্মমতা, আভাষ]

এই জীবনতৃষ্ণাই তাঁর কাব্যকে মহনীয় করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য'র উপচার—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।"

জীবনামৃতে পরিপূর্ণ।

গিরীন্দ্রমোহিনীর উল্লিখিত পংক্তি কয়টি রবীন্দ্র দর্শনের পরিবৃত্তে স্থান পাবার উপযোগী। এগুলি একই ভাবাভিষিক্ত। গৃহপিঞ্জরে বন্দিনী নারীর অপরিণত বয়সে এই চেতনা বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বহু পরে রচিত, সুতরাং এ ভাবনা গিরীন্দ্রমোহিনীর আপন হৃদয়-সঞ্জাত। এই প্রসঙ্গেই আরেকটি কবিতা উল্লেখ্য। 'পুনর্ম্মিলনে' কবিতাটিও গভীর ব্যঞ্জনাময়। বাধাই যাঁর জীবন, আঘাতই যাঁর পাওনা, সেই ক্ষতবিক্ষত অন্তরে উপলব্ধির বিরাটত্ব, তাঁর উত্তুঙ্গ ধ্যান-ধারণার পরিচয়বাহী।

কভু কি সেদিন হবে,
যেদিন প্রেমের ভবে
মিশিবে সবার প্রাণ
সবাকার সনে?
ক্ষুদ্র আমি ডুবে গিয়া, উঠিবে বিরাট হিয়া,
করুণার অশ্রুধার বহিবে নয়নে!
প্রীতির পুলক ভাতি নিরাশি আঁধার রাতি
চাহি সত্য সনাতনে হইবে ব্যাকুল;

[পুনর্ম্মিলনে, আভাষ]

আবার আসি রবীন্দ্র প্রসংগে। কাব্যের ভালমন্দ, উত্তম মধ্যমের মান নির্ণয়ে রবীন্দ্র সাহিত্যের মত এমন কষ্টিপাথর আর কোথায়? নৈবেদ্যর ৯৭ সংখ্যক কবিতায় নিজ ক্ষুদ্র আমিত্বের অবসানে বিশ্বমানবতাবোধ স্মরণীয়।

নিজ ক্ষুদ্র দুঃখ সুখ জলঘটসম
চাপিছে দুর্ভর ভার মস্তকেতে মম।

ভাঙি তাহা ডুব দিব বিশ্ব সিন্ধুনীরে
সহজে বিপুল জল বহি যাবে শিরে।"[১]

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সঙ্গে মিল হওয়াটাই সাহিত্য সাধনার পরমপ্রাপ্তি ; ভাষা ও ছন্দে নাই বা হল অত শোভন সুন্দর, সে তো অপ্রত্যাশিত। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে চারদেওয়ালে আবদ্ধ একজন কুলবধূর পক্ষে চিন্তার এই সমুন্নতি, শ্রেষ্ঠ মানবদণ্ডে তার মূল্যায়ন, এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে! অথচ তাঁর এই সমীক্ষণ কত স্বল্পমেয়াদী, যখন দেখি তাঁর প্রতিবেশী জগৎ তাঁর ঊর্ধ্ব-চারী মনকে নামিয়ে এনেছে হিসাব, নিন্দার সমতলে,—

কথার সুরে শোনা যায় তাঁর নিভৃত-কান্নার প্রতিধ্বনি,

কি বলিব লোক নিন্দা ভয়ে
কাঁপে মোর অবলা পরাণ
কেমনে সবার মাঝে পশি
গাব আমি জীবনের গান।

[অবলা, আভাষ]

কোথায় গেল নারীদের উদ্দেশে বন্দনা গান! নবযুগের বার্তাবহদের সুধার ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেল নাকি! মধুসূদন গতায়ু কিন্তু তাঁর মানসকন্যার দৃপ্তকণ্ঠ তো কান পাতলেই শোনা যায়,—

আমি কি ডরাই সখী, ভিখারী রাঘবে।[২]

এই রাঘব তো ব্যক্তি বিশেষ নন, ইনি যুগ প্রতীক। কিন্তু প্রমীলার অমেয় শক্তি তো নারী কণ্ঠে আর সঞ্চারিত হয় না। প্রমীলার চিতারোহণেই কি সব বীর্যের অবসান। না হলে কেন আর্তস্বর আবার ধ্বনিত—

নহি দেবী, জননী, ভগিনী,
(তা হইলে) মম নিন্দাবাদে তব গেহ
আনন্দে জাগ্রত কেন শুনি!
আমাদের থাকিলে সম্মান
(পুরুষের) ধর্ম্মরাজ্য যেত না অতলে।

[অবলা, আভাষ]

'বসে বসে', 'বিরহ-সাগরে', 'হিংসুক', 'জানিনা', 'ভিক্ষা', 'সাথীহারা' প্রভৃতি কবিতায় গিরীন্দ্রমোহিনীর পীড়িতকণ্ঠে এই সময়কার আর্তনাদ। এ সময় দুঃখ সাগরের কূলে বসে তাঁর ঢেউ গোনা চলছে! ঢেউয়ের তালে তালে তাঁর সকল ভাবনা ওঠা নামা করছে। দুঃখের আঘাতে এক একবার চিন্তাধারা নেমে এসেছে

সংসার জীবনের রোজনামচায়, আবার প্রাণপণ শক্তিতে আকাশচারী হয়েছেন। একমাত্র লক্ষ্য তাঁর মুক্তি, সে তাঁকে পেতেই হবে, সে মিলবে ঐ আকাশের পারে—

যে চাহেনা প্রেম প্রতিদান,
তারে আমি দিতে পারি প্রাণ।
হেন পূর্ণ কাহার হৃদয় ?
ভ্রমি খুঁজে সেই প্রেমময়।

এই যে প্রেমিক-হৃদয়ের সন্ধান, জীবনের সকল দায় সমবণ্টন করে ভারমুক্ত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বোধহয় তার দেখা মিলল। সকল ব্যথার শান্তি ওখানে—

মরণ নামেতে এক প্রিয়তম আছে মোর,
দিবানিশি তার লাগি ঝরিছে নয়ন লোর !
... ...
স্বপনেতে নিশি তার কোলে মাথা রাখি,
কহিতে কহিতে ব্যথা যেন গো মুদেহি আঁখি।
... ...
নিত্য তাঁর বাঁশী শুনি
গৃহে হই উদাসিনী—

[মরণ, আভাষ]

ভানুসিংহ ঠাকুরও মরণ সম্বন্ধে একই কথা বলেন।

মরণ রে,
তুহুঁ মম শ্যাম সমান।[১]
... ...
দূর সঙে তুহুঁ বাঁশি বজাও সি
অনুখন ডাকসি
রাধা রাধা রাধা।[২]

তবে কি এখানেই কবির জীবন যাত্রার সমাপ্তি ! কিন্তু সৃজনশীলতা যাঁর ধর্ম, তিনি তো থেমে থাকতে পারেন না—চলার আবেগে নতুন নতুন ভাবে রচনা করে যান। অশ্রুধারায় অন্তরের গুরুভার ধুয়ে লঘু হতে চাইছেন,—

তোরে কাছে পেলে দুঃখে সুখ মেলে
লঘু হয় গুরু ভার।

[অশ্রু, আভাষ]

কিন্তু বাধা অনেক, অনতিক্রম্য পথও অনেক, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাই বলতে হয়,—

ছেড়ে দাও পথ যাই আমি চ'লে
গেয়ে খালি দুটি গান।

১, ২। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড (ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী—১৯নং), পৃঃ ১৪২, ১৪৩

হায় ! হৃদয় আমার, অতি গুরুভার,
অতি সে বিবশ প্রাণ ।

[জগৎ, আভাষ]

স্বকৃত চেষ্টায় আবার উঠেছেন, বাধা গতির ঊর্ধে তরঙ্গায়িত জীবনের শীর্ষে। শত শুভ চিন্তা নিয়ে প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি প্রস্ফুট কমলের মত মেলে দিতে চেয়েছেন 'সদ্‌গ্রন্থে'—

তোমার মতন যেন হয় মোর প্রাণ,
মুমূর্ষু করিতে পারি সজীব সুন্দর,

[সদ্‌গ্রন্থ, আভাষ]

দেবী সরস্বতীর আরাধনা তাঁর শ্রেষ্ঠ সাধনা। আরাধ্যা দেবীকে জীবনের সকল অবস্থায় স্মরণ করেছেন। প্রতি বসন্ত পঞ্চমীতে বাণীর অর্ঘ্যে দেবীর নৈবেদ্য রচনা করেছেন। বিদ্যাও তাই অপরূপ মূর্তিতে তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। বিমূর্ত বিদ্যা শোভন মূর্তিতে আমাদের কাছে উদ্ভাষিত।

দর্শন, বিশাল আঁখি,
হৃদয় ভূগোল দেখি,
সুগঠন রসায়ন, সঙ্গীত মুখ কোমল,
কবিতা, মধুর ভাষা,
অধ্যাত্ম, সুসূক্ষ্ম নাসা,
জ্যোতিষ বরণ জ্যোতি : সুচিত্র বসনাঞ্চল।
রূপে মুনি মন টলে,
নয়ন নিমেষে ভুলে,
গণিত চিকুর জাল, জ্ঞান, সমুজ্জ্বল ভাল।

[বিদ্যা, আভাষ]

বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনন্দন ধন্য এই কবিতা পাঠে আমরা বিমুগ্ধ চিত্তে বলি, 'আভাষ'এ ভাব-ভাবনা সুন্দর কিন্তু 'বিদ্যা'য় এসে বলতে হয় তুলনা এর নাই।

শিখা—(১৩০৩)

জীবনের অনেক উত্থান-পতন, অনেক পথ অতিক্রমণের পর কবি গিরীন্দ্রমোহিনী, তাঁর কাব্যের তৃতীয় পর্ব বা পরিণতির যুগে এসে পৌঁছালেন। অল্প বয়সের অনভিজ্ঞতার স্তর পার হয়ে একটা স্পষ্ট জীবন চেতনায় উন্নীত হয়েছেন। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়েছে, শোকের আবরণ ছিন্ন হয়েছে। এখন তিনি অনেক সবল, কণ্ঠস্বর সংশয়ে কাঁপে না, সংকোচে শিথিল হয় না। বরং অন্তরে বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা অনেক বলিষ্ঠ হয়েছে। বলার ভঙ্গীতেও পূর্বের সেই কুণ্ঠাজড়িত অনুচ্চ ভাষণের যুগ আর নেই। রক্ষণশীল ঘরের সহায়হীন বধূর সাহিত্যের এই ক্রমবিকাশ রীতিমত বিস্ময়ের প্রশংসার ও শ্রদ্ধার।

সতত প্রয়াসে তিনি তাঁর সাহিত্য প্রচেষ্টাকে নিতে পেরেছিলেন শৈল্পিক সিদ্ধির উচ্চ-প্রাংগণে। 'অর্ঘ্য' ও 'শিখা'র পর্যায়ে আত্মদর্শন তাঁর বাকভংগীতে অনেক সাহস জুগিয়েছে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি প্রেম যেমন দৃঢ়তা ও নম্রতায় রমণীয়, আত্মপ্রেমের ঘোষণাতেও তেমনি ঋজু ও স্পষ্টবাক্। 'শিখা'র 'কারে ভালবাসি' এই জিজ্ঞাসায় কবিদৃষ্টিতে স্বর্গ-মর্ত্য আলোড়িত হল, সমস্ত প্রকৃতি তন্ন তন্ন করে নিরীক্ষণ হল, মন্থন হল অতীত বর্তমান ; শেষ পর্যন্ত

ধীরে ধীরে এল নীরে ভ'রে দু'নয়ন
চমকি আপনাপানে করি নিরীক্ষণ,
মায়াবন্ধ, কায়াবন্ধ অনিন্দ্যসুন্দর,
দীপাধারবর্তী যথা দীপ মনোহর,
সেই আমি আপনারে করি নিরীক্ষণ
কহিনু বাসিনা ভাল কাহারে এমন ।

[কারে ভালবাসি, শিখা]

বলার এই বলিষ্ঠতা কোথায় পেলেন একজন নেপথ্যচারিণী ! বাধা, ব্যঙ্গ, ভ্রূকুটি যাঁর নিত্য পাওনা ; স্বামী প্রেমের নিশ্চিন্ত আশ্রয় যাঁর অপসৃত, তাঁর এই মর্মভাষণ যে অত্যন্ত দুঃসাহসের তাতে সন্দেহ নেই। হয়তো দুঃখ আঘাতই তাঁর মনোবলকে দৃঢ় করেছে, আত্মপ্রেম তাঁর জীবনে সকল প্রেমের মূল। গোড়ার এই ক্ষমতা তাঁর সকল শক্তির প্রেরণা জুগিয়েছে। 'অর্ঘ্যে'র 'তুমি' কবিতাতেও একই চেতনার উদ্ভাস। আত্মকেন্দ্রিক প্রেম বৃহত্তর বৃত্তে বহিরাশ্রয়ী হয়েছে।

আমি ভালবাসি চিত্ত আপনার
ভালবাসি তাই হৃদয় সবার।

[তুমি, অর্ঘ্য]

এই জীবনদর্শন তাঁর সাহিত্যকে এক উন্নত রসলোকে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু নিজের মনোবলই তাঁর সকল কর্মের প্রেরণা একথা বললে অনুক্ত থেকে যায় অনেক কিছু। স্বর্ণকুমারীর বন্ধুত্ব এ সময়ে তাঁর শূন্যজীবনে সঞ্জীবনী সঞ্চারিকা, কৃতজ্ঞচিত্তে সে কথা স্মরণ করেছেন বহুবার। তাঁর জীবনের এক দুর্লভ মুহূর্তে নব যুগের প্রাণচেতনার মর্মমূলে যুক্ত হয়েছিলেন। জ্ঞান ও সংস্কৃতির সাধনপীঠ ঠাকুরবাড়ি তখন জাতির বহু প্রত্যাশার কেন্দ্রভূমি। অ-চিন্ত্য বাণীর, অ-ভূত কর্মের জন্মস্থল ঐ গৃহের জ্যোতির্বলয় এবং তার মধ্যবিন্দু রবীন্দ্রনাথের নৈকট্য ও যোগসাধন মিলেছে অতি সহজেই। প্রিয়তমা সখির অনুজ,—সেই হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সস্নেহ কৌতুকের নানা উল্লেখ পাওয়া যায় 'মিলন কথা'য়। এছাড়া সাবিত্রী লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ চন্দ্র দত্তের সঙ্গেও ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রীতির সম্পর্ক। 'ভারতী'তে দেবার জন্য গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতা গোবিন্দচন্দ্রের হাত দিয়েই রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিল। দুই সখীর মিলন দুই পরিবারকে

অন্তরঙ্গ করেছিল। গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবনে এই মিলনের প্রয়োজন ছিল। তাঁর ভগ্ন-হৃদয়ে আবার প্রাণোত্তাপের স্পর্শ লেগেছে। শুষ্কতার অন্তঃপুরে রস-সিঞ্চনে নতুন আশ্বাসে পূর্ণ হয়েছে প্রাণ। বসন্ত-বাতাসের স্পর্শে বনভূমিতে অজস্রতার প্লাবনের মত গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবনেও এসেছে রসবন্যা। এদিকে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', 'সোনার তরী'র যুগ অতিক্রান্ত। রবীন্দ্রদীপ্তি তখন প্রান্তসীমা ছেড়ে মধ্য-গগনে স্ব-মহিমায় বিরাজিত। রবীন্দ্র-বাণীতে জীবনের রূপ, রস অনির্বাচ্য মহিমায় প্রকাশ হল গিরীন্দ্রমোহিনীর কাছে। পূর্ণতার আশীর্বাদে প্রাণ তাঁর ভরে উঠছে, সেই পূর্ণ প্রাণের নিবেদন এই 'শিখা' কাব্য।—

সখি!

বদ্ধ মুকুলের সাথে সুরভির মত
অবরুদ্ধ প্রেমরাশি হৃদে করে বাস ;—
কি অভিসম্পাতে কার জানি নাক তাহা,
বাহিরে ফোটে না কভু ক্ষুদ্র এক শ্বাস।

'আভাষ' কাব্যেই তাঁর মিলনের প্রীতিবন্ধনকে অক্ষয় করে রেখেছেন 'মিলন' কবিতায়। 'কেন' এবং 'সরলা' কবিতায় প্রিয় সখীর আত্মজাদ্বয়ের প্রতি বাৎসল্যের উন্মুখ আবেগ। ব্যক্তিজীবনের সংকট ও অবরোধের সংকোচ সে সময়ে বহুলাংশে দূরীভূত। 'স্বপ্নান্তে' কবিতাতেই নবজীবনের আভাস। তারপর প্রকৃতি দৃষ্টিতেও নবীনতার স্পর্শ! ঋতু-পরিক্রমায় নববসন্তের আবির্ভাবে, কোকিলের ডাকে সাড়া জাগে কি শুধু বনে, চেতনার আভাস দেখা যায় কবির মনেও, ভগ্ন হৃদয়ে তবু সন্দেহ থেকে যায়। শুভ কি অশুভ আশঙ্কা,—

যা দিবে সহিতে হবে পারিবনা ব'লে কবে
কে পেয়েছে ত্রাণ ?
দিবস কি বিভাবরী, শুধু এ প্রার্থনা করি
লভি ধ্রুব জ্ঞান।

[নববর্ষে, শিখা]

দুঃখকে তিনি ভয় পান না। দুঃখ আসুক, ব্যাঘাত আসুক, বুক পেতে নেবেন, কেবল তাঁর আত্মার কামনা, জ্ঞান যেন হয় অবারিত, মুক্ত ও স্বাধীন।

যেন কভু পথহারা অজ্ঞান অতলে সারা
নাহি হয় জীবন আমার
আসুক ঝটিকা ঘোর কাটুক জীবন ভোর
ধ্রুবলোকে পাই পুনর্বার।

[নববর্ষে, শিখা]

এই ধ্রুবলোকের সন্ধানে চিত্ত তাঁর অতন্দ্র সাধনায় মগ্ন, তাঁর প্রথম তপোসিদ্ধি প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের মাঝে। ঋতুরংগ প্রাণ ভরিয়ে দেয়, চোখ জুড়িয়ে

দেয়; হৃদয় মেতে ওঠে জীবন উৎসবে। বসন্ত-দূতের সংগীত তরংগে হয় চৈতন্যের উদ্বোধন।—

ঐ পুষ্পিত সৌন্দর্য রাশি ভরে নিতে প্রতি অঙ্গে
গন্ধ বিলোপন
আকণ্ঠ পূরিয়া পান করি অবগাহ স্নান
পরিধান লাবণ্য বসন।

[কোকিল, শিখা]

ঋতুর সব দ্বার একে একে অতিক্রম করেন, অন্তর তৃপ্ত হয় রসের অবগাহনে। তাঁর কাব্যবীণায় সুরের ঝংকার ওঠে, 'নববর্ষে', 'আষাঢ়ে', 'শ্রাবণে', 'ভাদরে'। 'বর্ষাসঙ্গীত-এ শত বিরহী হিয়ার কত গোপন ব্যথা, কত না-বলা বাণী। 'সজল জলদ পাতে' অস্ফুট লেখা তিনি পড়তে পান। উদাস হৃদয় তাঁর ভাবনা উতল হয়। শরতের আলোক সাগরেও মনের ভাব কাটে না। সৌন্দর্যের মাঝেও জাগে তাঁর মৃত্যুভাবনা।

ওই মেঘখণ্ড মত অমনি মরণ কি রে
পাবে এই প্রাণ?
অমনি সুধার স্রোতে অমনি অকূল নীলে
হবে অবসান?

[শরৎ নিশীথে, শিখা]

রূপ সাগরে ডুব দিয়ে রূপ-কথাকে ছন্দে গেঁথে তোলেন। অন্তরের অবরুদ্ধ ভাবকে বাণীমাল্যে করেছেন গ্রন্থিবন্ধ। কিন্তু 'আষাঢ়ে' কবিতায় প্রকৃত শব্দ-চয়নে, ব্রজবুলি ভাষার মাধুর্যে, ভাবের গাম্ভীর্যে তিনি সঙ্গতি রাখতে পারেন নি, তবু তাঁর উদ্যম, প্রচেষ্টা তুলনাহীন।

'বরিহা অকূল বিরহী ব্যাকুল' এই অশ্রুভরা দীর্ঘশ্বাসের গভীরতার হঠাৎ ছন্দ পতন হয়, যখন তিনি তরল সুরে বলেন,

কে জানে কেনই ও দুটি বাবুই
ভিজিয়া ভিজিয়া মরে?

[আষাঢ়ে, শিখা]

অথবা,

শিরে ঝরে পানি ফেলে জালখানি,
জেলে ধরে শিঙ্গী, কই;

[আষাঢ়ে, শিখা]

প্রথম যুগের রচনা থেকেই নতুন নতুন শব্দ যোজনায় তিনি পরীক্ষায় মেতেছেন। 'কবিতাহার' 'টাইফইডাগ্নি' 'গবর্নমেন্টাদেশ' এই ধরনের সন্ধি, দুই বিজাতীয় ভাষায় জোড়কলমের চেষ্টা। কিন্তু পরিণতির স্তরে ভাবসাম্যের এই

ছন্দপতন পীড়াদায়ক। সহজ সুরে, সহজ ছন্দে লিপিবদ্ধ করে 'আষাঢ়ে'র বাণী অনেক বেশী মনোগ্রাহী করতে পারতেন।

নতুন প্রেরণা, অর্থদ্যোতনা জীবনকে অতিবৃত্তে এনে ফেললেও পুরোনো প্রেম তাঁর কর্মচঞ্চল ব্যস্ততার মধ্যে বিস্মৃত অতীতকে নাড়া দিয়ে যায়।

জানি সে আমারে জানয়ে পাষাণী,
তবু সাধ যায় শুনিতে সে বাণী,
হরষ কি ম্লান সেই মুখখানি,
না জানি কেমন আছে?
[জানিতে বাসনা, শিখা]

'মান, মানে, মানান্তে' চোখের জলে ভেসে যাওয়া হারানো দিনের করুণ মধুর স্মৃতিকণা—ভাবনার গভীরে বর্তমান তলিয়ে যায়।

নড়িলে পল্লব হ'লে মৃদুরব
মনে ভাবি বঁধু আসে
চারিদিকে চাই দেখিতে না পাই
আঁখিনীরে হিয়া ভাসে।
[মান, মানে, মানান্তে, শিখা]

বক্তব্যের কারুণ্য বেদনার চেয়েও গীতগোবিন্দের ললিত মধুর ঝংকারের দিকেই শ্রুতিকে বেশী আকৃষ্ট করে।

পতিত পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥[১]

কবি যেন স্বয়ং বৈষ্ণব-পদাবলীর মধুর তীর্থে উপস্থিত, ব্রজের রসলীলা নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করছেন:

যখন সে এসেছিল
সেধেছিল পায়;—

এও রাধিকার মানভঞ্জনের আধুনিক উক্তি। গীতগোবিন্দের বিখ্যাত পংক্তি 'দেহিপদপল্লবমুদারম্'-কে স্মরণ করায়।

গরবিনীর মান যায় না—বাঞ্ছিত জন চলে যাওয়ার ক্ষণে মোহ-ভ্রান্তিতে মন আচ্ছন্ন। পরিণামে চোখের জল, শূন্য হৃদয়ের আর্তনাদ—

বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।[২]

রাধার মত তাঁরও ভাব-সম্মিলন হয়। স্বপ্নে বা ভাবে প্রিয়জনের উষ্ণ স্পর্শে ক্ষণিকের জন্য জীবন মিলন-মধুর মনে হয়,—

১। গীতগোবিন্দ, জয়দেব (বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৩৫, চতুর্থ সংস্করণ) পৃঃ৭৩
২। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড (প্রেম—৩৮৩ নং) পৃঃ ৩২৫

দরশন সুধা, পরশন সুধা, স্মৃতি যার সুধামাখা,
সারা নিশিশেষে শুকতারা মত, সে আজি দিয়েছে দেখা ঃ
কি সুধার মোহ সিঞ্চিত পরাণে, মুছে না আঁখির ঘোর
পরাণে পরাণে একি রে পরশ হরষে অবশ ভোর।

[ঈপ্সিত মিলন, শিখা]

এরপর গিরীন্দ্রমোহিনী আত্মসম্বিত ফিরে পান, অতীতের ছায়াচ্ছন্ন তীর থেকে বর্তমানের রৌদ্রঘন বাস্তবে প্রত্যাগমন করেন। গ্রহণলাগা অন্তরকে মুক্ত করেন সফল প্রয়াসে। কামনা বাসনার ক্লেদাক্ত স্পর্শে প্রিয়কে পাওয়া যায় না, প্রাত্যহিকতার ম্লানস্পর্শের ঊর্ধ্বে তার স্থিতি। চিত্ত ভরে স্মরণেই তার প্রাপ্তি।

'আত্মায় আত্মায় ভোগ, পুঞ্জক পুঞ্জ্যতে যোগ' কবির জীবনের মহাসন্ধিক্ষণে এ এক পরমোপলব্ধি। শিশুর চাঁদ ধরার সাধের মত তাঁর চিত্তে প্রিয়ের জন্য উন্মুখ-আকাঙ্ক্ষা। তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা।

'যমুনা-জাহ্নবী' কবিতাটি রম্যতায় মনোহারিণী। দুটি বিনম্র হৃদয়ের প্রেমের মৃদু গুঞ্জন। মনে হয়, স্বর্ণকুমারী গিরীন্দ্রমোহিনীর সখিত্বের মিলন ও মধুর আলাপনের একখানি মনোহর চিত্র। এই প্রেমের গাঢ়তর বর্ণে পরবর্তীকালে গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রাণের দীপ্তি আরো উজ্জ্বল। তখন মহাকবির কাব্যেও তিনি অপূর্ণতার ফাঁক দেখেন। মহান্ সঙ্গীতে প্রেমের জয় গেয়ে মহাকাব্য রচনা করেছেন মহাকবি। কিন্তু স্বার্থহীন, নিষ্কলুষ বন্ধুপ্রেমকে কবি একবারও স্মরণ করলেন না। অভিমানাহত গিরীন্দ্রমোহিনী সেই বিস্মৃতিকোষ তুলে ধরলেন 'সাহিত্যের' পাতায়, 'উপেক্ষিত' কাব্যে—

কোথায় তমসা তীরে, চিত্রকূট গিরিশিরে,
মালিনীর স্বচ্ছনীরে, চিত্রাঙ্কিত উপাখ্যান।
সাগরিকা, মালবিকা, বকুলিকা, নিপুণিকা,
প্রিয়ম্বদা, মাধবিকা শতনামে পূর্ণপ্রাণ।
জানিনাক কোন ভ্রমে ভুলে গিয়ে অন্ধকবি—
আঁকেনিক বন্ধুতার মহান্ সরল ছবি ;
কোন দোষে উপেক্ষিত, হে মিত্রতা, হে মহান্
কোন গুণে তোমা হতে প্রেম উচ্চ গরীয়ান্।[১]

সে যুগের বর বর্ণিনী নারী স্বর্ণকুমারী প্রীতিধন্যা হয়েই কি পরিপূর্ণ হৃদয়ে বলেন,

কোটি প্রণয়ীর সাধ মিশিয়া তোমাতে
কোটী বিরহীর চিন্তা অন্বিত ও গায়
তাই তুমি যাও যবে পরশি দেহেতে,
সে সব মধুর চিন্তা চিন্তারে জাগায় ! [দখিনাবায়ু ; শিখা]

১। সাহিত্য, বৈশাখ ১৩১১, পৃ ৩০

কিন্তু এ সুরের প্রতিধ্বনি বেশীক্ষণ থাকে না। এই মুগ্ধ ঘোষণার পরেই জেগে ওঠে শূন্যতার অনুভূতি।

জীবন যেন সে অন্ধ অজগর কূপতলে আছে পড়ি,
সময় বিহঙ্গ মাথার উপর, ঘুরে ঘুরে যায় উড়ি।

[অতীত প্রান্তর, শিখা]

মানস চাঞ্চল্য এত পাওয়ার পরেও স্থিরতায় কূলে এসে ভিড়তে পারেনা। চলতে চলতে মন একবার পেছন ফেরে, চোখের জলে চলার পথ পিচ্ছিল হয়, দীর্ঘশ্বাসে ভরা তপ্ত বায়ু কিছুটা রেখে আবার হাসিতে, গানে ভরে তোলেন সঞ্চয়। জীবন যদি হয় অন্ধ-অজগর, তাহলে সৃষ্টির অবারণীয় গতি আসে কোথা থেকে! বৈষ্ণব মহাজনের মধ্যে বিদ্যাপতির মধুর পদাবলী তাঁকে বারবার আকৃষ্ট করেছে, এখানে 'বিদ্যাপতি' কবিতায় সেই মুগ্ধ-তন্ময়তা। ভাব, ভাষা সবই মধুর। মাধুর্যের স্রোতে দেহ-মন স্নিগ্ধ হয়। ব্রজ-কাব্য চুম্বকের মত মনকে টানে কিন্তু হৃদয়ের কূলে কূলে চেতনার ঢেউ তোলে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'। যে ভাব অস্পষ্ট চেতনায় মনের কোণে স্তব্ধ হয়েছিল, ভাষা যাকে মূর্ত করতে পারেনি, যে অবরুদ্ধ সুর মনের মধ্যে অবিশ্রান্ত গুঞ্জন করেছে, রূপে যাকে সৃষ্টি করতে পারেন নি, 'সোনার তরী'তে সেই স্বপ্ন, সেই মায়া বহুরূপে তাঁর সম্মুখে প্রকাশিত। সৌন্দর্যের বিপুলতায় তিনি বিস্মিত।

এত স্বাদ এত স্পর্শ এত সুখ এত হর্ষ
একটি জনম-বর্ষ পায় কি কখনো।

['সোনার তরী'র কোন কবিতা পাঠে]

অপরদিকে অপ্রকাশের বেদনায় তাঁর অন্তরে অশ্রান্ত ক্রন্দন। স্তব্ধতার অন্তঃপুরে অ-ধরা মাধুরী ধরা দেয় না।

এমনি অশ্রান্ত তৃষা এমনি আকুল ভাষা,
কাঁদিবে কি চির সে এমনি। (ঐ)

হৃদয় তাঁর যতই অশান্ত হোক, কান্নায় যতই উতলা হোক, তবুও 'সোনার তরী' যে তাঁর চেতনার মর্মমূলে নাড়া দিয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

গিরীন্দ্র মোহিনীর কাব্য-সমালোচনায় স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছিলেন, "কবি গিরীন্দ্র মোহিনীর প্রধান আকর্ষণ ইহার অকৃত্রিম সরলতা, সরল ভাষায়, সরল ছাঁদে, নিজস্ব ভাবে গড়া সকল চিত্রকলার উপর তিনি তাঁহার প্রতিভার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আজকালকার দিনে নব লেখকদিগের অধিকাংশ কবিতাই, ছন্দোবন্ধে, ভাষায় ভাবে রবীন্দ্রনাথের দুর্দান্ত বা প্রশান্ত অনুকরণ। গিরীন্দ্র মোহিনীর কবিতায় ভাষার ঘনঘটা নেই, ছন্দোবন্ধেও আধুনিক কারিকুরির অভাব, সে রূপে মন মজিয়া যায়। কারণ তাহা খাঁটি জিনিষ, স্বাভাবিক ভাব পটুতাতে তাহা মনোরম।"[১]

১। ভারতী, আশ্বিন, ১৩৩১

এত কথা বলার পরেও কিন্তু আমরা দেখি, 'সোনারতরী'র স্বর্ণশোভা গিরীন্দ্রমোহিনীর কবি মনকে মাতিয়ে দিয়েছিল। 'সোনারতরী'র সুরের ঝংকার গিরীন্দ্রমোহিনীর মনের তারে যে তান তোলে, তাতে উৎসবের আনন্দ। তাঁর সৃজনের উৎস কখনও বন্ধ হয়নি। কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গির অভিনবতা রূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করল।

রবীন্দ্রনাথের,

টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ
নব সংগীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয় সাগরে পূর্ণ চন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।[১]

গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবনে ফলে ছিল। তাঁর 'ঈশ্বরী পাটনী' তো 'সোনারতরী'র নাবিক বা স্রষ্টা।

কাষ্ঠতরী স্বর্ণময়,
যাহার পরশে হয়,
কি তপে সে পদ পেলি বল্ দেখি ঠিক।
কি জানি কি কর্মদোষে
রহিলাম তীরে বসে
তুই বেয়ে গেলি হেসে দিতে শত ধিক্

[ঈশ্বরী পাটনী, শিখা]

'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'র স্তরের পর 'সোনার তরী'তে রবীন্দ্র প্রতিভা পূর্ণশতদলের মত স্বমহিমায় বিকশিত। সে সৌন্দর্য, সে জ্যোতি গিরীন্দ্রমোহিনীর কবি দৃষ্টিতে ধরা পড়তে দেরী হয়নি। নিজের রচনা তাঁর কাছে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর মনে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জেগেছে উদ্গমনের অভীপ্সা। 'শিখা' ও 'অর্ঘ্যে'র যুগে যে স্বচেষ্টায় উন্নত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবুও রবীন্দ্রপ্রভাব তাঁর কাব্যকে স্পর্শ করে আরো একটু সজীবতা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

'ছবি'তে প্রকৃতির সকল রূপ চিত্তভরে গ্রহণ করছেন—রুদ্ররূপেও তিনি অতন্দ্রনয়ন,—

বৈশাখে দুপুর বেলা রোদ্দুর প্রখর ;
ঝলসি ফেলিছে আঁখি—
থাকিতে পারি না তবু রুদ্ধ করে ঘর।

[ছবি, শিখা]

১। রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড (বিশ্বনৃত্য) পৃঃ ৪০১

এই চেয়ে দেখা তাঁর নিজস্ব কিন্তু পরক্ষণেই যে ছবি দেখি,—

তরুছায়া আঁকা বাঁকা
আঁকিলাম মসী মাখা ;
দূর দিগন্ত রেখা তরু তমসে !

[ছবি, 'শিখা']

এযে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র পংক্তিকেই স্মরণে আনে।

পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়া মসী মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাত বেলা—[১]

এ প্রভাব স্বীকার ক'রেও বলতে হবে, গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্য এসময়ে চারুতায় অপরূপ শ্রীময়ী হয়েছিল। তাঁর শিশুচিত্রগুলি সকল সময়েই প্রাণবন্ত, এখন হৃদয়রসে আরো পরিপূর্ণ। এর মধ্য দিয়ে তাঁর স্নেহময়ী মূর্তিখানি চিরন্তন মাতৃরূপে প্রকাশিত হয়েছে। 'নবজাত পৌত্রে'র প্রতি অনাবিল স্নেহ যেন শত ধারায় উৎসারিত। দেবধাম থেকে আবিভূ'ত স্বর্গশিশুর অভিষেক করতে হবে, সেই আয়োজনে তাঁর মনে আনন্দের উন্মাদনা। সেই শিশুর জীবনধারা শুধু দুচোখ মেলে দেখা নয়, মনের ক্যামেরায় ফটো তুলে মানব জীবনের এক অপূর্ব প্রদর্শনীর আয়োজনও করেছেন। প্রতিটি কথার স্নেহের উচ্ছলতা,—

নয়নের নিদ্রা নিলি, উদরের ক্ষুধা,
তৃষ্ণায় পানীয় নিলি, নিলি স্নেহসুধা।

[চোর, শিখা]

শৈশবে-যৌবনের ধারা বেয়ে বেয়ে জীবনের পূর্ণ বিকাশ দেখেছেন। তারপর জীবের যা চরমগতি সেদিকে ক্রম বিবর্তন। শুভ্র, কোমল, সুন্দর তনু ছবিরথে পেঁছে মৃত্যুমুখে যাত্রা। বিরামবিহীন অবারণীয় এ গতি। জড়ত্বে পেঁছেও মানুষ পৃথিবীর মায়া ছাড়তে পারে না। দুইহাতে জীবনকে আঁকড়ে ধরে মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চায়।

হাসি, গান, কর্ম-কোলাহল, জীবন-ধারার চিত্ররচনার মাঝেও অতীত দিনের স্মৃতি ঘুরে ফিরেই আসে। জীবনের সহস্রতার মাঝে সেই চকিত চাহনি, সেই মৃদু স্পর্শ মনকে নাড়া দিয়ে যায়,

পুষ্পিত এ কুঞ্জ মাঝে, লুকায়ে কে রেখে দেছে—
মোর, যৌবন সুরভি মাখা, অতীত দিবস গুলি !

['দি রিট্রীট' (মধুপুর) শিখা]

পুত্র, পৌত্র নিয়ে পরিপূর্ণ সংসার, পূর্ণ মাতৃহৃদয় দিয়ে সংসারকে ধরেও

১। সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ৩৪৩

রেখেছেন, তবুও বুকের মধ্যে চাপাশ্বাস হাহাকার করে ওঠে। সৃষ্টির বিপুলতার মধ্যেও অপূর্ণতার ব্যথা। এ ব্যথা রবীন্দ্রনাথের 'সুখের মতো ব্যথা' নয়, এ শূন্য হৃদয়ের অতৃপ্ত ক্রন্দন।

প্রতিদিন ঝরে পড়ে জীবনের কণা,
রহিল অপূর্ণ কত সমুচ্চ বাসনা ;
কি ব্যথা জাগায়ে তুলে কোন্ বিফলতা ?
কত দূরে নিয়ে যায় সান্ধ্য নীরবতা।

[সন্ধ্যায়, শিখা]

এই বেদনা বোধহয় সৃষ্টির ব্যথা। নবজন্মের মত একদিকে বেদনাভার, অপর দিকে মাতৃত্বের আনন্দ। সৃজনের মর্মে বসে স্রষ্টার এক চোখে জল, অপর চোখে সুন্দরের হাসি।

'সন্ধ্যায়' কবিতার ক্রন্দনগীতির পরে 'চন্দ্রালোকে'তে মধুর মিলনের আকাঙ্ক্ষা। ভাষা, ছন্দে বর্ণনার অনন্যতা—

দ্রুতগ তারার সাথে, করিয়া সম্প্রীতি,
পাঠায় শর্ব্বরী যোগে দূত-পদে-ব্রতী।
চলিছে বিশিখ গতি ;— তির্যক গমন,
স্বর্গের বিরহ-ব্যথা মরতে বহন।

[চন্দ্রালোকে, শিখা]

'শিখা'র স্তবকে স্তবকে কবির দীর্ঘশ্বাস মাঝে মাঝে শোনা গেলেও জীবন-অনুরাগ, মর্ত্যপ্রীতি, মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও প্রেম অজস্র ধারায় নিঃস্যন্দিত।

'কারে ভালবাসি' কবিতায় স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—

—কহিনু ; বাসি না ভাল কাহারে এমন।

নিজকে কেন্দ্র করেই এই ভালবাসা বহুধা হয়ে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে উৎসারিত হয়েছে।

তাঁর এই চিন্তার বিকাশ সমস্ত জগতেই ব্যাপ্ত হয়েছে। এই বিপুল বিশ্ব একখানি বৃহৎ গৃহ—এখানে প্রাণে প্রাণে মেশামেশি, হৃদয়ে হৃদয়ে সংযোগ।

এক বায়ু এক নীর সবাকার প্রাণ,
সমভাগে পাই সবে পিতার সন্তান।
শ্বেত কৃষ্ণ ভাগ ভাগ, আত্মপর ভিন্ন দাগ
জাতি, জ্ঞাতি অনুরাগ না বুঝি কিসের।

[চিন্তা, শিখা]

চিন্তার অনেকখানি সমুন্নতি না ঘটলে, হৃদয়খানি ঐ অবারিত আকাশে মেলে দিতে না পারলে এই বিশ্ববোধ অসম্ভব। বিশেষ করে গৃহবন্দী নারীর চিন্তার এই ব্যাপ্তি, বিশালতা তাঁর অমের আত্মশক্তির দ্যোতক।

একই চিন্তাধারার প্রতিফলন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় দেখেছি,

বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।[১]

এই বিশ্বপ্রেমে মনের মুক্তি, হৃদয়ের প্রসার যেমন, তেমনই 'মৃত্যুজয়ে' বিশ্বাধীপের ধ্যানে মৃত্যুভয় অতিক্রমণে জ্ঞানের নির্বাধ গতি। তখনই সম্ভব হতে পারে পরম নির্ভরের পায়ে পরিপূর্ণ আত্ম-বিলোপ।

চলিতেছে শত যাত্রী নিত্য মহা-অন্ধকারে,
পায় তারা ধ্রুবালোক, তোমার ভবনদ্বারে,—
এ বিশ্বাস আছে মনে, নাই তাই মৃত্যুভয়,
—জীবন মরণ সখা! জয় জয় মৃত্যুঞ্জয়।

[মৃত্যুঞ্জয়, শিখা]

'অনুতপ্ত', 'কাতর-নয়নে আর', 'ঘোমটা খোলা' প্রতিটি কবিতা হৃদয়ের রঙে, প্রেমে, গানে, গন্ধে, এক একটি পূর্ণ প্রাণের গানের মত।

'পত্র'তে নেমে এসেছেন বাস্তবের কঠিন অভিজ্ঞতায়, মৃদু ছায়া, মৃদু মায়া এখান থেকে অপসারিত, সত্য কথা সোজা করে বলা।

এমন গেঁতোর প্রেমে, মজিয়াছ কোন্ ভ্রমে
আমি হলে ক্রমে ক্রমে ছাড়াছাড়ি চাই।
ভালবাসা ঘোর চাষা, চেনে না কাঞ্চন কাঁসা
কি দেখেই নেছে বাসা ভেবে হাসি পায়।

[পত্র, শিখা]

প্রেমের ঘোর, স্বপ্নের মোহ কোথাও নেই, স্বচ্ছ, তীব্র চোখের দৃষ্টি, বক্তব্যও স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ।

'সমর্পণ', 'কি দিব তোমায়' কবিতায় মাধুরী ফিরে এসেছে। প্রাণের আবেদন, প্রীতি, ভালবাসার অখণ্ড ছবি। 'কি দিব তোমায়' কবিতায় আপনাকে বিলিয়ে দেবার সাধ।

'কতদিন মনে মনে ভাবিয়াছি নিরজনে
কি দিব তোমায়।'

[কি দিব তোমায়, শিখা]

এই পংক্তি রবীন্দ্র কাব্যের 'তোমায় কিছু দেব বলে
চায় যে আমার মন।'[২]

এই প্রেম-গুঞ্জনের অন্যতর রূপ, ভিন্ন প্রকাশ।

১। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাব্য-সঞ্চয়ন, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, পৃঃ ৭১
২। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পূজা-৫৯, পৃঃ ২২

'কি দিব তোমায়' ভাবের আবেগে স্বর্গ, মর্ত্যের সুষমা চয়ন করে নিঃশেষে নিবেদন—

যবে সব অবশেষ, রবে না অতৃপ্তি লেশ,
—তখন আমারে নিও পিয়া !—
তখন তোমায় বঁধু পিয়াব হৃদয়-মধু,
চাহিবে না আর কারো পানে।—
চরাচর লুপ্ত হ'য়ে, মোদের নিভৃতে শুয়ে,—
—তুমি আমি পূর্ণাঙ্গ মিলনে !

[কি দিব তোমায়, শিখা]

আত্মহারা দানেই আসে পূর্ণতার মিলন। অস্তিত্ববাদ তাঁর জীবনের বাণী, প্রীতি-সঞ্চারণ তাঁর হৃদয়ের ধর্ম। ভালবাসায় হৃদয় পূরেছেন, অকাতরে তা বিলিয়েছেন। এমন করে দেওয়াতেই জীবনের সার্থকতা।

প্রাণময় বাণীই তাঁর কাব্যের প্রধান সুর,—

জীবন শ্মশান নয়, অনন্তের নাট্যালয় ;—
পাতিব নবীন সিংহাসন।
আবার জাগিছে ক্ষুধা,— পরিপূর্ণ প্রাণসুধা
আহরি করিব সঞ্জীবন।

[বিদায় পর্য্যায়, শিখা]

এই সঞ্জীবনী সুধা যাঁর ভাণ্ডারে—তাঁর শোক করবার, মোহগ্রস্ত হবার কোন কারণ নেই। গানে গানে তাঁর বন্ধন ক্ষয় হয়েছে, দানে দানে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং,

'বৃথা বহে যায় দিন কিছুই হল না।

[শিখা, শিখা]

তাঁর কণ্ঠে এ কান্না বেমানান। অবশ্য বেমানানই বা বলা যায় কি করে! সৃষ্টির বাসনা তো অন্তহীন, তাই স্রষ্টার হৃদয়ে অতৃপ্তি থেকেই যায়। নাহলে জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা লিওনার্দো জীবন শেষে বলতে পারতেন না, কিছুই করা হল না জীবনে। যা হোক 'শিখা'য় গিরীন্দ্রমোহিনীর মুক্তি মিলেছে জীবন ও প্রকৃতির উষ্ণ-সান্নিধ্যে। বলিষ্ঠ ভাষায়, স্পষ্ট উচ্চারণে জীবনের জয়গান তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, তখনই ঘটেছে তাঁর পূর্ণতার পথে অগ্রগমন।

সন্ধ্যাবেলায়, দিনান্তের ম্লান আলোয় অন্তর তাঁর দ্বিধান্বিত হয়েছে, সবল কণ্ঠ ক্ষীণ হয়েছে।—

সন্ধ্যার সুবর্ণ রাগে মরি পথ ভুলে—
কম্পিত এ শিখা ক্রমে হয়ে আসে ক্ষীণ।

[শিখা, শিখা]

আমরা কিন্তু বলি 'শিখা'র উজ্জ্বল জ্যোতি ক্ষীণ হবে না, হতে পারে না। স্বর্ণ-প্রভায় এই আলোর বিকীরণ চির-প্রদীপ্ত থাকবে।

অর্ঘ্য

'অর্ঘ্য' শিখার সংগে একই পর্যায়ের লেখা। 'অর্ঘ্য' 'শিখা'র ভাবানুক্রমিক হলেও, একই মানস গঠন উভয়ের কাব্য-নির্মিতির সহায়তা করলেও 'অর্ঘ্য' পরিণতির দিকে আরেক ধাপ অগ্রসর। দীপ্তোজ্জ্বল বক্তব্যের বৈচিত্র্যে 'শিখা' কাব্যটি বর্ণময়। 'অর্ঘ্যে' চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য নেই, বরং এ কাব্য স্নিগ্ধতায় রমণীয়। হৃদয়ের প্রেমে, কথনের আন্তরিকতায় অর্ঘ্যের নিবেদন নম্র সুন্দর, ললিত মাধুর্যে মনোহর। জীবনের প্রতি অনুরাগ যেমন আশ্চর্য সুষমায় প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি প্রকৃতি প্রেমে সৌন্দর্যের বর্ণবিলাস অনিন্দ্যসুন্দর।

লোকান্তরিতা জননীর উদ্দেশে 'অর্ঘ্য' নিবেদিত। বিশীর্ণ, রুক্ষ প্রকৃতি রূপহীন, পুষ্পহীন।

> মাধবী জবা মালতী অশোক চম্পক পাঁতি
> শেফালী বকুল জাতি গরবী করবী সই।
> চুম্বিত-মধুপ-বৃন্দা শীকর নিকরানন্দা
> কোথা সে রজনী গন্ধা—সকলি বিশুষ্ক ওই।

[অর্ঘ্য, অর্ঘ্য]

'পুষ্প বনে পুষ্প নাহি' কিন্তু অন্তরে তো আছে, কাজেই 'হৃদয় নন্দন বনে' পুষ্প চয়ন করে জননীর চরণের উদ্দেশে অর্ঘ্য সমর্পণ করেছেন।

'মন্ত্রহীনা'য় প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্য বিশ্লেষণে কবি হৃদয় ধরা পড়েছে। তিনি "রূপমুগ্ধা, এর বড় পরিচয় তাঁর নেই—রূপতন্ময়তা তাঁর জীবনের মহামন্ত্র। বসন্তে, বর্ষায় শ্যাম, শ্যামা স্বরূপে প্রকাশ তাঁর দিব্য নয়নে। শরতে হেমন্তে, পূর্ণাধরশীতে স্বয়ং ভগবতীকে দেখেছেন বরাভয়দাত্রীরূপে, জ্ঞান ও সম্পদকে সঙ্গে নিয়ে। তুষার মৌলি শংকর তো হিমাদ্রি শিখরে চিরধ্যানমগ্ন।

কবি একাধারে শিব, বিষ্ণু এবং শক্তির উপাসিকা। তিনি সংস্কারহীনা— তিনি ব্রাত্য। তিনি জীবনের মন্ত্রে দীক্ষিতা। তাতেই তিনি তৃপ্ত। আপন চিত্তে মগ্ন হওয়াই তাঁর শ্রেষ্ঠ সাধনা—পরম আনন্দ।

> ভুক্ত সেথায় কোটি বসুন্ধরা,
> মুক্ত সেথায় শত সরিদ্বরা,
> দীপ্ত সেথায় নবগ্রহ তারা
> বিকীরিত জ্যোতি দশদিশ;
> আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি
> তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ।

[প্রভেদ, অর্ঘ্য]

এই মনন, এই দর্শনের পরেও কবির হৃদয়ের দুঃখ নিরাবরণ হয়ে বেরিয়ে

আসে। এই দুঃখ বিধিদত্ত ভাগ্যের পীড়ন নয়, সংসারের সংকীর্ণতাই তাঁকে পিষ্ট করে। কবিখ্যাতি হয়েছে, হয়েছে নামযশ, তবু তাঁর মনে হয় এহ বাহ্য।

বেদনার রাশি, পরিখার সম প্রাণ আছে যার ঘিরি ;
আসিয়া কল্পনা দূরে যায় সরে চেয়ে চেয়ে ফিরি' ফিরি' !
পিঞ্জরের পাখী, প্রভাতে প্রদোষে, গাহে লো বেদনা গান,—
তারে যথা সই সাজে নাক—তথা আমার এ কবি নাম।

[কবি-যশ, অর্ঘ্য]

'পুরস্কার' কবিতাটি রোমান্টিকতার নিপুণ কারুকার্য। এতে তাঁর অপূর্ব মানসভ্রমণ। উত্তুঙ্গ গিরির পথ পরিক্রমায় গিরিশীর্ষে যেখানে মানুষের অনধিগম্য দেবভূমি বলে অনুমিত, সেখানে কবির অনায়াসচারণ, দেবী দর্শনে, প্রিয়-স্পর্শনে তাঁর জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণ।

প্রকৃতি-বর্ণনা 'অর্ঘ্যে' এক নবীন শ্রী নিয়ে এসেছে! 'আষাঢ়ে' কবিতায় কালিদাসের মেঘদূত স্মরণে যেমন উপমার নৈপুণ্য, তেমনি প্রাচীন কাব্যে তাঁর অধিগমের পরিচয়।

এই আষাঢ় সেই প্রিয় দরশন,
বাতায়নে বসি' যার নয়নে নয়ন
নিক্ষেপিয়া দেখিতাম—কত কি কাহিনী!
অতীতের দ্বারপাশে বসি বিরহিণী
গণিছে কুসুম ধরি' বিরহের দিন ;—
প্রভাতের শশিলেখা যেমন মলিন।

[আষাঢ়ে, অর্ঘ্য]

এই 'আষাঢ়' মহাকবির 'মেঘদূতে'র যক্ষপ্রিয়ার বিরহ বর্ণনার নবরূপ।

শেষান্ মাসান্ বিরহ-দিবস-স্থাপিতস্যাবধের্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ।[১]

(প্রতিদিন ভবন-দেহলিতে একটি ক'রে ফুল সাজিয়ে, ভূমিতে রেখে গণনা করে দেখে, বিরহের আর ক'মাস বাকি আছে।)

(রেখেছে প্রতিদিন ভবন-দেহলিতে একটি ক'রে ফুল সাজিয়ে,
ভূমিতে রেখে তা-ই গণনা করে, আর ক-মাস বাকি আছে বিরহের।)[২]

'কবির প্রতি কবি-প্রিয়া' রোমান্টিক চেতনার অপূর্ব প্রকাশ। জীবন ও প্রেমের

মাধুরীতে কল্পনা প্রাণময় হয়েছে, চিত্রকল্প এখানে সু-সার্থক, ছোট ছোট রূপাধার।

একা এ নির্জন ঘরে এ বাদল ঝরঝরে
না-জানি সে কি তোমারে দিতে সাধ যায়।
[কবির প্রতি কবি-প্রিয়া, অর্ঘ্য]

নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করাই কবি-প্রিয়ার জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষা।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও কিছু দেবার এই আকুতি—

তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন,
নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন।[১]

অ-প্রয়োজনের পথ বেয়েই আসে নিবিড় আনন্দ। সে পরমানন্দের স্বাদ পেতে চান কবি বিকিয়ে দেবার মহোল্লাসে।

আত্মদানের মহা-গৌরবের যে বিভিন্ন চিত্র গিরীন্দ্রমোহিনী তুলে ধরেছেন, চিত্রের বর্ণাঢ্যতায়, রূপ-বৈচিত্র্যে তা অনুপমেয়।

কিবা শ্যাম নীপকুঞ্জে নবশ্যাম তৃণপুঞ্জে
ডুবাইয়া শ্যামল অঞ্চল,
মাজিয়া এ শ্যামকায় শাঙন দিবার প্রায়
ক'রে দিব তোমারে বিহ্বল।
[কবির প্রতি কবিপ্রিয়া, শিখা]

ওই নিঃসর্ত নিবেদনের ভাব, ভাষার রস গাঢ়তর হয়েছে পরবর্তী চিত্রে,—

কি বা, ওই বাতায়নে পশি এই কৃষ্ণ কেশরাশি
খুলি তরঙ্গিয়া দিব তিমির নির্ঝর,
তাহা হতে লয়ে মসী তুমি গো লিখিবে বসি,
বরষা-মঙ্গলগীতি, ঘন ঘনতর।
[কবির প্রতি কবিপ্রিয়া, শিখা]

নিবিড় ঘনকৃষ্ণ কেশজাল থেকে মসী সংগ্রহ করার চিত্র কবি-কল্পনার বিস্ময়কর শিল্পবিন্যাস। কল্পনা যেন অবাধ মুক্তি পেয়েছে, ছন্দে, ভাষায় ও চিত্রকল্পের যোগসাজুষ্যে।

জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি, অনির্বচনীয় সৌন্দর্যানুভূতি, বাস্তবের কাঠিন্য—ভাবনার এই ত্রিমুখীস্তর 'অর্ঘ্যে'র অবয়ব গড়েছে।

জীবনের প্রতি অনুরাগ 'অশ্রুকণা'র যুগেও ছিল। কিন্তু বেদনার অশ্রুপ্রবাহে তার সুস্পষ্টরূপ গড়ে উঠতে পারেনি। জীবন-অভিজ্ঞতা, রোমান্টিক কল্পনা, লিরিক ভাবনার পূর্ণ পরিণতি তখনও সুদূরের পারে। রূপাভিসার ও প্রেমাসঙ্গ তাঁকে দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে দিতে সার্থকতা ও পরিণতির পথে দ্রুতগতি লাভ করেছে। নৈঃসঙ্গের তীব্র বেদনায় অন্তর অবসাদে ঢেকে ফেলতে চাইলেও

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ৩২

উন্মুক্ত প্রকৃতির বিপুল সৌন্দর্যসম্ভার—গভীর প্রেম তাঁকে জীবনের ভিন্নতর স্বাদ ও নতুনতর আগ্রহের উপাদান জুগিয়েছে। 'অর্ঘ্যে' সৌন্দর্যবীক্ষা ও নিরবয়ব প্রেমানুভূতিতে বেণীবন্ধন রচিত হয়েছে। কবির ভাবানুষঙ্গ রূপ থেকে রূপাতীতের তীর্থযাত্রাপথে সহজ ও লঘুছন্দ হয়েছে। 'পুরস্কার', 'পরশফাঁদ', 'মিলন', 'সুন্দরী' এই ভাবের ব্যঞ্জনায় এক একটি ইমেজ। 'অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে'র স্পর্শ 'পরশফাঁদে' আস্বাদ্য। জীবন-তৃষ্ণা কবিকে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অনুভববেদ্য দৃষ্টি দিয়েছে। 'মনোবিজ্ঞানে' হৃদয়ে হৃদয়ে আকর্ষণের কারণ নির্ণয়ে কবির মন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে অভিনিবিষ্ট।

জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় কবির হৃদয় চির-অতৃপ্ত। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' এই অন্তরের আকুলিত প্রার্থনা। 'তৃষ্ণা' এবং 'রমা ও বাণী' এক কথারই ভিন্ন প্রকাশ।

কবে আত্মজ্ঞান পূর্ণভাতি নির্ম্মল শশাঙ্ক রাতি
উদিবে হৃদয়ে সত্যতত্ত্ব সুধাকর!
... ...
কোথা দেবী কান্তিরূপা সেবিকারে কর কৃপা
দেহশান্তি পদাশ্রয় রতি।

[তৃষ্ণা, অর্ঘ্য]

দেবীর শুভ্র জ্যোতির্ময় মূর্তির ধ্যানে সদা নিমগ্ন তাঁর হৃদয়—দেবীর কৃপা-দৃষ্টির জন্য তিনি চির-উন্মুখ।

'রমা ও বাণী'র মধ্যে লক্ষ্মীর প্রসাদ তিনি চান না—তাঁর প্রার্থনা বেদমাতার দুয়ারে—

তোমারেই চাহি আমি ওগো মাতা বাণী!
হৃদি-পদ্মাসনে চিররাঙ্গা পা দু'খানি!

(রমা ও বাণী—অর্ঘ্য)

কবি তাঁর দৃষ্টি বার বার বিছিয়ে দিয়েছেন প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণ বিলাসে, অজস্র বৈভবে। রূপ ধরে সেই 'সুন্দরী'

'আসিয়াছিল সে ভেসে নীরদের দেশ দিয়া'। তার কাছেই আছে কবির শান্তির সন্ধান—

আধি ব্যাধি দুঃখ শোক জ্বালা
সংসারের বৃশ্চিক দংশন,
শ্যামাঙ্গিনী! তোরই কাছে শুধু
আছে তার স্নিগ্ধ প্রলেপন।

[সান্ত্বনা, অর্ঘ্য]

বিশ্বপ্রকৃতির মোহনরূপে কবির মন এমন মজেছে যে নির্বাণ-মুক্তি তিনি চান না। মোক্ষলাভ জমা থাক সংসারবিরাগীদের জন্য। দুঃখ-কষ্ট মোহময় সংসারে

বার বার আসা তাঁর কামনা। রূপ সাগরের তীরে বসে গণ্ডুষ ভরে সুধাপানে তৃপ্ত করবেন আকণ্ঠ সৌন্দর্য-তৃষা। জীবনের সার্থকতা হয়তো আসবে আরো উচ্চতর সাধনায়, অরূপের সাথে ঘনিষ্ঠ মিলনে।

অন্তরের প্রার্থনা তাঁর ভাষাময় হয়ে উঠেছে 'ভিক্ষা'য়—

নির্ব্বাণ মুক্তি দিওনা আমারে
মোহান্ধ রমণী আমি,
সুন্দর এ ধরা ফিরে ফিরে মোরে
দিও হে জগৎ স্বামী।

[ভিক্ষা, অর্ঘ্য]

একই আকাঙ্ক্ষা প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল পরে এ যুগের কবি প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্রেরও,—

'ফের যদি ফিরে আসি,
আরো আলো চক্ষে যেন আসি নিয়ে,
বুকে আরো প্রেম যেন আনি
পৃথিবীকে আরো যেন ভালো লাগে'।—[১]

আর রবীন্দ্রনাথ! চোখ মেলে প্রথম আলোয় যিনি এই শ্যামা ধরণীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়েছিলেন, জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসায় অসীম মমতায় জীবনের প্রথম অধ্যায়েই যিনি বলেছিলেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে',[২] সেই রূপতাপসের পক্ষে বলা খুবই স্বাভাবিক,

'আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে,
দুঃখ সুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে'।[৩]

প্রকৃতির রূপমুগ্ধা গিরীন্দ্রমোহিনীর নন্দিত হৃদয়ের ব্যাকুলতা বহু উচ্ছ্বাসে বন্দিত।—

এত বড় ধরা মাধুরীতে ভরা,
দিবা নিশি রূপ করিয়া পান,—
তবু জানালা 'পরে গেল না টান!

[এস না, অর্ঘ্য]

শেষের পংক্তি কাব্যের রসঘ্ন হলেও তাঁর সীমিত জীবনের এও একটা দিগ্‌-দর্শন। 'চিত্রাঙ্কনে' সেই বিঘ্নিত জীবনের আরো স্পষ্ট প্রকাশ।

রং আর তুলি নিয়ে কাটে সারা বেলা;
গুরুজনে বলে—'ওর একি ছেলে খেলা?

১। প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রথমা
২। প্রাণ, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯
৩। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ১৮০, গীত সংখ্যা-৫৯১

চল্লিশ হয়েছে পার গিন্নী আখ্যা গৃহে যার,
গৃহধর্ম্ম-কাজকর্ম্ম সব অবহেলা
দূর করে ফেল দেখি ছাই-ভস্মগুলা।

[চিত্রাঙ্কনে, অর্ঘ্য]

সমস্ত গৃহ যেন সমবেত হয়েছে কবির সিসৃক্ষার উপর। নিন্দা, অপবাদ, সমালোচনায় সৃজনের সমস্ত প্রচেষ্টাই ফলিত হয়,—

পড়িল হাসির রোল দূরে গেল গণ্ডগোল
লাঞ্ছনার উপরে লাঞ্ছনা।

[চিত্রাঙ্কনে, অর্ঘ্য]

সৃষ্টি-সুখের সমস্ত উল্লাস ব্যর্থ হয় অরসিকের কুলিশ প্রহারে। শিল্প-কর্মের মধ্যে স্নেহ-বঞ্চিতা, সুখ-লাঞ্ছিতা কবি হৃদয় মেলতে চান, পারেন না। কান্নার আবেগে ব্যথা ফেনিয়ে ওঠে দেবীর কাছে,--

জননি! তোমারে স্মরি ঝরে আজি অশ্রুবারি
মুছে যায় আলেখ্য আমার।

[চিত্রাঙ্কনে, অর্ঘ্য]

ব্যথিত হৃদয়ের সান্ত্বনা আছে উদার আকাশে, সেখানকার অশ্রুবাণীতে তিনি আবার আত্মমগ্ন,—

সৌধ শিখরে শুয়ে একাকিনী তোমা পানে চেয়ে থাকি,
কভু ফুটে হাসি ঈষৎ অধরে, কভু আসে ভরে আঁখি।

অতুল সম্ভারে পূর্ণ এই পৃথিবী তাঁর দৃষ্টিকে রসস্নিগ্ধ করে তোলায় মরণও তাঁর কাছে শোভন মূর্তিতে বিভাসিত। সেই প্রিয়তমের উদ্দেশে তাঁর প্রেমাঞ্জলি,—

তোমারে ভাবিবে কে বা পর!
প্রবাসী প্রিয়ার মত,
পথ চেয়ে অবিরত,
নিত্য রাখ সাজায়ে বাসর।

[মরণের প্রতি, অর্ঘ্য]

জীবনের রথযাত্রা সমাপ্তির পথে। অন্তর তাঁর প্রশান্ত, মোহমুক্ত—শান্ত চিত্তে বিদায় বার্তা জানান সকলের কাছে—মনের কোণে কোনো খেদ নাই—

অপূর্ণ বাসনা যত অস্ফুট মুকুল মত
ধূলায় রহিয়া গেলে পড়ি।
জীবনের কত ব্রত অসম্পূর্ণ চিত্রমত,
হেথা হোথা রল' ছড়াছড়ি!
নাহি তাহে ক্লেশ, বাসনার স্বপ্ন শেষ
শুধু যেন নাহি যায় সাথে।

[জীবন-সন্ধ্যায়, অর্ঘ্য]

স্বদেশিনী (১৩১২)

দেশপ্রেমের উদ্বোধন উনিশ শতকের মধ্য বিন্দুতে শুরু হয়েছিল। রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' (১৮৫৮) উচ্ছ্বাসপূর্ণ হলেও স্বাধীনতা চেতনার প্রথম আভাস এখানেই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং মধুসূদনের লেখায় দেশ-প্রেমের সূচনা দেখা গেলেও আন্তরিক বেদনা ও প্রকাশের বলিষ্ঠতা রঙ্গলালের কাব্যেই প্রথম। বিভিন্ন লেখকের কাব্যে ও নাটকে এরপর স্বদেশ-প্রীতি ও স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার বিবিধ প্রকাশ। নব যুগের রচনাকার রামমোহন ও পরবর্তী-কালে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের আভাস নাই। তবু স্বদেশ প্রেমের আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যের বিভিন্ন খাতে ক্ষীণ ধারায় বহমান। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের ঘোষণায় প্রাগুক্ত ধারাগুলিতে যেন হঠাৎ ধেয়ে আসা বন্যার উন্মত্ত প্রবাহ। সমগ্র জাতির প্রাণে এক নব-চেতনার জোয়ার। রবীন্দ্রনাথ গানে গানে দিলেন ডাক—বাংলায় সে ডাক পোঁছালো হৃদয়ের নিভৃত, নিস্তব্ধ অন্তঃপুরে। সমগ্র বাঙ্গালী জাতি চেতনা-জাগ্রত প্রাণের মহোৎসবে আকাশ, বাতাস আলোড়িত করে তুলল,—

'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী'[১]—

কণ্ঠ আরো সবল হল,

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে—ততই বাঁধন টুটবে।

... ...

এখন ওরা—যতই গর্জাবে, ভাই, তন্দ্রা ততই ছুটবে।[২]

আরো উন্মত্ত আবেগে,

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমনি শক্তিমান।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান—
তোমাদের এমনি অভিমান।[৩]

কোন শাসকের এমন শক্তি নেই যে, এই সদ্যজাগা দুর্বার প্রাণ-স্রোতকে রুখতে পারে। বরং একতা বলে মহান্ এই শক্তিতে তারা ভীত, সন্ত্রস্ত। স্বয়ং রবীন্দ্র-নাথ এই প্রাণ-চেতনার উদ্গাতা পুরুষ। তিনি রাখীমন্ত্র পড়ে নিজ হাতে রাখী পরিয়ে দিয়েছেন জাতিকে, ঐক্যমন্ত্রে উদ্দীপিত করতে। সেই ঋষির চেতনা-লব্ধ বাণী কি ব্যর্থ হতে পারে! মহামন্ত্রে মহাজাগরণ ঘটেছে—

'বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান ॥[৪]

একীকরণের মন্ত্র সেদিন পূর্ণ সার্থক হয়েছিল।

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, স্বদেশ, পৃঃ ১১১
২, ৩। ঐ ,, পৃঃ ২০৭
৪। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১১

পরাধীনতার বেদনা, শাসনের রক্তচক্ষু, স্বাধীনতার স্পৃহা মগ্ন চৈতন্যকে জাগিয়ে তুলল, সাহিত্যিকের নবলব্ধ উদ্দীপনের জ্বালাময়ী প্রকাশ, বাক্য-বিন্যাসের বহু ধারায়। প্রাণ জেগেছে গ্রামে, গঞ্জে এমন কি গৃহাঙ্গনে, নববোধের জোয়ারে—রাখী বন্ধনে, অরন্ধনে প্রথম পর্বের উদ্‌যাপন হল।

স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষা নিতে এগিয়ে এল সবাই—বালক, কিশোর, তরুণ, প্রৌঢ়, এমন কি নারীও। 'নিঃশেষে প্রাণ, যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'—এই ছিল সেদিনকার এগিয়ে চলার বাণী; এই ছিল তাদের সকল শক্তির উৎস। স্বদেশ-ব্রতে বাংলায় এল প্রাণবন্যা।

সাহিত্য কর্মে কত অঘটন ঘটে, হয় অসাধ্যসাধন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' এই নবীন যজ্ঞের ঋক্‌মন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে ব্রিটিশের সিংহাসন কাঁপিয়ে বুক পেতে দাঁড়াল তরুণ সংগ্রামীর দল। রবীন্দ্রনাথ দিলেন মাভৈঃ বাণী! সকলের সাহিত্যকর্মে দেশমন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল বিবিধ ছন্দে!

গিরীন্দ্রমোহিনী অল্পবয়স থেকেই ছিলেন সমাজসচেতন। সমাজজীবনের প্রতিটি প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এই লৌকিক জীবনের স্রোতে নিজস্ব ভাবনা তিনি বরাবরই সাঙ্গীকৃত করেছেন। এবার তিনি মহোৎসাহে জীবনের জয়গানে নবীন যাত্রীদের প্রেরণার সঞ্চার করলেন। তিনি গাইলেন গতির সুর, ঝঞ্ঝার সুর।—

আশা তাঁর অনেক, হৃতগৌরব উদ্ধার নয় শুধু, জগতে বাঙ্গালী নাম আবার স্বর্ণশিখায় জ্বলবে।

কবি 'আশীর্বাদে' দেশের তরুণদলকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। অভীঃ মন্ত্রোচ্চারণে ঝড়ের বেগে আসতে ডাক দিয়েছেন তাদের।

ধরহ একতা কিসের ভয়
সাহস যাহার তাহারি জয়।

* * *

নবীন আশার বোলে
দ্রুত আয় আয় আয় চলে
যেমন ঝটিকা ধায়।

[আশীর্বাদ, স্বদেশিনী]

'রাখী সংক্রান্তি' একতার জয়গান; মোহবন্ধ থেকে মুক্তির গান। চোখের জলের তর্পণে সকল ভ্রান্তির অবসান।

সমবেত সবে দেখ একমনে
মা-মা-মা-মা বলে বিদারি গগনে
হের আঁখি নীরে ভাসিল।

[রাখী সংক্রান্তি, স্বদেশিনী]

দীর্ঘ অবসাদের পর সম্বিতের উদয়। সার্ধশত বৎসরের শৃঙ্খলিত বেদনার ভারে হৃদয় ছিল ব্যথা জর্জর। শাসকের সীমাহীন অত্যাচারেই নিদ্রা ভেঙেছে কুম্ভকর্ণের। শৃঙ্খল মোচনের প্রয়াসে তার আত্মপরীক্ষার দুর্জয় পণ। মাতৃ-বন্দনার জলদ-গম্ভীর মন্ত্র তখন কণ্ঠে ধ্বনিত। সে কণ্ঠে ঝঞ্ঝার স্বর, আত্মোৎসর্গের আহ্বান।

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত-ভাবনাহীন।[১]

অভয় মন্ত্রের প্রতিধ্বনিতে তখন মহাকাশ ধ্বনিত। কবি, নাট্যকার প্রভৃতি সাহিত্য স্রষ্টারা অতীতের পৃষ্ঠা থেকে বীরের জয়গাথা গেয়ে তরুণের রক্তে জাগিয়ে দিয়েছেন মরণ-উৎসব। শিরায় শিরায় জ্বলছে স্বদেশ জননীর প্রতি প্রেম ও ভক্তির উন্মাদনা।

বিলাস-শয্যা ছেড়ে উঠে আসছে নির্মোহ সতেজ যুব শক্তি। বিদেশী বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' মাথায় তুলে নেবার দুর্জয় পণ। কবি বলছেন,

সজ্জা দেখে ফাটে বুক মরি রে গুমরি ফুলে।
এত যে জননী-প্রাণে সহেনা সে পাষাণী বলে।
বাছা, ভিখারীর কিসে লজ্জা, পরসজ্জা ফেল্ খুলে;
ফেলে দে ভিক্ষার ঝুলি দলিয়া চরণ মূলে।

[আহ্বান গীত, স্বদেশিনী]

বিলাসের ফাঁস খুলে ফেলছে, জীবন মরণ পণ তাদের। দেশের শত শত ছেলে ছুটেছে, 'করিব অথবা মরিব' এই প্রতিজ্ঞা পাথেয় করে।

গিরীন্দ্র মোহিনীর 'স্বদেশিনী'তে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে দেশমাতৃকার স্তব। রণ-রঙ্গিণী, শিব সঙ্গিনী শ্যামামায়ের বন্দনা গানে জাগার মন্ত্র উচ্চারিত। রক্ত লোলুপা দেবীর রক্তপায়ে রক্ত জবার অর্ঘ্য দিতেই 'কার আগে প্রাণ কে করিবে দান, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি'।

'রক্ত-নেশার মদে মাতাল' বাংলার দামাল ছেলেরা দশপ্রহরণধারিণী দশভুজার ধ্যানে মগ্ন। অসুর দলনী সংহার মূর্তিতে দেশের শত্রুর নিপাত করবেন।

করালরূপিণী কালী অনেক কবির ধ্যানের মূর্তি। শব সাধনার সিদ্ধিতে তিনি জাগাবেন দেশের শিবকে। এই শক্তিদায়িনীর কাছে শক্তি প্রার্থনা চলছে সন্তানদের তপোসিদ্ধির কামনায়। অঙ্গচ্ছেদের বেদনায় যে প্রাণ জেগেছে, সেই জাগ্রত প্রাণের ভিক্ষা—

দেহ দেহ নব শিক্ষা নব মন্ত্রে লহ দীক্ষা
ভুলাও ভারতে ভিক্ষা দেহ প্রাণে নব বল;

[অঙ্গচ্ছেদ, স্বদেশিনী]

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪৭

যে প্রাণ-চেতনায় দেশ-মাতৃকার মুক্তির জন্য চিন্ময়ী মায়ের পূজা আরাধনা, সেই নব-উপলব্ধ বোধই একতার মন্ত্রে সকলকে একসূত্রে গাঁথছে। সারা ভারত তখন একজাতি একপ্রাণ। রাখী বন্ধনে এই ঐক্যসূত্র আরো দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল। সেই সঙ্গে কবির কঠিন শপথবাণী—

ভুলি হিন্দু মুসলমান
প্রীতিসূত্র কর দান ;
বাঁধ সূক্ষ্ম সূত্র-মূলে বিরাট জীবন।
কর মনে দ্রৌপদীর বেণী বাঁধা পণ !

[রাখীমন্ত্র, স্বদেশিনী]

দ্রৌপদীর বেণীবন্ধনের মত কঠিন পণে আসে কর্ম-সাধনায় সিদ্ধি। শত্রুদলনে এমন ধনুর্ভাঙ্গা পণ না নিলে যুদ্ধোন্মাদনায় মেতে ওঠে না মন।

কবি গিরীন্দ্রমোহিনী এবং কাজি নজরুল ইসলাম দুজনেই দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার বন্দনাগীতিতে সকল কামনার সিদ্ধি প্রার্থনা করছেন, আর চিত্তের অন্ধতমসা দূর করে জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত করার জন্য দেবী সরস্বতীর আরাধনায় ভাব-লীন। গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী বন্দনায় বলছেন।

স্বাগত পার্বতী লহ স্তুতি গীতি
শত হৃদি উত্থিত বাণী
হৃদয়ে দেহ ভক্তি বাহুতে দেহ শক্তি
দুর্ব্বল সুতে ভবানী।

[আগমনী, স্বদেশিনী]

আবার,

লোক-বন্দিতা, বেদ-ছন্দিতা,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-বাদিনী
লক্ষ-প্রসূতা, মোক্ষ-জ্ঞানদা,
অযুত-সুতশালিনী ;
... ...
জয়দে জয়-দায়িনী
নমো নমঃ জননী

[মাতৃ-স্তোত্র, স্বদেশিনী]

কাজি নজরুলের দেবী বন্দনাতেও দেশের মুক্তি-পণে শক্তি প্রার্থনা—

জাগো হে রুদ্র, জাগো রুদ্রাণী, কাঁদে ধরা দুঃখ-জর জর।
জাগো গৌরী জাগো হর।।
... ...
শস্য শ্যামলা তোদেরি কন্যা পীড়নে পীড়নে আজি অরণ্যা।
আনো আরবার প্রলয় বন্যা ত্রিশূল খড়্গ ধর।[১]

১। নজরুল রচনা সম্ভার, ১ম, পৃঃ ৪১৩

জ্ঞানের জন্য আকুলিত কামনা—

জ্ঞান-প্রদায়িনী হৃদয়ে আলো দিলে, ধেয়ান সুন্দর করিলে সব নিখিলে
উর মা উর আঁধার পুরে আলো দানি' ।।[১]

'মরা গাঙে বান এসেছে' জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'জয় মা' বলে তরী ভাসানোর জন্য জানালেন উদাত্ত-আহ্বান। আর পাড়ি দেবার মত মাঝিকে প্রাণপণে ডাকতে বলেছিলেন। তারপর যাত্রা যেই শুরু হল, নব উদ্দীপনায় শপথ উচ্চারণ—

'এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী দাও গো করি পার।'[২]

আর গিরীন্দ্রমোহিনীর শুকনো গাঙে প্রাণবন্যা নয়, তাঁর কণ্ঠে ভরাগাঙে জোয়ারের গান। বঙ্গভঙ্গে কৃষকের গান—

ঐ ভরাগাঙে এসেছে জোয়ার
ও ভাই ঝট্ চলে আয় আয় কে যাবি পার।
ওরে উঠুক বাতাস ভয় কি তাতে
এবার পাকা মাঝি আছে সাথে
'বদর' বলে নৌকা খুলে সাহস পালে যাব চলে
দাঁড়িয়ে আর থাকব না কূলে লেগেছে বেজার ॥

[বঙ্গভঙ্গে কৃষকের গান, স্বদেশিনী]

সমাজের ছোটবড় সকল কাজে গিরীন্দ্রমোহিনী উৎকর্ণ ছিলেন। সঞ্চরমান সকল ঘটনা, দেশের যে কোন পরিবর্তন বা উত্থান পতনের সঙ্গেই ছিল তাঁর অন্তরের যোগ, প্রত্যেক কম্পন তাঁর সৃষ্টি চেতনার সাড়া জাগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দীপ্ত প্রভা তখন এমন সর্বব্যাপী যে, সে যুগে তাঁর প্রভাব মুক্ত হওয়া কষ্ট সাধ্য ছিল।

শিবাজীর শৌর্য, শিবাজীর বুদ্ধিদীপ্ত সাহস ছিল তখনকার মুমুক্ষু ভারতের ধ্যানধারণা। শিবাজীর বীর গাথা নিয়ে সাহিত্যের ভিন্নভিন্ন শাখায় সৃষ্টি হল বিভিন্ন রচনা। প্রতিটি রচনা লেখকের অন্তরের অনুরাগে স্বকীয়তা লাভ করেছে। 'শিবাজী উৎসব' তাই প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। গিরীন্দ্র মোহিনীর ধ্যান দৃষ্টিতে শিবাজী শিবময়। শিব হচ্ছেন মূর্ত কল্যাণ, অশিবের সংহারক। শিবমন্ত্রে দীক্ষা নিতে তাঁর আহ্বান।

বল শিব শিব জপ শিববাহিনী
নাশিবে অশিব সে শিব গান
শিব শিব মন্ত্রে ভারত দীক্ষিত
গাও দেখি বঙ্গ করিয়া কম্পিত।

[শিবাজী উৎসব, স্বদেশিনী]

১। নজরুল রচনা সম্ভার, পৃঃ ৪৯২
২। রবীন্দ্র রচনাবলী. ৪র্থ, পৃঃ ১৯৩

শিব শ্যামায় তাঁর স্বদেশ মন্ত্রে দ্বৈতবাদের ভূমিকা। এঁরাই শক্তি, এঁরাই অভয়।

'আত্মদ্রোহিতা'য় কবির ইতিহাস মনন, যুগ-যুগান্তের রাজ্যপতনের করুণ-কাহিনী চয়ন দীর্ঘশ্বাসে বিধুর। দেশের সকলে বুক ফুলিয়ে রুখে দাঁড়ালে শত্রুর সাধ্য নেই সে শক্তি দলন করে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু রামায়ণের কাল থেকেই ঘরভেদী বিভীষণ সকল যুগের, সকল দেশের স্বর্ণপুরীর ধ্বংস সাধনে সহায়ক হয়েছে। মেঘনাদবধকাব্য ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ দুই-ই গিরীন্দ্র মোহিনীর কবি কল্পনায় চিন্তা ও উদ্দীপনার যোগান দিয়েছে। মহাভারত থেকে কালানুযায়ী স্তরে স্তরে নেমে এসেছেন মীরজাফরেব কলঙ্ক রেখায়। লোভ ও অবিমৃষ্যকারিতা স্বাধীনতা সূর্যকে পলাশী-প্রান্তরে ডুবিয়ে দিয়েছে। এরপরের ইতিহাস ভারতের দুর্গতির ইতিহাস, যুগযুগব্যাপী পরাধীনতা ও লাঞ্ছনার ইতিহাস। আর এই বিশ্বাসহন্তাদের ঘৃণা ও কলঙ্কের বোঝা নিয়ে জীবন কাটে, মৃত্যুতেও এই কালিমা মোচন হয় না। ইতিহাস-লাঞ্ছিত মূর্তি তাদের অশ্রদ্ধায় জেগে থাকে অবহেলার স্তূপে।

দুঃখের মধ্যেও কবি করেছিলেন এক অব্যর্থ ভবিষ্যৎবাণী।

জাতীয় একদা দুর্ভেদ্য তোরণ
যদি কভু বঙ্গে স্থাপিত হয়
অবশ্য ঘুচিবে দুর্দিন তখন—
সেইদিন হবে ভারতে জয়।

[আত্মদ্রোহিতা, স্বদেশিনী]

কবির দৃষ্টিতে সেদিন কোন ভ্রান্তি ছিল না। বাংলায় ধ্বনিত সেদিনকার মৃত্যুপণ, রাখীবন্ধনে যার উদ্বোধন। তপোসিদ্ধির পথে নিয়ে গিয়েছিল সেই কঠিন শপথ। বাংলার দুর্বার ছেলেদের মৃত্যু আলিঙ্গনে দুঃসাহসের পথে এগিয়ে যাওয়া রচনা করেছে নতুন ইতিহাস। সারাভারত এই মুক্তিপাগলদের রক্তঝরা সংগ্রামে বাঁচবার পথ খুঁজে পেয়েছে। ভারতের সেদিনকার সংগ্রাম স্বাধীনতার পথরচনার ইতিহাস।

'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়' এই আক্ষেপের সুর গিরীন্দ্রমোহিনীর কণ্ঠেও ছিল।

আজি তারা নিদ্রামগ্ন। কি অভিসম্পাতে
জাগে না হৃদয় আর ওই মহাঘাতে।
ওই গান ঐ তান না শিখায় কারে
একতার পরাক্রম অবনী মাঝারে।

[সমুদ্র-গর্জন-শ্রবণে, সঙ্গে]

এমন জাগরণী মন্ত্র গাইলে দেশ কি আর ঘুমিয়ে থাকতে পারে! মহাজীবনের সঙ্গীত কানে এসেছে—আর যে বসে থাকারও সময় নেই। গরুড়ের মত মা তখন

শুধবার জন্য তারাও যে কোন পণে সংগ্রামে প্রস্তুত। মরণজয়েই আছে দেশ-মাতৃকার বন্ধনমুক্তি।

স্বদেশ হিতৈষণায়, স্বাধীনতার মন্ত্রোচ্চারণে 'স্বদেশিনী' কাব্যটির যথার্থ মূল্য।

সিন্ধুগাথা (১৩১৪)

সমুদ্রের অতল জলের আহ্বান, বিশাল হৃদয়ের অশ্রান্ত ক্রন্দন এবং অনন্ত তরঙ্গ লীলার রূপদর্শনে গিরীন্দ্রমোহিনীর দুই চোখ তন্দ্রা ভুলেছে আর মন মেতেছে বিরাটের লীলাবর্ণনে। অতন্দ্র সেই নিরীক্ষণ এবং মনে তার গভীর অনুরণনে রেখায় ও লেখায় ফুটে ওঠে লাবণ্যময় বিকাশ। ছোট ছোট মনোময় চিত্রে 'সিন্ধুগাথা' সাগরদর্শনের এক রমণীয় আলেখ্য-কুঞ্চিকা (album)। ওয়ালটেয়ারের দীর্ঘ-প্রবাসজীবনের সমুদ্রবীক্ষণের স্মৃতি ধরা রইল 'সাহিত্য' ও 'জাহ্নবী'র পাতায়। কবির দেশে প্রত্যাবর্তনে 'জাহ্নবী'র আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশিত হল ১৩১৩ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়।

"ওয়ালটেয়ারে দীর্ঘ-প্রবাসের পর শ্রদ্ধেয়া কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। সিন্ধুতীরবর্তী প্রবাসী কবিকে বহুদিনের পর আবার তাহার তীরে ফিরিতে দেখিয়া জাহ্নবী তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে।"

সমুদ্রের উপকূলে বসে দৃষ্টির অবাধপ্রসারে মনে পড়ে আরেকটি বিরাট হৃদয়ের কথা। পিতার অকৃত্রিম স্নেহধারায় তাঁর বাল্যজীবন অভিসিঞ্চিত। বাল্যে বিবাহের পর সেই স্নেহ নীড় ছাড়লেও পিতৃ-হৃদয়ের করুণা তাঁর জন্য সর্বদাই প্রসারিত ছিল। বিশেষ করে জীবনের খরতপ্ত দিনে অনেক সান্ত্বনা মিলেছে সেখানে। সিন্ধুর বহুরূপের প্রকাশ এই 'সিন্ধুগাথা' পিতৃচরণে নমিত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন।

মুগ্ধনয়নে দেখেন, বেলাভূমিতে অশান্ত জলধির অবিরাম তরঙ্গাঘাত আর নীল দিগন্তের সঙ্গে নিবিড় আলিঙ্গনে সর্বদেহে উচ্ছ্বাসের কম্পন। 'সিন্ধু' কবিতাটি এই নিবিড়দর্শনের দীর্ঘ-তন্ময়তার চিত্রকল্প,

> মিলিত বিস্তৃত দিগন্তনীলে,
> উত্তাল-তরঙ্গোদ্বেল-ঊর্ম্মিলে !
> নর্ত্তিত—গর্জ্জিত—প্রলয়-ছন্দা ;
> চঞ্চল-কল্লোল-জলদ-মন্দ্রা,
> কার্পাস-ফেনিলা বেষ্টিত-বেলা,
> তাল-তমাল-সুরম্যা, সুনীলা।

[সিন্ধু, সিন্ধুগাথা]

এরপর রূপমুগ্ধ কবিদৃষ্টির তন্ময়তা গাঢ়তর। প্রহরে প্রহরে বিভিন্ন পট-ভূমিতে, বিভিন্ন মনোভঙ্গিতে, বিভিন্ন জীবনছন্দে সমুদ্রের সৌন্দর্যপুঞ্জ বর্ণে,

গাথায়, রূপকল্পে কবির প্রকাশের বিভিন্নতা। উদয়ভানুতে, মধ্যাহ্ন তপনে, অস্ত-রবির প্রগাঢ় চুম্বনে সমুদ্রের রঙ্গ, অঙ্গ-শোভার বৈচিত্র্যে কবির মনও উচ্ছল হয়ে ওঠে। 'সমুদ্র দর্শনে' সেই দেখার ফলে বর্ণময়ী রূপমতী চিত্রলহরীর সৃষ্টি। নারীর জীবনলীলার বিকাশ যেন দর্পণে প্রতিফলিত।

প্রভাতের পুণ্যজ্যোতিতে আভাসিত সমুদ্র-বালার অরূপ মূর্তিখানি,—

কণ্ঠে দল-মল শুভ্র মালিকা,
আবদ্ধ কুন্তল তরঙ্গ-বালিকা
নৃত্য চপলা মুখরা বালিকা।

[সমুদ্র দর্শনে, সিন্ধুগাথা]

দিবসের দীপ্ত প্রহরে বালিকা হয়েছে মনোমোহিনী যুবতী মূর্তি—

মধ্যাহ্নে হেরিনু যুবতী সুন্দরী
পরি ঘনঘোর স্নিগ্ধ নীলাম্বরী
ছড়ায়ে দিগন্তে সুনীল মাধুরী।

[সমুদ্র দর্শনে, সিন্ধুগাথা]

দিনমণির চক্রাবর্তনে সমুদ্রের রঙ বদলায়, রূপ ছড়ায়। সমুদ্রের রভসলীলায়, তরঙ্গের নৃত্যছন্দে, প্রমত্তা তরুণী 'যৌবনমদে মত্তা'। তার

স্ফীত অঞ্চল লুণ্ঠিত তীরে
তাল-রসাল রাজিত তীরে।

[সমুদ্র দর্শনে, সিন্ধুগাথা]

রজনীর মোহিনী মাদকতায় সমুদ্র-নারীও আবেগ-বিহ্বলা, গতি-চঞ্চলা রঙ্গ-তরঙ্গে মনোরঞ্জিনী। যৌবন-অতিক্রান্তা, তবুও গর্বিতা প্রৌঢ়া নারী মঞ্জুল চরণে, বাসর গমনে চলমানা। বালিকার তরঙ্গ-চঞ্চল গতি জীবনের প্রান্তসীমায় এসেও স্থির নয়, বয়সের ভারেও অস্থিরতায় অশান্ত।

এমনি উদ্দাম, এমনি তরল
এমনি সফেন, এমনি প্রবল,
এমনি ছুটিয়া করি কল কল
লুটিয়া বেলার কোলে—
ঘুমায়ে পড়িবে ঢলে'।

[সমুদ্র দর্শনে, সিন্ধুগাথা]

'সিন্ধুগাথা' সমুদ্রের রূপ-লীলার এক পূর্ণ আলেখ্য। রূপকের আশ্রয়ে চিত্রকল্প-সৃজনে কবির মনোভাবনার সার্থক রূপায়ণ।

'জলধি' কবিতাতেও সৌন্দর্য-ধ্যান। চিত্তের এই মগ্নতা থেকে চিত্রকল্পের সৃষ্টি। 'সিন্ধুগাথা' বহুবর্ণের ছবির সংকলন না বর্ণ-বিলাসের কবিতাগুচ্ছ বোঝা দায়। জীবনের অভিজ্ঞতাই চিত্ররচনের সহায়ক। সমুদ্রের অবিশ্রাম গর্জন আর আকুলিত তরঙ্গোচ্ছ্বাস কত ছবিই এঁকে যায় কবির চোখের সামনে। কখনও

মনে হয়, অনন্ত নিদ্রায় শায়িত, জাগতিক সৃষ্টিতে উদাসীন, ভগবানের পায়ে সমুদ্রের নিষ্ফল ক্রন্দন, নিষ্ফল অভিমান। অবিরাম আছড়ে পড়া, আবার ব্যর্থ-বেদনায় ফিরে যাওয়ার মধ্যে এক দুরন্ত বালিকার অভিমান ও স্থবির পিতার নির্বাক, নিস্পন্দ চাহনি। প্রশান্ত বেলাভূমির মধ্যে কবি আবার দেখেন সহনশীলা মাতাকে, বালিকার অসহিষ্ণু কান্নার দিকে তাকিয়ে কৌতুকে প্রসন্নহাস্যে উজ্জ্বল দৃষ্টি। এই মাতা কন্যার মধ্যেই দৃষ্টির ভিন্নতায় কখন স-পত্ন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রখর দিবালোকে, প্রফুল্ল জগতের হাস্য-দীপ্তি ঈর্ষাবিষ জ্বেলে দেয় বিদ্বেষে নীল, সাগরের বুকে ; তখন তার কেবল বিধ্বংসী চিন্তা। কবি ভাবনা-ধারারও স্থিরতা নেই, এক থেকে অন্যে দ্রুত পথ পরিবর্তন। এরপরেই মনে হয় দেবাসুরের মন্থন ক্রিয়াতেই সে চির-ব্যথিত।

অধরে অমৃত দিলি,—নীলকণ্ঠে হলাহল ;
রত্নময়ী সুনীলে গো ! মানবে দিলি কি বল্‌ ?

[জলধি, সিন্ধুগাথা]

'অভিশপ্তা' সকলের শাপমোচনের কথা বলেন কবি, কেবল কি বেদনাবিদ্ধ সাগরের মুক্তি নেই ? কবির এই কবিতা লহরী যেন ছায়াচিত্র, চঞ্চল ঊর্মির মত অস্থির পদে গতিশীলা। জানিয়ে দিয়ে যায় তিনি একজন দক্ষরূপ শিল্পী।

সমুদ্রের এই রূপলীলায় মগ্ন হয়েছিলেন আরেকজন কবি। 'পঞ্চ চামর' ছন্দে 'সিন্ধু তাণ্ডবে' গাইলেন সাগরের প্রলয় রূপ।

মহেশ্বরের প্রলয় পিনাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল।
বাজাও পিনাক বাজাও মাদল
আকাশ পাতাল কাঁপাও হেলায়।[১]

গিরীন্দ্রমোহিনীর মত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সমুদ্রের দেহ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও কাব্য-সৃষ্টিতে মগ্ন। সাগর বুকে ভগবানের দিগন্ত বিস্তৃত শয্যাখানি উভয় কবিকেই কাব্য-চেতনায় নাড়া দেয়। কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর মত তিনিও সেই বর্ণনায় মুখর—

জগন্নাথের শীতল শয়ান
তুমিই কি সেই অনন্ত নাগ ?
ফণায় ফণায় মাণিক তোমার
পাথার হিয়ায় অতুল সোহাগ ॥[২]

এঁরা দুজনেই যখন বাইরের সৌন্দর্যে উচ্ছ্বাসে আকুল, তখন 'বসুন্ধরা'র কবিকে দেখা যায় ভাবে বিভোর। অন্তরের গভীরে তিনি ধ্যানলীন। গিরীন্দ্র-

১। কাব্য সঞ্চয়ন, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, পৃঃ ১২
২। ঐ " পৃঃ ১৪

মোহিনী সহ্যশীলা বেলা-মাতার দুরন্ত, চপলা, অস্থির মতি কন্যা সাগরের ছবি এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্টির কাছে সমুদ্রের অনন্ত ব্যাকুলতায় চিরন্তন মাতৃমূর্তি। মাতৃস্নেহের কী বিশাল সৌন্দর্য ছত্রে ছত্রে। উদ্বেলিত বক্ষে কী নিবিড় ভালবাসা, নিদ্রাহীন চক্ষে অসীম ব্যাকুলতা।

একমাত্র কন্যার মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষায় 'বেদমন্ত্রসম' প্রার্থনা অনন্ত অম্বরে অবিরাম মিশে যায়। 'বসুন্ধরা' কবিতায় মাতৃহৃদয়ের গভীরতা, শঙ্কা ও ব্যাকুলতার নিরাবরণ ব্যাপ্তি বহুপূর্বের রচনা হলেও পূর্বোক্ত কবিদ্বয়ের কাব্য-ভাবনাকে স্পর্শ করেনি। বাইরের রূপে মুগ্ধ তাঁরা, চিত্রকল্পগুচ্ছ রচনাতেই তাঁদের তৃপ্তি।

'আমাদের কুটির' ও 'ডলফিনস্ নোজ' ভাবের সারল্যে, ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্যে, চিত্রময়তা গুণে দুটি মনোরম কবিতা। স্বভাব সৌন্দর্যে, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে 'আমাদের কুটীর' যেন অনন্যতায় অসাধারণ। মুগ্ধ নয়নে চেয়ে দেখার আনন্দশিহরখানি ভাষার বন্ধনে গেঁথে তোলা স্বভাব কবির বৈশিষ্ট্য। অনন্ত সৌন্দর্যাধার সমুদ্রের ধারে কুটিরের অবস্থান কবির আনন্দ-বেদনার অবলম্বন। তাইতো সহজ সুরে সহজ ছন্দের রচনা—

আমাদের কুটির খানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।

[আমাদের কুটীর, সিন্ধুগাথা]

'ডলফিনস্ নোজ'-এতেও নিভৃত বেলার স্পষ্ট সুন্দর ছবি।—

অচল অটল তুমি স্তম্ভিত পাষাণ :
হর্ষ শোক পারে কি হে স্পর্শিতে ও প্রাণ !
কুটিরে বসিয়া নিত্য হেরি নিরন্তর
তরলে কঠিনে অহো কি মহাসমর।

[ডলফিনস্ নোজ, সিন্ধুগাথা]

চিত্রময়তার অপূর্ব নিদর্শন এই কবিতা দুটি রচনা করেই রূপমুগ্ধ কবি ক্ষান্ত হননি। লেখনীর পরে হাতে উঠল তুলি। বর্ণে রেখায় 'আমাদের কুটির' ও 'ডলফিনস্ নোজ' চিত্র দুটি রচনা করে শিল্পীর সৃষ্টি-ব্যাকুলতার শান্তি।

চিন্তা ও ভাবের মোড় নিল এবার। 'অচেনা', 'নব-বৈধব্যে' অন্যসুরে অন্য বর্ণনা। সমুদ্রের রূপ বিলাস বা বেদনা-বর্ণন থেকে দৃষ্টি ফিরে আসে মানবজীবনে। ছন্দে বর্ণে যে জীবন-মাধুরী পূর্ণ বিকাশের জন্য বেদনায় গুমরে মরে, তাকে চিত্রের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চান। জগতে অনন্ত লীলার প্রকাশনে মহাকবির দৃষ্টির ব্যাপকতার থেকে বন্ধুত্বের মহান প্রেম বাদ পড়ে যায়, তিনি তাকে উচ্চ মূল্য দিয়ে প্রকাশ করেন। এ জীবনে শূন্যতার ক্রন্দন, আকাঙ্ক্ষিত বেদনার পরিতৃপ্তি স্বপ্নের জগতে।

নিদ্রাদেবী প্রধান সঙ্গিনী ;
মুদিলে নয়ন-পদ্মগুনি,

গোপন হিয়ার মাঝে পশি'
বাসনারে বাহিরিয়া আনি'
রচি সাধে সাধের জগৎ ;
অসম্ভব সম্ভবে মেলানি।

[স্বপ্ন-সম্ভাষণ, সিন্ধুগাথা]

এই অসম্ভবের রাজ্য নিদ্রাভঙ্গেই পালিয়ে যায়। তৎপর হয়ে ওঠেন কবি। জীবনে যে দেবার এখনও অনেক বাকী। জরাকে ঠেকিয়ে এসব সারতে হবে।

দু-একটি কাজ আর দু-একটি গান
এখনো রয়েছে বাকি, হ'ক সমাধান ;
তারপরে ওই তব পূত অধিকারে
শান্তচিত্তে প্রবেশিব সেবিতে তোমারে।

[পলিত, সিন্ধুগাথা]

'নববৈধব্যে' দৃষ্টিতে মোহ ছিল. জীবনের প্রতি আসক্তিতে মন ছিল করুণায় সিক্ত ; 'নিরাভরণা'য় এসে দৃষ্টি অনেক বাসনামুক্ত, অনেক জ্ঞান-সমৃদ্ধ। জীবনের সকল অবস্থাকে সহজ চিত্তে মেনে নেওয়াতেই প্রশান্তি। শুভ্র-বসনা, রিক্তা কন্যার জীবনের শূন্যতায় জননীর আকুল কান্নায় মোহগ্রস্ত হৃদয়ের বিষাদ।

মনে করিয়ে দেয়, 'বাসাংসি জীর্ণানি··· (গীতা)' নিরাবরণা কন্যাকে জননীই আনেন পৃথিবীতে, কোন আবরণই যার ছিল না একদিন, তার আভরণহীন দেহ-লাবণ্য জননীকে দুঃখের অতীতে নেয় না কেন ?

আজিকে দুহিতা তোর সেই শুভ্রবাসে
এসেছে আলয়ে তোর ;
—কেন এ ক্রন্দন ঘোর ?
কোলে লও স্নেহময়ি। সেই হাসি হেসে।

[নিরাভরণা, সিন্ধুগাথা]

জীবনের কূলে কবির দৃষ্টি বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারে না। সমুদ্র আবার কেড়ে নেয় মন। কিন্তু জীবনের অনুরাগে পূর্ণ মনের অব্যক্ত বাসনা মূর্ত্ত হয়েছে 'সমুদ্র স্নানে'র কয়েকটি কথায়—

ছিন্ন করি জননীর স্নেহের বন্ধন
উত্তাল উচ্ছ্বাসে ওই দিতে আলিঙ্গন—
চাহিছে জীবন-বধূ ছুটিতে আমার,
ল'য়ে তার শত ছিন্ন কুসুমের হার।

[সমুদ্র স্নানে, সিন্ধুগাথা]

অতৃপ্ত হৃদয়ের তৃষিত দৃষ্টি পড়ে জগতের সকল মিলন ছবিতে। শ্যামা ধরণী মিলনোৎসুক হৃদয়খানি মেলে দিতে চাইছে নবজলধরের কাছে। সর্বত্র নিনাদিত শাঁখে মাঙ্গলিক গান কানে এসে মধুর বিবশা করে কবির অন্তর।

'মধ্যাহ্নের সমুদ্র', 'অপরাহ্নে', 'সন্ধ্যায়', 'পারাবার' কবির তুলিতে ধরা সমুদ্রের বিচিত্র রূপের মোহন তালিকা। 'শত হাস্য, শত গান, রোদন, বেদন' কবির বর্ণ-বিন্যাসে কিছুই বাদ পড়েনি।

নব-বর্ষার নবীন মেঘ কবির মনকে টান দিয়েছে ঊর্ধ্বাকাশে, তারপর অকারণ, অবারণ চলা। জগৎ-সংসার ভুলে মন চলেছে যক্ষবধূর পানে।

কোথায় সে যক্ষবধূ বিরহ ক্লেশিত বঁধু
যুক্ত করে মেঘে অনুনয় ;
[প্রবাসে বর্ষা, সিন্ধুগাথা]

এদিকে,

সিন্ধু করে ধরি' গিরি সারা ওয়াল্টেয়ার ঘিরি'
পরায়েছে নিগড় বলয়।
[প্রবাসে বর্ষা, সিন্ধুগাথা]

কবি-হৃদয় এই নিগড় বলয়ে বাঁধা পড়লেও, মন সেই উজ্জয়িনী পারে। হঠাৎ,

গাছপালা ভাঙ্গে ঝড়ে, লেখনী খসিয়া পড়ে,
কড় কড় অশনি গর্জ্জন।
[ঐ]

আপনি গর্জনে বস্তু জগতে ফিরে আসেন কবি ত্রাস-কম্পিত বক্ষে। জীবনের মহিমা কবির মনকে রসোদ্বেল করে মৃত্যুর হিমশীর্ণ মূর্তি ভুলিয়ে দিয়েছে। 'বহুস্যাম' বলে 'এক' অজস্র ধারায় রূপের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন। বিশ্বপতির সেই মোহন সৌন্দর্যে কবি তন্ময়। দৃষ্টি যেন মাধুরী স্নানে রসমধুর, তেমনি 'শ্রাবণে' কবিতায় ভাবে, ভাষায় নেমে এল লাবণ্যের বন্যা।—

আজি প্রাতে মেঘ গেছে কেটে, ঝলমল স্বর্ণময় বারি,
পট্টবাসা পূর্ব্বাশার দ্বারে দিগঙ্গনা লয়ে হেম ঝারি
ঢালিতেছে কনক-উদক নীলকণ্ঠ শ্রাবণের শিরে,
আর্দ্র করি' ঘন নীল জটা স্বর্ণধারা পড়িতেছে ঝরে।
[শ্রাবণে, সিন্ধুগাথা]

সমকালীন 'জাহ্নবী'র পাতায় আর একটি 'শ্রাবণে' কবিতায় ঘন-বর্ষণে ঘোর দুর্যোগের কথা বর্ণিত। উত্তাল সমুদ্রের প্রলয়ংকরী মূর্তি। শিব যেন রুদ্ররূপ ধারণ করেছেন। কবির ব্যাকুলতা এখানে স্পষ্ট,—

কোথা সে সুকান্তি-উজ্জ্বল নীলিমা
বিপুল মহান্ হৃদয় গরিমা
তরঙ্গে তরঙ্গে সে রঙ্গ-ভঙ্গিমা
নিখিল হৃদয় মানস-চোর।[১]

১। জাহ্নবী, শ্রাবণ, ১৩১৪, পৃঃ ১২১

'স্বাগত' ও 'সীমাদ্রি শিখরে' পরিপূর্ণ বর্ষার আরো দুটি ছবি ; অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা বর্ষা ঋতুর পুলক তাঁকে কাব্য রচনায় বেশী ভাবার্দ্র করেছে। আনন্দ-উচ্ছল মনের ভাব ব্যক্ত করতে মাঝে মাঝে ব্রজবুলির শরণাপন্ন হয়েছেন।

হরষিত দিঙ্‌নাগ ভরলেই ঝারি,
অভিষেক ঘন রাণী—বরখত বারি।
খুলিয়া বলাকা সুশুভ্র ছাতি
উড়ল অম্বরে পুলকে মাতি।

[স্বাগত, সিন্ধুগাথা]

'সীমাদ্রি শিখরে' ভাব একই, শুধু ভাষা ও ছন্দের বৈষম্য—

ঝর ঝর ঝর ভৃঙ্গার-বারি ঢালে দিগঙ্গনা হরষে,
ফুটিছে শিহরি' কেতক, নীপ কাহার চরণ পরশে ?
দেখ দেখ দেখ, কার কেশদাম ঢেকেছে সকল দিগন্ত
কার এ বিমল তনু পরিমলে সুগন্ধ ধরণী অনন্ত।

[সীমাদ্রি শিখরে, সিন্ধুগাথা]

এখানেও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা তুলনীয়। তিনিও সোল্লাসে বলেছেন,—

ঐ দেখ আজকে আবার পাগলী জেগেছে,
ছাই মাথা তার মাথায় জটায় আকাশ ঢেকেছে।[১]

এক্ষেত্রে ওঁরা দুজনেই রূপোল্লাসের কবি। যখন দুজনেই বহির্দ্বারের অতিথি, তখন অন্তঃপুরের আমন্ত্রণে কবিগুরু গাইছেন,

আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে।
বনের ছায়ায় জল ছল ছল সুরে
হৃদয় আমার কানায় কানায় পুরে।[২]

চলমান জীবনের সকল ঘটনাতে গিরীন্দ্রমোহিনীর সজাগ দৃষ্টি ছিল। মালা হতে খসে পড়া জীবনকে তিনি শূন্য হৃদয়ে দেখেছেন। স্মৃতিমাল্য রচনা করে স্মরণীয়দের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র' কবিতাটিও সেই পূর্ণ-প্রাণের প্রণতি।

স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনে অনেক পাওয়াতে হৃদয় ভরেছে। এই অপূর্ব মিলনকে নানাভাবে ব্যক্ত করেও যেন তিনি পূর্ণ তৃপ্তি পাচ্ছেন না।

বসে' এই সুদূর-প্রবাসে স্মরি' সদা ভাষায় প্রভাব,
মূক হেথা সুনিপুণ দূতী, নিত্য সেথা প্রেমের অভাব।

[ভাবনা, সিন্ধুগাথা]

১। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাব্য সঞ্চয়ন, এম. সি. সরকার, ৫ম সং পৃঃ ১১।
২। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৪১

'শিখাও', 'পূর্ণিমায়', 'মুগ্ধা', 'মধুমাসে মাধবী', 'চিত্র' প্রতিটি কবিতায় তাঁর রূপ-তৃষ্ণার পূর্ণতৃপ্তি। প্রকৃতির অজস্র সম্ভারে তাঁর বিস্ময় ভরা দৃষ্টি অপরূপের ধ্যানে মগ্ন।

শতবার শত সুন্দর রূপ
আঁকিয়ে নিয়েছি চিত্তমাঝে ;
আঁখির পিপাসা তবুও গেল না,
তুমি সাজ কত নব সাজে।

[মুগ্ধা, সিন্ধুগাথা]

কখনও বা মনে গোপন আশার ধ্বনি।
নিবিড় হ'তে নিবিড়তম এ ঘোর অভ্রপটে,
কোন্ অদৃশ্য গোপন দৃশ্য এখনি উঠিবে ফুটে।

[চিত্র, সিন্ধুগাথা]

'সমুদ্র-গর্জ্জন-শ্রবণে'তে মন ফিরে আসে আবার সমুদ্রের পানে। এবার আর রূপজ-মোহে দৃষ্টি আচ্ছন্ন নয়।

সমুদ্রের তরঙ্গ-কল্লোলে অতীত বীর-বাহিনীর অস্ত্র-ঝনাঝনা তিনি শুনতে পান। সাগরের নৃত্যছন্দে দেখেন, ঝান্সীর রাণীর ভৈরবী মূর্ত্তি। এই ভীম-পরাক্রমের কথা 'স্বদেশিনী'তে প্রকাশ করেছেন। একই কবিতা, একই কথার পুনরুক্তি। 'হৃদয় ও সিন্ধু'তে সিন্ধুর কাছে কবির অনন্ত জিজ্ঞাসা, কিন্তু কোন উত্তর মেলে না। রোষে ক্ষোভে মনে হয় ক্ষুদ্র মানবের বিপুল মহিমার কাছে বিশাল সাগরও তুচ্ছ।

সাগর-কূল থেকে জীবনের কূলে ফেরার সময় এসেছে। 'সিন্ধুর প্রতি বিদায়োক্তি'তে বিদায়ের করুণ বিষণ্ণতা। নিবিড় আলিঙ্গনে যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে সাধ জেগেছিল, হৃদয় যাকে স'পেছেন, সেই রূপ-সুন্দরের কাছে শূন্য মনে বিদায় প্রার্থনা। সমুদ্রের গভীর কালো ছন্দোধারার সঙ্গে দুই কালো চোখের মিলন আর ঘটবে না। 'তবু মনে রেখো' বলার বলিষ্ঠতা নেই কণ্ঠে, মৃদু গুঞ্জনে করুণ মিনতি,—

ভুলিব না তোমা কভু, ভুল না আমায়,
আসি তবে নীরধি হে বিদায়! বিদায়।।

[সিন্ধুর প্রতি বিদায়োক্তি, সিন্ধুগাথা]

মহামৌন সাগর চির উদাসীন। কবির ব্যাকুল মিনতিও তরঙ্গাঘাতে নিরুত্তর, ব্যর্থ ফিরে আসে। কিন্তু পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করে এই করুণ আবেদন।

১৩১৩ সালের 'জাহ্নবী'র পৌষ সংখ্যায় এ আবেদনের উত্তর দিয়েছেন মুগ্ধ পাঠক চৈত্র সংখ্যায়। ভক্ত পাঠকের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অনুক্ত থেকে যাবে কবিতাটি তুলে না ধরলে।

হে কবি ! চেয়েছ বিদায় বাণী সিন্ধু সম্বোধিয়া.
সিন্ধুই কি সুখে আছে তোমায় ছাড়িয়া ?
উত্তাল তরঙ্গ তুলি স্তরে স্তরে স্তরে
আসিয়া পড়িত যবে কুটিরের দ্বারে.
তোমার নিদ্রিত আঁখি ফুটায়ে যখন
করিতে আসিত ঝাঁপি সাধে আলাপন—

* * * *

শুনিতে তোমার গান
হয়ে মুগ্ধ মন প্রাণ
মহান্ গম্ভীর স্বরে করিত ঝংকার।

জড়াতে কবির আঁখি নাচিয়া নাচিয়া
কত না খেলিত সিন্ধু গরবে মাতিয়া।
সিন্ধুই যে সুখে আছে ভেবো না ভেবো না,
প্রিয়জন প্রিয়জনে কখন ভোলে না।[১]

'সিন্ধুগাথা'য় 'শিখা'র বলিষ্ঠ ভাষণ নেই, জীবনের সেই গভীর আসক্তি যেন অপসৃত। মধ্যাহ্নের তেজ ক্ষয়ে হয়ে এসেছে অপরাহ্নকালীন ক্লান্ত মধুরতা, কখনও কখনও বিশীর্ণতা। শুধু চেয়ে দেখা, আর সেই দেখায় শিশুর তরলতা, বয়সের প্রান্তে এসে ভাব-গাম্ভীর্যেও টান ধরেছে। কিন্তু 'জাহ্নবী'র পাতায় ছড়িয়ে থাকা অন্য কবিতা থেকে এই সময়কার কবির হৃদয়ানুভূতির স্পর্শ আন্তরিকতা-পূর্ণ। 'সুন্দরের প্রতি' কবিতায় আরো পাওয়ার আনন্দের চকিত চমক।

তুমি যা আমারে দেহ (হায়) তারাও দেখে না কেহ !
ও তব গোপন দানে ভরা, ভারা আমারি ;
শৈলে শৈলে বনে বনে তুমি থাক মোর সনে,
যেদিকে নয়ন তুলি তারি মাঝে নেহারি।[২]

এই গোপন দানে মন যে তাঁর ক্রমশঃ ভরে উঠছে শেষের কথাতেই তা প্রকাশ্য—

রতন মুকুটমণি, দিও চাহে যেই ধনি,
মোরে দিও মম প্রিয়—গুপ্ত এ দরশ—
স্বজনে নিজনে আর রজনী দিবস।[৩]

শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় তিনি মৃদুকণ্ঠ হয়েছেন। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অনুচ্চ ভাষণ 'আতিথ্যে'ও উচ্চারিত।

১। জাহ্নবী, চৈত্র ১৩১৩, পৃঃ ৩৪৪-৪৫
২। „ অগ্রহায়ণ ১৩১৪, পৃঃ ৩২০
৩। ঐ পৃঃ ৩২০

ওগো, পূত এই হৃদয়ের সৌন্দর্য পিপাসা
পূত ওই নয়নের, সুপবিত্র ভাষা,
অদৃশ্য লিখনে ওই অদৃশ্য পরশে
ভরে দাও অঙ্গ মোর সোহাগে হরষে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিধর্মের ক্ষরণ হয়েছে, মধুর লালিত্যে ভাঙ্গন ধরেছে বলে যে সংশয় দেখা দিয়েছিল··আমাদের মনে, তা অনেকটাই ভিত্তিহীন। মনে হয়েছিল সুসংবদ্ধ বীণার তারে শৈথিল্য এসেছে, এ ধারণাও ভ্রান্ত। মহা সুন্দরের কাছে আত্ম-নিবেদনের পরম লগ্নে তিনি নিজের মধ্যে সমাহিত হয়েছেন। 'জাহ্নবী'র 'এ জীবন'-এর ষষ্ঠ বা শেষ স্তবকে তাঁর প্রণত-হৃদয়ের শেষ আরতির মধুর দৃশ্য—

লোকে ভাবে প্রভু মোর   এ জীবন লতা সম
আশ্রয় বিহীন।
তরু ভ্রষ্ট পড়ে আছি   অনন্ত ধূলার মাঝে
অতি দীনহীন॥
...   .
তারা তো জানে না হায়   এ স্নিগ্ধ চরণ ধূলি
কত মধুময়।
চির নিরাশ্রয় প্রাণ   পাইয়াছে এতদিনে
অনন্ত আশ্রয়॥
*   *   *   *
সুরভিত রেণু দিয়া   ঢাকিয়াছ সুখদুঃখ
দুঃস্বপ্ন অসার।
হোক নাথ, হোক নাথ   অমূল্য এ ধূলি মাঝে
সমাধি আমার॥[১]

নিঃশেষে নিজেকে সমর্পণের মধ্যে যে নিষ্পন্দ মনের উচ্ছ্বাসহীন আকুতি, তার সবটুকু জড়িত আছে 'এ জীবন'-এর প্রতিটি স্তবকে। শেষ প্রণামের এই মধুর আবেশে জীবনের পূর্ণতা।

অলক—

কবির জীবন-কালের সময় সীমানার মধ্যে 'অলক' পুস্তিকাকারে প্রকাশের পথ পায়নি। কাজেই এর প্রকাশনার সময়, তারিখ নিরুল্লেখ। অনুৎসর্গিত কবিতা-গুচ্ছ সংকলিত হয়েছে 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'নারায়ণ' প্রভৃতি সাহিত্য-পত্রিকা থেকে। কিন্তু এই সংকলনে ক্ষিপ্রতার সংগে শৈথিল্যও কম ছিল না। সযত্ন-প্রয়াসের অভাবে বহু কবিতার পুনরুক্তি ঘটেছে। কত কবিতা এখনও অ-স্পৃশ্য, অপ্রকাশের বেদনায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। সেদিকে সংকলনের যত্ন ও অবকাশের ত্রুটি

১। জাহ্নবী, ফাল্গুন ১৩১৪, পৃঃ ৪০২

লক্ষণীয়। 'শিখা' 'অর্ঘ্যে'র বিভিন্ন কবিতা পুনগ্রন্থিত। গিরীন্দ্রমোহিনীর রচনাসম্ভার অজস্রতায় পূর্ণ—আজো বহু কবিতার প্রকাশ সম্ভব হয়নি।

'অলকে'র প্রথম কবিতা 'স্বাগত' কিন্তু পূর্বগামিনী 'স্বদেশিনী'র বিপরীত ভাবধারায় নিষিক্ত। 'স্বদেশিনী'র কবিতাগুলি দেশমাতার চরণে ভক্তি, ভালবাসার পূর্ণ নৈবেদ্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে জাগ্রত জাতীয়তা বোধ, পরাধীনতার বেদনা, মাতৃবন্দনার কঠিন শপথে মৃত্যুপণ-এর কোনটাতেই অকৃত্রিমতার অভাব ছিল না। 'রাখীমন্ত্র', 'শিবাজী-উৎসবে'র পরে 'স্বাগত'তে ব্রিটেনের জয়ধ্বনিতে ভাবনার বৈষম্য পীড়াদায়ক। অবশ্য এর জন্য যুগপ্রভাবই মূলত দায়ী। দেশের প্রতিটি চিন্তাধারার দিকে গিরীন্দ্রমোহিনীর ছিল সজাগ দৃষ্টি, আর জাগ্রত চেতনা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উত্তেজনার শান্তি। ১৯১১ খ্রীঃ পঞ্চম জর্জের আগমনে রাজ মহিমা-কীর্তনে দেশ মুখর হয়েছিল। সেই উচ্ছ্বসিত গীতধারায় গিরীন্দ্রমোহিনীর কণ্ঠও মিশে গিয়েছিল।

পঞ্চম জর্জের জয়গানেই উচ্ছ্বাসের তীব্রতা কমেনি। তিন পুরুষ ধরে রাজ-শক্তির গুণকীর্তন :—

রামরাজ্য যথা শুনেছি ভারতী,
তাঁরো রাজ্যে তথা ন্যায়ের বসতি,
দয়াময়ী রাজ্ঞী তুষিয়া প্রকৃতি
বহু যশ-রত্নে ভূষিত শির

গেছেন চলিয়া শান্তিময় ধামে
আজো আসে নীর চক্ষে সেই নামে
সৃজিবে প্রকৃতি চির-হৃদি ধামে
দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি চির-রুচির।

[স্বাগত, অলক]

মহারাণীর রাজত্বকালে রামরাজ্যের সঙ্গে তুলনা দিয়েও ক্ষান্ত হতে পারেননি কবি। এরপর সু-যশের পালা সপ্তম এডওয়ার্ডের। সেখানেও ভক্তি নিবেদনের ত্রুটি হয়নি।

তাঁহার অঙ্গজ, তোমার জনক—
সৌম্য শান্ত বীর প্রকৃতি পালক।

[স্বাগত, অলক]

এই রাজ-বন্দনায় সকলের নৈবেদ্যই সাজিয়েছেন কবি। পঞ্চম জর্জের মাও বাদ পড়েননি।

দেখিনিক তব জননী জাগ্রিরা
যার রূপখ্যাতি পৃথিবী জুড়িয়া—

[স্বাগত, অলক]

এরপর তাঁদের সন্তান তদানীন্তন ভারতাধিপতি পঞ্চমজর্জের যশোগান।

আজি জয় জয় ভারতের জয়
এস এস রাজা এস সদাশয়,
ব্রিটেনের সূর্য ভারতে উদয়
অধীরা হরষে ভারত-মাতা।

[স্বাগত, অলক]

একেবারে বরণডালা সাজিয়ে সাদর অভ্যর্থনা। যে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা-কেই ছন্দোবন্ধ করতে গিরীন্দ্রমোহিনীর দেরী হয়নি। এদিক দিয়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সগোত্র ছিলেন।

'অর্ঘ্য'তে একবার নিজেকে মন্ত্রহীনা বলে সব দেবতার পূজারতি করেছেন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব বলে আত্ম-ঘোষণার পরে আবার 'অলকে' পুনরাবৃত্তি কেন?

'মন্ত্রহীনা' তিনি নন, প্রেমমন্ত্রে যে তাঁর দীক্ষা, তারই স্পষ্টোচ্চারণ 'মন্ত্র-পূজা'তে। এই মন্ত্রবলেই তাঁর অহমিকা ধূ-লুণ্ঠিত। পর্যবেক্ষণ শক্তিতে প্রকৃতির ঋতু-পর্যায়ে তাঁর যে রূপ দর্শন হয়, তা অভিনব, বিচিত্র।

প্রকৃতির রূপলীলা তাঁকে ভক্তিনত করেছে। তাপদগ্ধা ধরণীর সকল জ্বালার অবসান বর্ষার নব-জল-ধারায়। শুষ্ক হৃদয়ে যে তান ছিল স্তব্ধ, বর্ষার সজল স্পর্শ তাকে সপ্ত সুরে বাজিয়ে দিয়েছে। যে উদাসীনের প্রেমে ধরিত্রী প্রাণময়ী হয়ে ওঠে, সেই প্রেমময়ের চরণে বিকিয়ে দিয়েই কবির মহানন্দ।

'অহং এর অহংকার' কবির দর্শন ও চেতনার অপূর্ব সংগম। অহং বোধ না থাকলে জগৎ অর্থহীন। উপলব্ধির গভীরতায়, বর্ণনার নিপুণতায় ভাব ও ভাষার মণিকাঞ্চনযোগে রবীন্দ্রনাথের 'আমি' কবিতা অনন্যসাধারণ। 'অহং এর অহংকার'ও গভীর চেতনার সুন্দর বিকাশ। কিন্তু ভাবের যোগ্য ভাষার সহযোগে এর অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ ফুটে ওঠেনি। ভাবের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'আমি' কবিতার সমগোত্রীয় হলেও রূপসজ্জায় 'আমি'র আভিজাত্যের আকাশস্পর্শী মহিমা লাভ করেনি 'অহং এর অহংকার'।

'অহং এর অহংকার' ভাষার দৈন্যে উচ্চ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হল। অর্থের অতিরিক্ত যে অনু-অর্থ তাতেই কাব্যের প্রাণ, যে ব্যঞ্জনা, সঙ্গীতময়তার গুণে কাব্য অনুভবের জিনিস হয়ে ওঠে, সাদামাটা ভাষায় এই কবিতা সেই সমুন্নতি থেকে বিচ্যুত।

'তুমি' যে হয়েছ 'আমি' পরশি অহং রাগ,
পরশি সোনার কাঠি, জেগেছে জীবন-যাগ্।
তোমাতে না পেয়ে কিছু, আমাতে দিয়েছ ধরা,
আমারি মাঝারে তব পরিপূর্ণ প্রেম-ভরা।

[অহং এর অহংকার]

অথচ কবিতাটিতে চিন্তার উত্তুঙ্গ বিকাশ। আপনার অহং-কে তিনি পরমের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন—

তুমি যে হয়েছ মধু তুমি সৌন্দর্য্যের সার,
আমার মাঝারে তুমি সতত মধুরাকার।

* * * *

একেরই বিহার ক্ষেত্র বহুরূপা মায়াময়ী,
সতেরই বিকাশ আমি অ-সতী ভুবন জয়ী।

'সেই' কবিতায় সেই বলতে পরিচিত দুঃখ। 'নব আনন্দে জাগ' বলে প্রাণ যখন নবীন উৎসাহে সুখের আয়োজনে ব্যস্ত, তখন পুরনো বিষাদগাথা, মনকে অবসাদে ভরিয়ে তোলে। কবির মতে ভাগ্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া 'নান্যপন্থাঃ'।

'স্মৃতিস্তম্ভ' এবং 'স্নেহময়ী' কবিতা দুটি বিরহী-হৃদয়ের স্মৃতির বেদনা। জীবনের ভরা আয়োজন থেকে যে চলে গেছে, তাই স্মরণে দীর্ঘশ্বাসে মন্থর 'স্নেহময়ী' একই ভাবনা-জড়িত। তাজমহলের মত অমূল্য রত্ন খচিত অতুল শোভার সার না হলেও স্মৃতিস্তম্ভ হৃদয়ের প্রীতি ও প্রেমের মূল্যে কারো চেয়ে হীন নয়।

নেহারিয়া মর্ত্ত্যজনে ভাবিব বিস্মিত হয়ে,
কোন্ বিশ্ববিমোহিনী শিল্প-পারিজাতে শুয়ে।

[স্মৃতিস্তম্ভ, অলক]

সাগরপারের অজস্র আনন্দের সহস্র সঞ্চয়ের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে কবির মনে। জীবনের শেষ বেলায় সমুদ্র বেলায় বসে শেষ খেলা খেলতে সাধ। আবার প্রিয়-মিলনে বিগত সুখ ফিরে পাবেন।

আমি গেলে পরে ফিরে দেবে ফিরে
সে সুখ-রাশি ;

[আর একবার, অলক]

বৃন্দাবনের কিশোর লীলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনীকে বহু কবিতা রচনায় প্রেরণা দিয়েছে। 'কিশোরী' কবিতায় সেই চিরন্তন লীলার একটি সুখদ চিত্র। বাঁশীর সুর কানে এসে পেঁছালে ঘর-সংসার, সুখের আয়োজন সবই তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই চির-কিশোরীর আকাঙ্ক্ষা ;—

মধুর মাধুরী-স্রোতে,
কে না ভাসে এ জগতে ?
যে হাসে হাসুক, মোরা যাবো কাঁদিতে !
সে ছবি আঁকিয়া বুকে,
মরি ত' মরিব সুখে,
সুন্দর মরণ সেই— চল, লভিতে !

[কিশোরী, অলক]

'মৃন্ময়ী' বালিকা বয়সের পুতুল গড়ার স্মৃতি। সেদিনকার ক্ষুদ্র শিল্পীর প্রচেষ্টা পরবর্তী কালের 'অর্ঘ্য' কাব্যে 'চিত্রাঙ্কনে' কবিতায় পূর্ণতার পথে সম্মুখ-যাত্রা। বয়সের ব্যবধানে একই সাধনায় স্তর অতিক্রম। ছেলেবেলায়,—

মনের মতন কিছুতে হতো না
বড় দুষ্টু জড় মেয়ে।
ভেঙ্গে ভেঙ্গে গড়ে অক্ষমতা শেষে
দাঁড়াত সুরভি ল'য়ে।

'অর্ঘ্য' কাব্যের যুগেও শিল্প-রচনায় সেই একই চেষ্টা, এ সময়কার শিল্প-সাধনায় দুঃখ জয়ের বাসনাও অনেকখানি।—

ঘসি মাজি সারাদিন, সদা শ্রান্তি ক্লান্তি হীন,
ঘুরে ফিরি দেখি বারবার।
কেমনে বুঝাব কায়, কি মমতা তারে হায়,
মানসী দুহিতা সে আমার।

বর্ষা যে কবির প্রিয়তম ঋতু সে কথা আবার 'অলকে' 'বর্ষাবাদল' 'বাদল' রচনায় জানিয়ে দিলেন, 'আভাষ'-এর পৃষ্ঠা থেকে তুলে ধরে।

কবির দেব-বন্দনার শ্রেষ্ঠভাগ দেবী সরস্বতীর জন্য সঞ্চিত। তাঁর কাছে আত্ম-নিবেদনে তাঁর প্রসাদে জীবনের পূর্ণতা লাভ, কবি-জীবনের মহত্তম আকাঙ্ক্ষা।

কবির চিত্ত-ভাবনায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে প্রেম। প্রেম তাঁকে বিচিত্র দর্শনে প্রেরণা দিয়েছে। 'শুকতারা' কবিতাটি প্রেম, বিরহ, প্রতীক্ষার একটি সুন্দর নিষ্কলুষ ছবি। এই তারাটি একটি সুন্দর, করুণ প্রতীক। তার সুন্দর মূর্তিটি 'আভাষ' থেকে আবার উৎকলন করা হয়েছে।

মুখানি কিরণমাখা, তুমি কেন জেগে একা,
পাইতে কাহার দেখা, অনিমেষ চোখে?
প্রতিনিশি জাগি জাগি, তবু শ্রান্ত নহে আঁখি,
তোমারে যেন গো দেখি, বিরহীর পারা।

[শুকতারা, অলক]

'কুমার-সম্ভব'-এর অনুবাদের অসম্ভবপ্রায় প্রয়াসকে তিনি সম্ভব করে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গিয়েছিলেন। গভীর ব্যুৎপত্তির লক্ষণ এই অনুবাদ। দুই ভাষাতেই গভীর দখল না থাকলে অনুবাদ-কৃতি অসম্ভব। মনে হয়, তিনি স্বীয় চেষ্টাতেই সংস্কৃত সাগরে প্রবেশ করেছিলেন। শুধু প্রবেশাধিকার নয়, ভেতরকার রত্নরাজির সন্ধানও পেয়েছিলেন। অনেকের মতে কুমার-সম্ভব মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য। কুমারসম্ভবকে হৃদয়ঙ্গম না করা পর্যন্ত শিক্ষা অসম্পূর্ণ।

তুলসীদাস রামচন্দ্রের, রামপ্রসাদ মায়ের এবং চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের কবি বলে চিহ্নিত হয়ে আছেন। তেমনি কালিদাসকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মহাদেবের কবি।

মানস-কৈলাসশৃঙ্গে নির্জন ভুবনে
ছিলে তুমি মহেশের মন্দির প্রাঙ্গণে
তাঁহার আপন কবি, কবি কালিদাস,

ভারতের প্রেমস্বরূপের যে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ করেছেন—তার তুলনা হয় না।

এই কল্যাণকর প্রেমই কুমারসম্ভবের আত্মা। এক যুগের মহাকবি একে সৃজন করলেন, অন্যযুগের মহাকবি এর সমস্ত সৌন্দর্য উদ্ঘাটন করলেন।

গিরীন্দ্রমোহিনী এই মহান কাব্যে প্রকৃত প্রেম ও রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং এর বিপুল মহিমা প্রকাশে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু উদ্যোগপর্বেই সমাপ্তি ঘটল কেন বোঝা যাচ্ছে না। যা-হোক দুঃসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন, শেষ করতে পারলে একটা কীর্তি রেখে যেতে পারতেন। পরবর্তীকালে অবশ্য কেউ কেউ করেছেন, কিন্তু গিরীন্দ্রমোহিনীর সাহিত্য সাধনার তুলনা চলে না।

যে ছাব্বিশটি শ্লোক তিনি অনুবাদ করেছিলেন, ভাবের গাম্ভীর্যে, ভাষার সৌন্দর্যে তা স্মরণ রাখার যোগ্য।

প্রসন্নদিগ্বধূবৃন্দ উজ্জ্বল আনন
ধূলি বিরহিত হয়ে বহিল পবন
বাজিল মঙ্গল শঙ্খ মধুর গম্ভীরে
বর্ষিলা কুসুমরাশি দেবগণ শিরে।
স্থাবর জঙ্গম হর্ষে সেদিন স্মরণে
পার্ব্বতী লভিলা জন্ম সেই শুভক্ষণে। (২৩, ২৪)

কুমার সম্ভবের সম্ভাবনা এখানেই শেষ হলেও 'মিলন' ও 'দ্বৈত বা দান'-এ প্রেমের মহিমা কীর্তনে অলকের সমাপ্তি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কন্যার শুভ পরিণয়ে মিলনের নাম 'মিলন'। আর দ্বৈত বা দান নতুন প্রেমের ছবি। সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা' যেন নবরূপে বিকশিত। সুরেন্দ্রনাথের কাব্য একটি পূর্ণায়তনের ছবি আর এখানে শিল্পীর কয়েকটি মোটা তুলির টান! সুরেন্দ্রনাথের মাতা ও জায়ার প্রতি নিবেদন এখানে উপভোগ্য হয়েছে জায়া, অনুজা ও আত্মজার প্রতি দৃষ্টিপাতে। এই নবপ্রেমজালেই 'অলকে'র ভূমিকা শেষ।

নানা পত্র-পত্রিকায় গিরীন্দ্রমোহিনীর বহু কবিতা আছে, যা গ্রন্থবন্ধ হয়নি কখনো। বন-পুষ্পের মত রয়ে গেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। সেগুলি একত্রিত করে মূল্যায়ন করার সময় এসেছে। বহু পুরোনো লেখা বর্তমানে আবার নতুন করে প্রকাশ সম্ভব দেখা যাচ্ছে। গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্য-রচনার আদিকাল থেকে একগুচ্ছ কবিতা এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশ হল না।

১২৯৪ সালের ফাল্গুন মাসের 'নব্য-ভারতে' 'গ্রাম্য-সন্ধ্যা' (পৃঃ—৫৭১-৫৭২)

কবিতাটি 'অশ্রুকণা'র সমকালের রচনা। প্রকৃতির শোভায় অন্তরের নিবিষ্টতা থাকলেও এতে ধ্বনিত দুঃখমগ্ন ক্ষীণকণ্ঠের মৃদুরণন—

দিনান্তে ডুবিল রবি
বসুধা কনক ছবি
বিষাদেতে ছায়াময়ী, মিলায় মিলায়।

অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় স্বর্ণাভ দ্যুতির স্পর্শ লেগেছে পৃথিবীর প্রান্ত-সীমানায়। প্রকৃতির রূপমহিমায় দৃষ্টি-স্নিগ্ধ হলেও অন্তরের গভীর গহনে প্রবেশাধিকার পায় না। ক্লিষ্ট-চিত্তের অবসাদ কথার সুরে প্রকাশ,—

ব্যথিত কম্পিত শাখী
গৃহে ফিরে যায় পাখী,
বিলাপ কাকলী পূর্ণ করিয়া গগন।

দিনান্তের আর একটি কবিতা আছে ১২৯৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতী ও বালকে'র পাতায়। 'গ্রাম্য-সন্ধ্যা'র সেই বর্ণাঢ্য বর্ণন এই 'গোধূলি' (পৃঃ ৪৯৪) কবিতাতে নেই। অন্ধকারের কালোছায়া 'গোধূলি কনক বেলা'কে গ্রাস করতে উদ্যত। কবির জীবনের প্রতিচ্ছবি যেন প্রকৃতির 'মলিন ছায়া'য় প্রতিবিম্বিত।—

ধরার উজ্জ্বল সুখ
কাননের শ্যাম বুক
মলিন ছায়ায় তার দিবে আঁধারিয়া।
শোকের প্রকৃতি যথা
হৃদয়েতে দেয় ব্যথা
নিজে আঁখিনীরে ভাসে দেয় ভাসাইয়া।

'ভারতী ও বালকে'র (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩ ; পৃঃ ১১৩) 'বাদল বা চাষার ভাষা' কবিতাটি সম্বন্ধে পুনরুল্লেখ করা হচ্ছে। দুঃখ-দিনের পথ-পরিক্রমার যুগে কবির দৃষ্টির বিস্তার যে বহু ব্যাপ্ত ছিল, এ কবিতাটি তারই নিদর্শন। দীনবন্ধু তাঁর 'নীলদর্পণে' চাষীর মুখে যোগ্য ভাষা জুগিয়েছিলেন, নবীনা কবিও চাষার ভাষাকে কবিতায় একটি সুন্দর চিত্রপট তৈরী করেছেন,—

হাঁসগুলোকে কুতায় কে বা তোলে—
ঝে বিষ্টি! মরবেক এখন
—অ্যাতখনে, বা নিয়ে গেল শেয়ালে!
তড়্ তড়্ তড়্ খই ফুটুচ্ছে শিলে,
উঠোনেতে বাদলো হাঁটুজল।

গিরীন্দ্রমোহিনীর হৃদয়ের বিস্তৃত অংশই শিশুর রাজ্য। 'গার্হস্থ্য চিত্রে' মা ও শিশুর অন্তহীন লীলার অমৃতাভাস।

মা নাই ঘরেতে যার ছেলে কোলে নাই যার
সব কিছু সব তার মিছে।

চাঁদে চাঁদে হাসাহাসি চাঁদে চাঁদে মেশামেশি
স্বর্গে মর্ত্যে প্রভেদ কি আছে !

১২৯৩ সালের 'ভারতী ও বালকে'র যে 'খুকুরাণী' (আষাঢ়, ১৪০ পৃঃ)

না ডাকিতে আসে ছুটে হেসে এসে বসে কোলে
সোহাগে জড়ায়ে গলা মনের হরষে দোলে।

'অশ্রুকণা', 'আভাষ'এর শিশু-সরণিতে এই খুকুরাণী'র স্থান হয় নাই। কাব্যের গ্রন্থনা থেকে 'খুকুরাণী' মুক্ত রয়ে গেছে। 'ভারতী'র পাতায় তার ছবিখানি স্বর্গীয় সুষমায় জড়ানো—

এই হাসে এই কাঁদে রোদ বৃষ্টি বারে বার
পরাণ জুড়াতে আছে খুকু বিনা কেবা আর।

'আক্ষেপ' কবিতাটির প্রকাশ, ১২৯৪ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের 'ভারতী ও বালকে', ১০০-১০১ পৃষ্ঠায়। সেই সময় 'অশ্রুকণা'র যুগ। কাব্যটি প্রকাশনার সঙ্গে সঙ্গেই কবির ভাগ্যে প্রশংসার লাজবর্ষণ। সমালোচনায় গিরীন্দ্রমোহিনীর আক্ষেপের কোন কারণ ছিল না। অস্পষ্টতা দোষে রবীন্দ্রনাথকে সইতে হয়েছে অসংখ্য বাক্যবাণ। রোমান্টিক কবির কাব্য-বিষয়ের অনির্বাচ্য মহিমা বোঝার ক্ষমতা কয়-জনের ছিল। সাহিত্য-রথের এক একজন মস্ত চালক—না বোঝার দায় নিঃশব্দে মেনে নেবেন কেন ? রবীন্দ্রনাথের দুর্গতিতেই কি এই কবিতা রচনা ? বক্তব্য অন্তত তাই বলে,—

'হায় ! কবির ঘটিল ঘোর দায়,
কৈফিয়ৎ কেমনে জোগায় !
আপনারে বোঝে না যে
বোঝাবে কাহায় ?

পরের কথায় এঁদের প্রতি গিরীন্দ্রমোহিনীর ব্যঙ্গ খুবই স্পষ্ট। অস্পষ্টতার দোষ দেবার সাধ্যই নেই কারোর—

নদী ছাড় কুলকুল
ধরিবে তোমার ভুল,
গেও না তুমিরে ফুল
সুরভি ভাষায়।
বসন্তের সমীরণ
ভাল চাহ যদি শোন
ফুর ফুর করে হেন
বয়ো না হেথায়,
অজ্ঞতার পরিচয়ে
অস্পষ্ট ভাষায়।

সৃষ্টি-মাধুর্যে আত্মমগ্ন হয়ে পতিহারা কবির দুঃখের দুঃসহ দিন অতিক্রমণের কষ্ট অনেক সহজ হয়েছিল। কাব্য-সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবির ভাব-বিধুর রচনা—

জানি না কে তুমি বসন্তের দিনে
হাত ধরাধরি করে
হাতে লয়ে বীণা, মুখে গুনগুন
আইলে আঁধার ঘরে,
মুছে দিতে আঁখি ফুটাইতে প্রাণ,
কত না যতন তব,
চিনি না তোমারে কে তুমি আমার
নিতি দেখি নবনব।

এই নব নব দেখায় কবি-ভাবনা এক একটি কবিতারূপে ফুটে উঠেছে। 'কে' কবিতাটি কবির দুঃখের মধ্যে সুখাবেশের পরিচয়। ১২৯৪ সালের 'ভারতী ও বালক'-এর জ্যৈষ্ঠ মাসের ৭১ পৃষ্ঠা থেকে 'কে তুমি' কবিতাটি উদ্ধৃত।

মাঘমাসের 'ভারতী ও বালকে' (১২৯৪) আরেকবার স্মরণ করেছেন বীণা-বাদিনীকে। শ্রীপঞ্চমীতে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ উপচারে তাঁর উপাসনা করেছেন।

যত রাগ সুন্দরী
জননী বাণী ঘেরি
গাহত বন্দনা গান।

তাঁর জীবনের পরম তপস্যাই হল দেবীর কৃপালাভ। জ্ঞানদার সাধনাতেই প্রথম বয়সের চেতনার উন্মেষ। তারপর দুঃখের আঁধার রাত্রি মন্থর বেগে কেটেছে বীণার তপস্যাতেই।

নমঃ নমঃ সরস্বতী
দেবী ভারতী
পীযূষ ভাষ ভাষিণী—

বলে প্রতি বছরই দেবীর অর্ঘ্য রচনা করেছেন।

দেবীর আরাধনায় বসন্ত-প্রভাতে প্রকৃতির আশ্চর্য সুন্দর রূপেও তিনি বিস্ময়াবিষ্টা। প্রকৃতি-দুলালী তিনি, আজীবন রূপদর্শিনী, কাজেই দৃষ্টি এড়ায় না।

হরিত কানন লতা কুঞ্জবন
দোয়েলা কোয়েলা গায়
গন্ধে ভরভর ফুল্ল থরথর
উথলে সুবাস বায়।

শোভন মনোহর বসন্তের রূপে অন্তর তার বাঙ্ময়—

মুকুট সুন্দর চূতাঙ্কুর থর,
দোদুল মৃদুল বায়,

স্বপীত বসন, স্ববর্ণ বরণ
ফুলে ফুলময় কায়।

নব ফাল্গুনের মোহন মাধুরীকে অমর করেছেন 'বসন্ত রাগ ও বাসন্তী যামিনী'তে (ফাল্গুন, ১২৯৪, ভারতী ও বালক পৃঃ ৬৬৫-৬৬)।

বিমল নিশি পুলকে দিশি
রজত হাসি হাসিছে।

এমন মধুর রজনী বিফলে ভাসিয়ে না দিতে অ-দর্শ বঁধুর কাছে করুণ প্রার্থনা—

কুজিত পিক মোহিত দিক
ডাকিছে ও কি বধুরে ?
মধুর নিশি মধুর শশী
মিশিছে মধু মধুরে ?
আকুল প্রাণ আকুল তান
চাহে চরণ কমল ;
কোথায় সখা দেহ হে দেখা
ভকত আঁখি সজল ?

'বিভা' পত্রিকায় 'স্বখের দিবস' (ভাদ্র, ১২৯৫) কবিতাটি তাঁর অশ্রুভরা বেদনার দিনের কথা। তাঁর পরিপূর্ণ স্বখের নীড়ে মৃত্যুর আকস্মিক পদাঘাতে জীবনের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ বিচূর্ণ, প্রিয়জনের বিচ্ছেদে শূন্যতার বেদনায় অন্তর ভরে যায় হাহাকার ও আর্তনাদে। সেই করুণ কান্নাই কবিতার বাণীরূপ পেয়েছে।—

হায় ; কুসুমের বুকে গোপনে যেমন
কুটিল কীটের বাস।
বিজলীর বুকে চাপা সে যেমন
বিকট-বজর-ভাষ।

১২৯৭ সালের 'ভারতী ও বালকে' দুটি সুন্দর কবিতা আছে। 'যদি হাসি চাও' অপূর্ব ভাব-তরঙ্গের চতুর্মুখী কবিতা ?

কবি বলছেন, স্বখের সন্ধান করতে হলে ভোগের পথ থেকে দূরে যেতে হবে। হাসি ও স্বখ মেলে ত্যাগের মধ্যে, সংসারের ভোগ ও মিলনে তা সম্ভব নয়।—

রাশি রাশি হলাহল সংসারের জ্বালা
তা হতে রহিতে দূরে চাস্ যদি বালা—
ত্যজো তবে ঐ বিন্দু সুধা আকিঞ্চন
প্রণয়ের পূর্বরাগ প্রথম চুম্বন।

তিনি আরো বলেছেন,'

লভিতে চাওগো যদি আনন্দের হাসি
খুঁজো না তা অপরের মিলন পাথারে
অকূল বিরহ স্রোতে শুধু যাবে ভাসি
প্রিয়ানন মরীচিকা ক্রমে দূর দূরে।

(ভাদ্র, পৃঃ ২৮৭)

ভিন্নতর ভাবধারায় প্রবৃত্ত কবি কিছুদিন পরেই রচনা করলেন অন্য কবিতা। 'জগতের মৃত্যু' নামক কবিতা জাপানী হাইকু কবিতার মত ছোট্ট, নিটোল। মিলনের পরিপূর্ণ ছবি। দুটি প্রাণের মিলনে জগৎ চরাচর লুপ্ত হয়ে যায়।

যবে উথলিত অশ্রু নদী
দোঁহার কপোল বাহী
চুম্বনের তলে মিশে
তখনি জগৎ নাহি।

(ভারতী ও বালক, কার্ত্তিক ১২৯৭, পৃঃ ৩৮৬)

দুঃখ, আঘাত, ত্যাগ, তিতিক্ষা নানাভাবে আলোড়িত করেছে কবির চিন্তাধারাকে এই সময়ে। গৃহাভ্যন্তরের দুঃখের আবেষ্টনী থেকে মনকে মুক্ত করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে কবির। অন্য ভাবনার ফাঁকে মাঝে মাঝেই, ব্যথাবাষ্প ছাড়া পেয়েছে। নিদর্শন :রয়েছে 'তার' কবিতায়। (ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৮, পৃঃ ১৪৭)

কি ভেবে আসিত জল—কে জানে!
কেন বেধে পড়িত নিঃশ্বাস বয়ানে।
কত ব্যথা ভরা ছিল প্রাণে—তাহারি।
হায়, খুলে না বলিল আ-মরি!

চলে যাবার পরেও সমবেদনায় ব্যথিত প্রাণের দুঃখ শেষ হয় না;

কেন চলে গেল দুখ নদী একা বাহিয়া
হায় কেন না দেখিল সুখ চাহিয়া!

গিরীন্দ্রমোহিনী 'জাহ্নবী' সম্পাদনা করেছিলেন ১৩১৪ থেকে ১৩১৬ সাল পর্যন্ত। সম্পাদিকার কিছু কবিতার স্মৃতি ধৃত আছে 'জাহ্নবী'র পাতায়। সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৩১৪ সালে যে বছর প্রথম সম্পাদনার ভার নিলেন তখন দশহরায় 'জাহ্নবী সম্মিলন' উপলক্ষ্যে 'জাহ্নবী' কবিতাটি রচনা করেন। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা বা জাহ্নবীর ঐ শ্রদ্ধা নিবেদনই কবিতার বিষয়—

ইন্দু-মৌলি—হর শির—ধৃত-বারি
বিমল-পূত-জল—জগ-মনোহারী;
দেব-মানব-নাগ-পাবন কারী
ত্রিলোক-প্রবাহিত পাতক হারী।

শুধু এখানে নয়, সম্পাদকীয় প্রথম ভাষণেও তিনি 'পূততোয়া' 'জাহ্নবীকে' ভক্তিনত চিত্তের নিবেদন জানিয়ে কার্যভার গ্রহণ করেছেন। প্রথম বর্ষে কয়েকটি কবিতা 'জাহ্নবী'কে উপহার দিয়েছেন। ভাবে ও সৌন্দর্যে কবিতাগুলি অনুপম।

বর্ষাঋতু বরাবর কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর হৃদয়কে ভাবনা-উতল করেছে, দিয়েছে সৃষ্টির প্রেরণা। 'জাহ্নবী'-সম্পাদনাকালে প্রথম বর্ষের স্মৃতি 'শ্রাবণে' আছে ১৩১৪ সালের 'জাহ্নবী'র শ্রাবণ মাসের ১২১ পৃষ্ঠায়। ওয়ালটেয়ারে দীর্ঘ প্রবাস-জীবন কাটিয়ে ফিরেছেন। সেখানকার স্মৃতি তখনও অম্লান। শ্রাবণের উত্তাল তুফানে ভৈরবগর্জনে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগর রঙ্গই তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিভাত। বৃষ্টি-ধারায় কলকাতার বদ্ধজীবন থেকে উধাও হয়ে মন চলে গেছে সাগর-পারের অনন্ত-প্রসারী বিস্তৃত তীরে।

উৎক্ষিপ্ত সফেন তরঙ্গ বিপুল
গর্জিয়া ছুটিয়া ভাঙ্গিতেছে কূল।
কিসের লাগিয়া পাথার অকূল
এ হেন অশান্ত উন্মত্ত ঘোর।
... ...

অশান্ত সমুদ্রের সুনীল শোভা লুপ্ত, ক্রুদ্ধ অজগরের মত যেন বিশ্বগ্রাসে সমুদ্যত।

কোথা সে সুকান্তি উজ্জ্বল নীলিমা
বিপুল মহান্ হৃদয়-গরিমা
তরঙ্গে তরঙ্গে যে রঙ্গ-ভঙ্গিমা
নিখিল হৃদয় মানস চোর।

আশ্বিনের 'জাহ্নবী'র (১৩১৪) পৃষ্ঠায় (২০৯-২১০) 'আতিথ্যে' কবিতাটি সৌন্দর্য ও ভক্তি-চেতনার এক অপূর্ব চিত্রকল্প। জীবনের পথ-পরিক্রমার অন্ত্য-যুগে অন্তর তাঁর শান্ত ও নিরাসক্ত। সুন্দরের প্রতি নিস্পন্দ দৃষ্টিতে তাঁর চিন্ত-ভাবনা শোভাময় হয়েছে।

ওগো, পূত এই হৃদয়ের সৌন্দর্য পিপাসা
পূত ওই নয়নের সুপবিত্র ভাষা
অদৃশ্য লিখনে ওই অস্পৃশ্য পরশে
ভরে দাও অঙ্গ মোর সোহাগে হরষে।

অনন্ত ঐশ্বর্যে পূর্ণ এই যে বিশ্বভুবন, তা দেখার দৃষ্টি কয়জনের আছে। যাঁর আছে, তিনি এই রূপের জগৎ অতিক্রম করে অরূপের ধ্যানে মগ্ন হন। গিরীন্দ্রমোহিনীর ভক্তির নিবেদন তাঁরই উদ্দেশে।

হতে পারে মুক্ত হস্ত দানেতে তোমার,
বিচিত্র তোমার বটে, ঐশ্বর্য্য আগার,—

কিন্তু তুমি ত জান না কি যে বাঞ্ছিত তোমার—
তাই সরে যাও, রেখে যাও খুলিয়া দুয়ার।

জীবনের শেষ প্রান্তে পেঁাছে গেছেন কবি। সারাজীবন ধরে কাব্য-চর্চা দ্বারা একটা স্পষ্ট জীবন-চেতনায় তাঁর কবিমন ঋদ্ধিযুক্ত হয়েছে। এই দৃশ্য জগতের 'রম্যাণি বীক্ষ্যাণি' অতন্দ্র নয়নে নিরীক্ষণ করে স্রষ্টা সেই পরম সুন্দরের চিন্তায় ধ্যানমগ্না—

শৈলে শৈলে বনে বনে তুমি থাক মোর সনে,
যেদিকে নয়ন তুলি তারি মাঝে নেহারি।
শুভ্র শুভ্র দ্রোণ ফুলে দেখি লয়ে করে তুলে
তারি মাঝে আঁখি খুলে—মৃদু হাসি তোমারি।

(সুন্দরের প্রতি, জাহ্নবী, অগ্র, পৃঃ ৩২০)

একই ভাবনা সমৃদ্ধ কবিতা ত্রয়ের শেষেরটি 'এ জীবন' ১৩১৪ সালেই রচিত। ফাল্গুন সংখ্যার ৪০১-৪০২ পৃষ্ঠায় কবিতাটি আছে। আত্মসমর্পণের শান্তি ও আন্তরিক বিশ্বাসের বেণীবন্ধনে কবিতাটি অতুলনীয়। পুরো কবিতাটিই তুলে ধরতে সাধ হয়। একটি স্তবকের সামান্য উল্লেখেই এর মাধুর্য উপলব্ধ হবে।

লোকে বলে প্রভু মোর এ জীবন সঙ্গীহীন
একাকিনী বলে।
সহায় সম্পদ বল সর্ব্বস্ব হারায়ে গেছে
সমুদ্রের জলে।
* * * * * *
সর্ব্বস্ব কি ছিল মোর যদি তা হারায়ে থাকে
কোথা যাবে আর—
প্রেম সিন্ধু তুমি মোর, তোমারি চরণতলে
আছে সে আমার।

'জাহ্নবী' ১৩১৫-এর আষাঢ় মাসের 'নিরুপাধি' কবিতাটি সুন্দরের ধ্যানে অনুপম। এ সময় 'জাহ্নবী'র সম্পাদনার কাজে হয়তো দীর্ঘ সময় কাটত, কাজেই 'জাহ্নবী'তে এ বছরের ঐ একটিই কবিতা 'নিরুপাধি'। রচনাগুণে একটিই বহুর তুল্য হয়েছে।

ওগো, তোমার মতন এত কার গুণ
ওহে গুণনিধি ভুবনে—
কোন জ্ঞানহীন তোমারে নিগুর্ণ
বলেছে না জানি কেমনে?
এ সৌর জগৎ কার বিনির্ম্মিত
কাহার শাসনে নিত্য নিয়মিত.

কোন গুণবলে কালচক্র চলে,
ষড়ঋতু মাস বৎসর শোভিত ?
... ...
তোমা, কোন আঁখি হীন, মূরতি বিহীন
বলেছে,—মুদিয়া নয়নে,
দেখায়ো তাহারে ও রূপ মাধুরী
জ্ঞান গর্ব্ব হরি, নিও তার হরি !

রূপ-পাগল কবির সারাজীবন বিশ্বরূপ দর্শনেও তৃষ্ণার শান্তি হয়নি। জীবন-সন্ধ্যায় তাই তিনি 'পাগলের গীত' (নারায়ণ, পৌষ ১৩২৪, পৃঃ ১৩৯) গেয়েছেন। তিনি যে রূপের মধ্যে অরূপ মাধুরী পান করতে চান। রূপসুধা আকণ্ঠ পান করেও মনের মধ্যে অতৃপ্তির রেশ থেকে যায়।

আমায় কেন কল্লে এমন, সৃষ্টিছাড়া
যাঁরা জপে যোগে বসেন ধ্যানে তাঁরা নিত্য পান ত সাড়া ?
আমায় টিপি-সাড়ে রূপ দেখিয়ে
রাতারাতি নগর ছাড়া।
আমি কোথায় কোথায় করে বেড়াই
পাগল হয়ে পাড়া পাড়া।

পণ্ডিতদের মত শাস্ত্র ঘেঁটে সিদ্ধিলাভে কবির আকাঙ্ক্ষা নেই। ক্ষ্যাপার 'পরশপাথর' সন্ধানের মত তাঁরও পথ খোঁজা অনিবার। জ্ঞানের পথে 'অপ্রাপণীয়'-কে লাভ তাঁর মতে অসম্ভব।

অকার উকার মকার যোগে
নাকি অমৃত রস তুমি খাড়া।
ব্যাখ্যার চোটে গগন ফাটে
খালি মাথা খারাপ করবার পোড়া।

তিনি বলেন,

যদি মরা জপে রাম পেয়েছে
কাজ কি আমার শ্রুতি পড়া।

'ভারতী'তে 'মরণের রথ' কবিতায় কবি যেন তাঁর জীবন সন্ধ্যায় মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন—অতি শান্তচিত্তে প্রতীক্ষা করেন তিনি। এই কবিতার প্রকাশকাল ১৩২১ সালের ফাল্গুন মাস।

আসিতেছে মরণের রথ
দিতে তোমা নূতন জীবন,
নিঃশব্দ চক্রনেমী তার
ধীরে ধীরে করে আগমন।

মৃদু, শ্লথ চরণে আসতে মৃত্যুর আরো দশ বছর কেটে গিয়েছিল। কম্পিত বক্ষ নিজেকেই অভয় দানে তিনি বলছেন,

ভীত কেন, নববধূ সম
ওরে মোর দুর্ব্বল হৃদয়,
এখন ভাবিছ যারে পর
সেই তোর চির প্রেমময়।

দীর্ঘ এই নীরব প্রতীক্ষায় মধুময় মর্ত্য জীবনের ধূলি আরো মেখেছেন. রূপ-তরঙ্গ দু-চোখ ভরে আরো দেখেছেন।

অভিসারের চিন্তা এই সময়ে তাঁর মনে প্রেরণা জুগিয়েছিল। বিভিন্ন পর্যায়ে অভিসারের চিত্র ধরা পড়েছে তাঁর চোখে।

'অভিসারে' কবিতাত্রয়ে তাঁর মানসিক অতিক্রমণের আশ্চর্য সমুন্নতি।

১৩২১ সালেও তাঁর অভিসারের পথে চলা লজ্জা ও দ্বিধা জড়িত। সবার অলক্ষ্যে বঁধুর পাশে যেতে কণ্ঠ তাঁর সংকোচে ক্ষীণ।

লজ্জা করেগো সজ্জা করিয়া
যাইতে তাঁহার পাশ
পারিনেক তাই মালা ও তিলক
পরিতে গৈরি বাস।

গোপনতার অবলম্বন—তাঁর স্বীকারোক্তিতেই প্রকাশ—

গুপ্ত তাঁহার পীরিতি মধুর
ভালবাসা লুকোচুরি
চুপে চুপে তাই যাই তুয়া পাশে
দেখায়ে কিছু না পারি।

('অভিসারে' ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃঃ ৭৬২)

চার বছরে লজ্জা, সংকোচ অনেকটা দূরীভূত। অভিসারের কথায় তাঁর স্পষ্টোচ্চারণ প্রশংসনীয়। অভিসারের সাজে সাজিয়ে দেবার আকুতিও দ্বিধাহীন।

আয় কে আমায় সাজিয়ে দিবি অভিসারের সাজে,
ঐ বাদল রাতের মাদল খানি গুড়ু গুড়ু বাজে।
ঐ কদম তলার বিজন থানায় শোন্‌লো বাঁশী বাজে ;
আয় কে আমায় সাজিয়ে দিবি অভিসারের সাজে ;
কখন থেকে পথটি চেয়ে, সে আছে আমার আশে,
আজ লজ্জা ত্যজে সজ্জা ক'রে যাবলো তার পাশে।
ভাল যে বেশ বাসে প্রাণেশ,—তাইত যাব সেজে।
হর্ষনীরে অঙ্গখানি।—দেলো ধুয়ে মেজে।

(নারায়ণ, আষাঢ় ১৩২৫, পৃঃ ৬১৬)

জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে এখন তাঁর অন্তর মুক্ত, স্বাধীন, নিন্দা অপবাদে উদাসীন। বক্তব্য এজন্যই সহজ, নিঃসঙ্কোচ। সংকল্পের দৃঢ়তা লক্ষণীয়।

আকাশ যদি পড়ে ভেঙ্গে—মাথায় পড়ে বাজ !
আজকে তবু যাবই যাব—ফেলে সকল কাজ।
ওলো, কোন্ জনমের গুপ্ত তৃষা,—বাসা ভেঙ্গে আজ
চাইছে যেতে অভিসারে, ভাসিয়ে কুললাজ।

(ঐ)

আরো কিছুদিন পরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব অপসৃত। ব্যবহারিক জীবনের সমতল থেকে মন উঠে গেছে ঊর্ধ্বে, বহু ঊর্ধ্বে। নিন্দা-প্রশংসার বাধাগুলি আজ তাঁর চলার পথে সমস্যা টেনে আনতে পারে না, স্বচ্ছন্দ গতিকে ব্যাহত করে না। অতি স্বাভাবিক ভাবেই তিনি বলতে পারেন,—

আমি লজ্জা ত্যজিয়ে সজ্জা করেছি
যাইতে তাহার পাশ,
সবে, আঁখি ঠারাঠারি করে কানাকানি
মুখে টিপী টিপী হাস।

(নারায়ণ, কার্তিক, ১৩২৫, পৃঃ ৯২০)

চিরন্তন অভিসারিকার জবানীতে তিনি নিজের মিলনের কথাই বলেছেন। দীর্ঘ বিরহের তপ্ত দিন বহু দুঃখে কাটিয়ে প্রিয়তমের বাঁশীর স্বর শুনেছেন। কিছুদিন পূর্বে যাবার সংকল্প ছিল—বেশবাসে সাজাবার জন্য অনুরোধ ছিল। এখন যাত্রায় স্থির প্রতিজ্ঞ, সাজসজ্জাও সমাপ্ত—বেরিয়ে পড়াই বাকী।

আগে যশ, পরিহাসের দ্বন্দ্ব অন্তরকে দ্বিধান্বিত করেছে। এখন,

যশ— পরিহাস দুহুঁ স্বর্ণবাস
বেড়িয়া পরেছি অঙ্গে,
তার গুণগাথা উজ্জ্বল মুকুতা
কানে দোলে চারুভঙ্গে।

শুধু 'অধর কপোল' নয়, সারা অন্তরই তাঁর রঙ্গীন হয়ে উঠেছে মিলন অনুরাগে। জীবন শেষে মিলনের কথায় এমন অকুণ্ঠ প্রকাশ, এমন আত্মঘোষণায় সমস্ত কবিতাটিই অপূর্ব রাগ-রঞ্জিত হয়েছে। প্রৌঢ়ত্বের বিবর্ণতা নেই কোথাও, আশা-অনুরাগের বর্ণ-বিলাসে মধুময় হয়ে উঠেছে জীবনের অস্তরাগ।

গিরীন্দ্রমোহিনীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি প্রয়াত ব্যক্তিগণের উদ্দেশে কবিতা শোকাঞ্জলি রচনা করেছিলেন। 'শিখা'তে গ্রথিত হয়েছে 'অক্ষয়কুমার দত্ত' ও 'দীনবন্ধু অস্তাচলে' দীনবন্ধু মিত্রের উদ্দেশে স্মৃতিতর্পণ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তিরোধানে বঙ্গজননীর দুঃখের শূন্যতা আছে 'সিন্ধুগাথার' 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক কবিতায়।

'মুখার্জি'স ম্যাগাজিনে'র সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দত্ত পরিবারের বন্ধুই ছিলেন না শুধু, শেষজীবন ঐ পরিবারেরই একজন হয়ে কাটিয়েছেন। তাঁর অন্তর্ধানে গিরীন্দ্রমোহিনীর শোকগাথা রচনা করা খুবই স্বাভাবিক। তাঁর '৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' কবিতাটি ১৩০০ সালের ফাল্গুন মাসের 'সাহিত্য'তে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রিয়জনের বিচ্ছেদের বেদনা প্রকাশ পেলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর মহিমাকীর্তনে শোকের সীমানার ঊর্ধ্বে উঠেছেন। কাজেই,

কোথা গেলে পাওয়া যায় এমন বান্ধব হায়
বিপুলা এ ধরণী ভিতরে
এই শুধু ধ্বনিত অন্তরে।

সম্পর্কিত নাতজামাইয়ের মৃত্যুতে তিনি সেখানে উপস্থিত হন। 'মহাযাত্রী' নামক শোক কবিতা রচনা করেন তিনি।*

গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবনের শেষ রচনা হয়তো 'হেমচন্দ্র অস্তাচলে'। মৃত্যুর কিছুদিন আগে কবিতাটি তিনি রচনা করেছিলেন। হেমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করার সংকল্প স্থির ছিল তাঁর, কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি। কবিতাটি গিরীন্দ্রমোহিনীর মৃত্যুর পর মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর স্মৃতিতর্পণ করে 'গিরীন্দ্রমোহিনীর শেষ রচনা' নামক প্রবন্ধের শেষে ১৩৩১ সালের ফাল্গুন মাসের 'মানসী ও মর্মবাণী'তে প্রকাশ করেন।

হেমচন্দ্রের প্রতি গিরীন্দ্রমোহিনীর অচল শ্রদ্ধা ছিল। প্রথম জীবনে হেমচন্দ্রই ছিলেন তাঁর কাব্যের দিশারী। আজীবন সেই ভক্তি ছিল অটুট। হেমচন্দ্রের তিরোধানে ও দীর্ঘ কবিতায় তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধার প্রকাশ করেন—

ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার
নাই হেম, শূন্য বঙ্গ-কবি সিংহাসন।
নীরব সে স্বর্ণবীণা বিহীন ঝংকার,
প্রিয়পুত্রে বীণা যাহা করিলা অর্পণ।

গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবন-সাধনার সমাপ্তিও ঘনিয়ে এলো কিছুদিন পর। স্বর্গতা গিরীন্দ্রমোহিনীর দুটি কবিতা ১৩৩৩-এর 'বার্ষিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। এর ভাবধারা একেবারে নতুন। উপলব্ধির পরম চেতনায় কবিতা সমৃদ্ধ।

প্রথম কবিতা 'অমানিশার অশ্রু'তে জগতের সকল দুঃখকেই বুক পেতে নিতে চাইছেন তিনি। দুনিয়ার অশ্রুমোচনের ভার যেন তাঁর।

* মহাযাত্রী কবিতা স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্র মনোহরপুকুর নিবাসী শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অন্ধকারের চোখের জল
ঝরছে অবিরল
অশ্রুকণায় আছে নাকি গান।

ওর সকল ব্যথা নিচ্ছি আমি কেড়ে
আমার এ অন্ধকারের প্রাণে।
... ...

এর ফলে সকল ব্যথা মুক্তাফলের মত শোভার আঁধার হবে।
পদ্মকলির বুকের মাঝে
ব্যথার আঁখিজল,
আমার এই বুকেতে লুকিয়ে আছে
তরল মুক্তা ফল।
(বাঃ বসুমতী, ১৩৩৩, পৃঃ ১৬২)

দ্বিতীয় কবিতা 'পার্ব্বতী'তে অনাস্বাদিত ভাবের তরঙ্গ।
চায়নাকো সেই ভিখারী
দিতে কেবল তারেই পারি।
আমি পাষাণ রাজকুমারী
নিঠুর বিরচন।
(ঐ—পৃঃ ১৭৮)

একি তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার পরম সত্য। অনেক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যার তার অন্তরেই ব্যর্থতার শূন্যতা। কিন্তু রিক্তা, প্রসন্ন অন্তরই পূর্ণতায় সফল।

কাব্য ব্যতীত অন্যান্য রচনা

সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাঈ (ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য)—১৮৯২

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে পাবলিক থিয়েটার বা ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় নাটক রচনাতেও উৎসাহের জোয়ার এল। নাটকের মূল উপাদান ছিল পুরাণ এবং বীরত্ব ও দেশাত্মমূলক সংগ্রাম কাহিনী। টডের 'রাজস্থান' এ বিষয়ে সর্বাধিক প্রেরণা জুগিয়েছে। বীরগাথা এবং স্বদেশ প্রেমের কাহিনীর জন্য অনেকেই 'রাজস্থানে'র দিকে তাকিয়েছেন।

নাট্যকারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম অসামান্য ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকর। নাট্য রচনার সেই প্রথম যুগেও তিনি অসাধারণত্ব দেখিয়েছিলেন।

নাটকের ক্ষেত্রে অনেকেই স্বকীর্তি রাখার জন্য পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ছাড়াও রোমাণ্টিক, গার্হস্থ্য নাটকও রচনা করেছেন।

নাটকের এই অজস্রতা অনেক মহিলা নাট্যকার সৃষ্টি করেছিল। লক্ষ্মীমণি দেবীর 'চিরসন্ন্যাসিনী' (১৮৭২), স্বর্ণলতার 'শূরবালা সুরবালা' (১৮৭৮), নয়নতারা দের 'মণিমোহিনী' (১২৮৬), মণিমোহিনীর 'বিনোদ কানন' (১৮৮০) প্রভৃতি হয়তো গিরীন্দ্রমোহিনীর নাটক সৃজনের প্রেরণা দাতা। এ যুগের শ্রেষ্ঠ রচয়িত্রী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত উৎসব' স্মরণযোগ্য। এছাড়া আরো কয়েকটি উচ্চস্তরের নাটকও তাঁর আছে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর সমাজচেতনা ও যুগ-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি বরাবরই গভীর ছিল। 'সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাঈ' গিরীন্দ্রমোহিনীর একমাত্র নাট্যকাব্য রচনার উদ্দেশ্য হয়তো নাট্য-সাহিত্যের সহস্রধারার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করা। 'অশ্রুকণা', 'আভাষ'-এর যুগ তখন। আপন হৃদয়ের অবরুদ্ধ বেদনাকে চলমান সাহিত্যের প্রবাহে মিলিয়ে দেওয়া তাঁর সে সময়কার সাহিত্য-সৃষ্টির মৌলকর্ম। নাট্যসৃজন তাঁর অন্তর প্রেরণা সঞ্জাত হলে 'সন্ন্যাসিনী'তেই সমাধি ঘটত না। তিনি মূলত কবিধর্মী। প্রকৃতি-তন্ময়তা, জীবনতৃষ্ণা ও প্রেম-ব্যাকুলতা এই ত্রিমুখীসুরে তাঁর কাব্যাবলী সৃজন-সম্ভব হয়েছে। নাটকের গতি সঞ্চরণের সাথে দ্রুতগ হওয়া তাঁর স্বভাবের অনুকূল নয়। 'শিখা' ও 'অর্ঘ্য' রচনায় নিজ-কবিধর্মে পুনঃস্থিত হলেন।

যুগধর্ম অনুযায়ী গিরীন্দ্রমোহিনী নাটককে ইতিহাসাশ্রিত করলেন কিন্তু নিজের জীবনের প্রতীক সন্ন্যাসিনীর দিকেই অখণ্ড মনোযোগে স্থির হল বিষয় নির্বাচন। অপাপবিদ্ধা মীরার সংসার-বৈরাগ্যকে নাট্যকৃতিতে যেন অন্তরে বাইরে নিজের জীবনের পথ-সন্ধানকেই রূপদানের প্রয়াস। মীরার অনন্যা ভগবৎ-প্রেম কাহিনী উৎসর্গও করেছেন পিতামহীকে, যিনি বিষয় অতিক্রম করে দেব-সেবায় তখন আত্ম-নিবেদিতা।

'সন্ন্যাসিনী' একটি চতুরঙ্ক ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য। রাণা কুম্ভ বীর, সহৃদয় ধীরোদাত্ত নায়কের সর্বগুণযুক্ত কিন্তু তবুও ট্রাজিক চরিত্র। নাটকটির নাম 'সন্ন্যাসিনী' দিলেও, এখানে মীরার নয়, রাণা কুম্ভের অন্তর্দ্বন্দ্ব। তাঁর ট্রাজেডিই নাটকের প্রতিপাদ্য। তাঁর শোচনীয় মৃত্যুতে নাটকের সমাপ্তি। কয়েকটি মৃত্যু একসঙ্গে ঘটিয়ে এটিকে মেলোড্রামাতে পরিণত করা হয়েছে। নাটিকাটি কাহিনী আশ্রিত, চরিত্রাশ্রয়ী নয়। কাজেই চরিত্রগুলির দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিহ্ন নাটিকাটিতে নেই। ঘটনাস্রোত মন্দগতিতে অগ্রসর হয়েছে।

একখানি নাট্যকাব্য রচনা করেই গিরীন্দ্রমোহিনী বুঝেছিলেন, কবিতা রচনাতেই তাঁর সহজাত ক্ষমতা, সেখানেই তাঁর প্রাণাবেগের সহজ-প্রকাশ। কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা ছাড়া সাহিত্যের অন্যশাখার দিকে দৃষ্টি দেননি। কাব্যের জগতেই তাঁর জন্য একটি আসন স্থির-নির্দিষ্ট আছে।

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ প্রতিভা—

"অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে। যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়।"[১]

মানুষ চেনার এই কষ্টি পাথরটি অ-মূল্য। মানুষ আত্ম-স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বাজে কথাতে অর্থাৎ কোন বিশেষ মুহূর্তে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে অপ্রয়োজনের খেয়ালে। গিরীন্দ্রমোহিনীও আবেগের বশে 'প্রবন্ধ-প্রতিভা'র প্রবন্ধ সমষ্টি রচনা করেছেন, তাতে ধরা পড়েছে তাঁর কবি-হৃদয়, চিন্তাশক্তি আর আস্বাদনী-রীতি।

প্রবন্ধ নাম দিলেও প্রকৃত অর্থে এগুলি রম্যরচনার অন্তর্গত। প্রবন্ধ বস্তু-নিষ্ঠ, প্রবন্ধকার রূপদর্শী তত নন, যতটা বিশ্লেষক। প্রবন্ধ রচনায়, হৃদয়াবেগ অপেক্ষা জ্ঞানের স্থান উচ্চে, অনুভূতি অপেক্ষা বুদ্ধির মূল্য বেশী। প্রবন্ধ তথ্যপ্রধান, যুক্তি, তর্ক, বিশ্লেষণে তা দৃঢ়বন্ধ।

অন্যদিকে রম্যরচনা ঢিলেঢালা খোস-মেজাজী। মনের ভাবতরঙ্গকে ধীরে-সুস্থে রসিয়ে বলায় শিল্পীর বাক্‌বৈদগ্ধ্যের সুষম প্রকাশ। চিঠির রসের মত এও ব্যক্তিগত রসে সমৃদ্ধ। গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রবন্ধ মনোধর্মী, ব্যক্তিক রসে পুষ্ট, বিষয়ের বর্ণনাগুণে এক একটি কবিতার মত শোভন ও চিত্তাকর্ষক। 'প্রবন্ধ-প্রতিভা'র রচনাগুচ্ছ ভাবপ্রধান, যুক্তিনিষ্ঠ নয়, আছে লেখিকার সহৃদয় দৃষ্টিভঙ্গী আর আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ চিত্রপট সাজানো। তাঁর কবিতাবলীর মত প্রবন্ধরাজিও চিত্রধর্মিতায় মৃন্ময়রূপের প্রকাশ।

"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক, সে ছবি আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে।"[২] জীবনস্মৃতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের উক্তি।

বুড়ার অ্যালবাম

গিরীন্দ্রমোহিনীর রচনাতেও সেই চিত্রকরের সাক্ষাৎ মিলেছে। লেখিকা এখানে অন্তরবাসী সেই চিত্রকরের পরিচয়ও দিয়েছেন। "আমি কে জান কি ?' আমি তোমাদের সেই নির্জ্জন সঙ্গিনী। আনন্দ এবং দুঃখসুখ বিধায়িত্রী ত্রিকাল-চিত্রকরী শ্রীমতী স্মৃতি।" তারপর বৃদ্ধের স্মৃতিচারণ ভাষার কারুশিল্পে, চিত্রের পারি-

পাট্যে মোহিনীরূপে পরিবেশিত হয়েছে। নির্মল প্রশান্তি সর্বত্র বিরাজিত। প্রকৃতির এই প্রসন্ন ছবির কোন কিছুই লেখিকার দৃষ্টি এড়ায় না। "খেজুরের স্কন্ধদেশে সারি সারি মৃত্তিকা-কলসগুলি বাঁধা রহিয়াছে। বুলবুলির ঝাঁক ভিড় করিয়া কলস-নিহিত রসাস্বাদনে ব্যগ্র। হরিদ্রাবর্ণের বেনে বউগুলি মধুর স্বরে গান করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছে।" আবার অন্যত্র, "ঐ দেখ বড় উঠানের একপার্শ্বে প্রকাণ্ড মরাই সোনার ধান বুকে করিয়া গৌরবে শির উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অপরদিকে রান্নাঘরের চালের মাথা দিয়া ধূম উত্থিত হইতেছে, যেন নীলগিরি শ্রেণীতে কুজ্ঝটিকার সমাবেশ হইয়াছে।" এ চিত্রটি যেন তাঁর শৈশবের বৃন্দাবন মজিলপুরের। নানা-স্মৃতিজড়িত শৈশবের আলপনা রচনায় গিরীন্দ্রমোহিনীর কারুকৃতি তুলনাহীন,—

পুকুরে নির্মল জল, ঘেরা কলমীর দল,
হাঁস দুটি করে সন্তরণ
পুকুরের পাড়ে বাঁশবন
শূন্য জল কোলাহল কিচিমিচি পাখী দল
সাঁই সাঁই বায়ুর স্বনন,
রোদটুকু সোনার বরণ।

এই প্রবন্ধেও যেন সেই চিত্ররচনা, "ঠাকুর ঘরে গোপাল জিউ বিগ্রহের নিত্য-পূজা আরম্ভ হইয়াছে। রূপার সিংহাসনের উপর গোপাল বসিয়া আছেন; হাতে বালা, মাথায় চূড়া, গলায় তক্তি, কণ্ঠমালা, কোমরে বোর। গোপালের হাসিমুখ; হাতে সোনার বাটিতে মাখন, গোপালের ঘরের পার্শ্বের ঘরে ঘোল মওয়া চলিতেছে, তাহার মৃদুমধুর শব্দ উঠিয়াছে। সম্মুখের দালানে নগ্নপদে বাটীর কর্ত্তারা ও যুবকেরা বিগ্রহের আরতি দেখিতেছেন। বালকেরা ছোট ছোট হাত দুলাইয়া রূপার চামচ ব্যজন করিতেছে। ঠাকুরঘরের চাকর কাঁসার ঘড়ী পিটিতেছে। পুরমহিলারা স্নাত হইয়া ঠাকুরঘরের মধ্যে যুক্ত করে দাঁড়াইয়া নন্দকিশোর দর্শন করিতেছেন। ঐ দেখ, সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ ভট্টাচার্য তিলক ও মাল্য-চন্দনে চর্চিত হইয়া বাহিরের একটি ঘরে সতরঞ্চের উপর কতকগুলি ছাত্র-ছাত্রী লইয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত। কাহাকেও চাণক্যের শ্লোক, কাহাকেও বা মুগ্ধবোধের সহর্ণের ঘঃ বুঝাইতেছেন। দুর্গাবাড়ির সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের আটচালায় পাঠশালা বসিয়াছে। ... ...

আরও দেখ, বাহিরের ফটকস্থ সম্মুখের ময়দানে ভীমদর্শন দ্বারবানেরা মোচ মুচড়াইয়া কানের পাশে তুলিয়া দিয়াছে।"

দ্বিতীয়, শরতের আগমনে উৎসবের সূচনা, "ঐ দেখ আজ পূজার ষষ্ঠী, পূজার দালান আলোকে পুলকে গন্ধে আনন্দে ভরপুর, বধূমাতা ও কন্যাকাগণে পরিবেষ্টিতা গৃহিণী, করে রতনচূড় পরিধান করিয়া, মাথায় বরণডালা ধারণ

করিয়া প্রতিমা প্রদক্ষিণ করিতেছেন ; বধূমাতারা অলক্ত-রঞ্জিত-চরণে মুখর নূপুর পরিধান করিয়া গৃহিণীর পশ্চাৎ অনুবর্তন করিতেছেন ; হাতে হাত-ঝুমকাগুলি দুলিয়া দুলিয়া ঝুন ঝুন করিয়া বাজিতেছে। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর সানাই আর বালক-বালিকার কলকণ্ঠে পূজাবাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিতেছে ; রঙ-বেরঙের শাটীর তরঙ্গে-বরাঙ্গে মেঘ-ডম্বর-অম্বরের মধ্য দিয়া কনক-নিকষ বিদ্যুদ্‌-দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে।"

একটা সহজ প্রসন্নতা রচনাটিকে একটি অসাধারণ সৌকুমার্য দান করেছে।

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, দেবীর এই পূজানুষ্ঠান দেখেই বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তরে 'বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব' প্রবন্ধ ও 'বন্দেমাতরম্‌' সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন। তিনি বারুইপুর কোর্টে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন ঐ জমিদার ভবনে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। 'ভাষা', 'হৃদয়', 'ভোগ' গিরীন্দ্রমোহিনীর মোহিনী-হৃদয়ের মধুর ভাবনার ছন্দোময় প্রকাশ, "ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনি"—এই বাণীটিকে হৃদয়-রাগে রঞ্জিত করে নতুন ভাবনায় প্রকাশ করলেন। জগতের সব কামনা, বাসনা, অতৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষার পরমপ্রাপ্তি ঘটবে, যার জীবনে মূলমন্ত্র 'ভাল-বাসিবে বলে ভালবাসিনি'। নিষ্কাম ভালবাসার কথা এর চেয়ে সুন্দর করে বলা সম্ভব নয়।

'হৃদয়' প্রবন্ধও এমনি এক মহান্‌ ঔদার্যের কথা। হৃদয় এক বিশাল পট। এখানে বিশ্বকে প্রতিবিম্বিত করতে পারলে হওয়া যায় বিশ্বকবি। হৃদয়ে হৃদয়ের মিলন না হলে জীবনের শূন্যতা। একাকীত্ব নিয়ে একপার্শ্বে সরে থাকা উচিত ; মানুষের মহামিলনের সঙ্গমের স্রোতে আপনাকে মেশানো চলে না।

'তৃপ্তি' প্রবন্ধটি ১২৯৪ সালের ভারতীতে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি রচনাকালে 'অশ্রুকণা'-'আভাষে'র যুগ চলছে। একদিকে শূন্যতার ক্রন্দন, অন্য-দিকে বিবিধ ভাবনার অজস্র কবিতা ও কাহিনীরচন। বেদনা ও অনুরাগের অপূর্ব মিশ্রণের যুগ, রচনার ধারাও বিবিধ।

চিরদিনের অতৃপ্তির শ্রেষ্ঠ সংগীত কবি সার্বভৌমের গানের কলি। 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু, নয়ন না তিরপিত ভেল।' সকল প্রাণের অতৃপ্তির সুর মহাসঙ্গীতরূপে চিরধ্বনিত। গিরীন্দ্রমোহিনী মহাকবির সুরে সুর মিলিয়ে বলছেন, যা অনন্ত, যা গভীর, যা সুন্দর তাতেই অতৃপ্তি। তৃপ্তি অবশ্য মিলতে পারে ক্ষণিকের পার্থিব ভোগে। কিন্তু তৃপ্তি আর সুখের পথ ভিন্ন। অতৃপ্তিই সুখ। সুন্দর, অনন্ত, গভীরে সুখ আর অতৃপ্তি অঙ্গাঙ্গীবন্ধ। জগতের সব সুন্দর অস্থায়ী—এই অশেষ লাবণ্যময়ী পৃথিবীর স্থবিরত্বও ক্রমবর্ধমান। শুধু প্রেম অনন্ত—চির অম্লান। তাই প্রেমের অতৃপ্তিও সর্বাপেক্ষা দুঃখদায়িনী। 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।' অতৃপ্তি বর্ণনায় মহাকবির এ এক মহা-অভিজ্ঞান।

গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিসত্তা প্রবন্ধকারের সঙ্গে মিলে অভেদাত্মা হয়ে গেছে। ‘ভোগে’র বিষয়বস্তুর মধ্যে ‘অশ্রুকণা’, ‘আভাষ’-এর কবির স্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়। মধুর চিন্তাধারাকে সুন্দর করে প্রকাশ করার মধ্যে শিল্পকর্মের স্পষ্ট পরিচয়। সুখ ক্ষণিকের, আর দুঃখ চিরদিনের এই জগতজনের ধারণা। কিন্তু গিরীন্দ্রমোহিনীর মতে “পরম কারুণিক পরমেশ্বর কখনই এত নিষ্ঠুর ও প্রতারক হইতে পারেন না যে পৃথিবীকে দুঃখরূপ মৃত্তিকাতে গঠিত করিয়া উপরে একটু সুখের ঝক-ঝকা জুড়িয়া দিয়েছেন।” ব্যক্তি-সাধারণের ধারণা সুখের আয়োজনেই জীবন কাটে। সুখ ধরা দিলেও সে যেন নিমেষ মাত্র—তাই দুঃখই বিশাল হয়ে সারাজীবন ভারাক্রান্ত করে রাখে।

প্রিয়জনের মৃত্যু এ পৃথিবী দুঃখময় করে তোলে। কিন্তু গিরীন্দ্রমোহিনীর মতে চোখের আড়াল, মনের আড়াল নয়। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেলেও মন জুড়ে প্রিয়ের অবস্থান।

“নয়ন সম্মুখে তুমি নাই—নয়নের মাঝখানে, নিয়েছ যে ঠাঁই।” (রবীন্দ্রনাথ) এই পাওয়াই তো লেখিকার মতে পরম পাওয়া। এই চিন্তা দিয়েই তাকে সম্পূর্ণ ভোগ করা হয়।

‘চিন্তাপাদপ’ লেখিকার উদ্দেশ্যহীন, স্বার্থহীন, রমণীয় চিন্তাধারায় সুসংবন্ধরূপ। বিশাল বটগাছের বহু-বিস্তৃত ছায়া কত জনের আশ্রয়, কত জনের ক্লান্তি অপহারক, শান্তিদায়িনী। লেখিকার কাছে মনের চিন্তা ঐ ঝুরিনামা বটগাছের মত বহুব্যাপ্ত, বহু বিশাল। ক্ষুদ্র একটি বীজের মধ্যে যেমন বিশাল মহীরুহের অনন্ত সম্ভাবনা, তেমনি চিন্তাও একটি ক্ষুদ্র আশ্রয়ের চারপাশে অসংখ্য বৃত্তে, অতিবৃত্তে লক্ষ লক্ষ আশা আনন্দের সুরম্য আশ্রয়। আমাদের স্থূল দেহের পক্ষে যা অসম্ভব, যা সাধ্যাতীত, সেই অগম্য সংকীর্ণ অনন্ত পথে চিন্তা আমাদের নিয়ে যায়। এ মিথ্যা মায়াচ্ছন্ন নয়, এর মধ্যেই সত্যের নিত্যতা।

‘বিষমসমস্যা’য় যুগোপযোগী চিন্তায় নিমগ্ন হয়েছেন লেখিকা। তিনি নবযুগের পরম লগ্নে জন্মেছেন। সে যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে বাল্যাবধি পরিচিত। জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝা এবং সকল দুঃখ-কষ্টের সময়েও সমাজের প্রতিটি স্পন্দনের সঙ্গে তাঁর ভাবনা জড়িত ছিল। সেইকালে সকল কবি-ভাবনা ও সকল যুক্তিনিষ্ঠা ছিল নারীপ্রগতির অনুকূলে। ‘না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।’ নারী তখন, ‘অর্ধেক মানবী—অর্ধেক কল্পনা’ হয়ে মনীষী চিন্তার শ্রেষ্ঠভাগ পেয়ে আসছেন। গিরীন্দ্রমোহিনী জীবনের পথে এগিয়ে যেতে যেতে এই চেতনার আলো হাওয়ার স্পর্শ পেয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও উপলব্ধি করেছেন, ক্ষুদ্র সংখ্যক মঙ্গলকামীর চিন্তায় নারীমুক্তি প্রতিফলিত, বৃহত্তর ভাবনা এর বিরোধী। বহুজনের মতে নারীর মুক্তি সংসারের অমঙ্গলবাহী। নারীর স্থান, বাইরে দেখতে তাঁরা অভ্যস্ত নন—অন্ধ গৃহকোণে অস্তিত্ব বিলোপেই নারী-জীবনের

সার্থকতা। অধমের তুলনায় তখনও নারীর উল্লেখ সর্বাগ্রে আসত, "অমুক স্ত্রী-লোকেরও অধম" ইত্যাদি। তাদের মতে নারীর বন্ধন মোচন কোনমতেই নয়। কিন্তু মুষ্টিমেয়ের প্রচেষ্টাই অচলায়তনের ভিত ভেঙ্গে নবযুগের দীপ্তি নারীর দীর্ঘকালের অহল্যাত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। 'কোন আলো লাগল চোখে' বলে নারী তখন আপন ভাবনায় অস্থির। সেই শুভ মুহূর্তে তার কঠিন পণ—

'দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী'—

এ কারণেই সে যুগে নারীর দুই রূপ—একদিকে কবি-বন্দনায় দেবী-মর্যাদায় মহিমান্বিতা, অন্যদিকে গৃহকোণের যূপকাষ্ঠে বলির পশুর মত রজ্জুবন্ধা। নব-জাগরণের শুভলগ্নে নারীকণ্ঠে তাই সদম্ভ উক্তি 'অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে পিছে, সেও আমি নহি।'[১] জাগ্রত প্রাণের শক্তি, চিন্তা নিয়ে নারী তখন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, আপন পরিচয় দানে উদ্যত বাহু, ঊর্ধ্ব মুখ,

"যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"[২]

গিরীন্দ্রমোহিনী কবিতায় তাঁর ভাবনাকে বহুবার প্রকাশ করেছেন—জ্ঞানের অভাবই নারী জীবনের চরম দুঃখ। কাজেই যখন শোনেন, নারী-অস্তিত্বের একমাত্র সার্থকতা সন্তানের জন্মদানে এবং সংসার প্রতিপালনে, তখন তাঁর অন্তর প্রতিবাদ-মুখর হয়ে ওঠে। তাঁর বক্তব্য সন্তানের পিতামাতা, পুরুষ ও নারীর দ্বৈতরূপ। সংসার পরিচালনায় প্রয়োজন যুগ্মসাধনা, দ্বৈতপ্রচেষ্টা। একজন শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হবে, অন্যজন অবহেলায় নিষ্পিষ্ট হয়ে চোখের জলে চিরদিন ভাসবে, এর চেয়ে যুক্তিহীন কথা আর হতে পারে না। সকল যুগের নারীরাই গার্গী, লীলা, খনার উত্তর সাধিকা, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া অতি যত্নতঃ" তাঁরাই নতুন প্রজন্মের সার্থক স্রষ্টা।

অনেকের মতেই "বাজার হুন্দা কিনা আইন্যা ঢাইল্যা দি-ছি পায়"[৩]—। অতএব ঘরে বসেও নারী অন্নপূর্ণা; পুরুষ নিঃস্ব, ভিখারী। কিন্তু লেখিকার মতে এও নারীর চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে অক্ষম—জ্ঞানহীন মূর্খ নারী অন্তরে চির দরিদ্র, চির ভিখারী—প্রেমহীন হৃদয়ে জগতের মঙ্গলযজ্ঞে সে চির অক্ষম।

মিলনকথা— (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩—ভারতী)

'প্রবন্ধ-প্রতিভা'র প্রবন্ধ গুচ্ছ ছাড়াও কয়েকটি গদ্য রচনা আছে। তার মধ্যে 'মিলনকথা' ভাষার দীপ্তিতে, হৃদয়ের মাধুর্যে সুখপাঠ্য। দুর্ভাগ্যের রৌদ্রদগ্ধদিনে কেমন করে ঠাকুর বাড়ির অন্তঃপুরে ধীরে ধীরে একটি অন্তরঙ্গতার স্থায়ী আসন

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্রাঙ্গদা
২। " ঐ
৩। রজনীকান্ত সেন, বাণী ও কল্যাণী, পৃঃ ৮৪

লাভ করলেন তারই সুখোজ্জ্বল স্মৃতি, মমতায়-মধুর কাহিনী। একটি শোক-জর্জর হৃদয় সখীর প্রাণের উত্তপ্ত স্পর্শে অন্তরের শতদলকে বিকশিত করতে পেরেছিল, তারই অতীতচারণ। সেই যুগের ইতিহাসের কিছু আভাস ইঙ্গিতও পাওয়া যায় এতে।

চল্লিশ বছরের পূর্তিতে 'ভারতী'র নবীনা সম্পাদকদ্বয়ের হাতে তুলে দেন বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই 'মিলন কথা'। 'ভারতী'র সঙ্গে দীর্ঘকালের অচ্ছেদ্য বন্ধনের স্মৃতি 'ভারতী'র পাতাতেই সংবদ্ধ। প্রথমেই বলছেন সংস্কারজীর্ণ গৃহ-বন্ধনের কথা। "ভারতী উপলক্ষ্যে আমাদের দুইটি হৃদয় এক হইয়া যায়; কিরূপে চিররক্ষণশীল একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের অভেদ্য দুর্গ প্রাকারে আমাদের মিলন পতাকা উড্ডীন হয়, তাহা আজ ভারতীর চল্লিশ বৎসর উপলক্ষ্যে ভারতীর নবীন সম্পাদকদ্বয়ের ন্যায্য-প্রাপ্যবোধে উপহার দিতেছি।" সেই কখন কোন্ বছর কিভাবে ভারতীর সঙ্গে পরিচয়, সেই স্মৃতি তাঁর চিত্তপটে অমলিন, সেই স্মৃতি-চিত্রণে তিনি আত্মবিভোর। অতীত স্মৃতি মন্থনে ৺নরেশচন্দ্রের উৎসাহ বর্ণনার কথায় গিরীন্দ্রমোহিনী কিছুটা বাক্‌উচ্ছল হয়েছেন। তাঁর কাব্যরচনায় নরেশচন্দ্র কতটা উৎসাহী ছিলেন তার পরিচয়ও এখানে কিছুটা বর্ণিত। ১২৯১ সালের সেই দিনটি গিরীন্দ্রমোহিনীর কাছে চিরস্মরণীয়—"স্বামী আসিয়া বলিলেন, আজ একটি নূতন খবর দিব। তোমাদেরই স্বজাতীয়া একজন স্বর্ণকুমারী দেবী মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা হইলেন, তুমি ত পারিলে না।" ঘটনাস্রোতে যখন ভারতী সম্পাদিকার সঙ্গে পরিচয় হল—সেদিন সেই উৎসাহী প্রেরণাদাতা এ জগতে ছিলেন না। তখন গিরীন্দ্রমোহিনীর শোকদীর্ণ অন্তরের ভাবপ্রবাহে কবিতা ও প্রবন্ধের ভিন্ন ভিন্ন ধারা রচিত। তরু দত্ত, অরু দত্ত নারীশিক্ষার যুগ্ম-সুফলরূপে তখন সুপরিচিত। তাদের উদাহরণে গৃহকোণে আবদ্ধ রমণীকে উৎসাহদানে স্বামীর উদার প্রেরণা তুলনাহীন। গিরীন্দ্রমোহিনী চোখের জলে সেই কথা স্মরণ করেন, "আজি যে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে।"[১] স্বামীর-উৎসাহেই 'কবিতাহার'; 'ভারতকুসুম'-এর প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। তারপর দুঃখের সংসারে স্ত্রীকে একা ফেলে স্বামীর অন্য জগতে অন্তর্ধান। শোকার্তা নারী একহাতে ব্যথার অশ্রু মুছেছেন, অন্য হাতে নব-অভিজ্ঞতায় নতুন নতুন কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর কবিচেতনা এই সময় আপনার সিদ্ধির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। জীবনানুরাগ ও আত্মবিশ্বাস তাঁর ভাবনাবৃত্তের মূলাশ্রয়ী এবং এগুলিই ভিন্নতর কবিতা ও প্রবন্ধের প্রধান স্রষ্টা।

নারী শিক্ষা প্রসারে পিতার অনুরাগ ও উৎসাহ গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবনে ইঙ্গিতবহ। সৃষ্টি-চেতনার মৌল-প্রেরণায় তাঁর কত উৎসাহব্যঞ্জক কথা।

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৮৬

"স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পৃথিবী' ও 'দীপনির্ব্বাণ' পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমার দেশের স্ত্রীলোক এমন সুন্দর লিখিতে পারিয়াছেন, ইহা বিশেষ গৌরবের কথা।"

সে যুগের এই অসামান্যা রমণীর সঙ্গে পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা শুরু থেকে ক্রমে গাঢ়তর বর্ণে পরিণতি লাভ করল, সে কথাও গিরীন্দ্রমোহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। "তারপর বহুদিন পরে সিমুলিয়ায় আমার পিতৃভবনে সেই 'পৃথিবী' ও 'দীপনির্ব্বাণ' রচয়িত্রীর সহিত যেদিন আমার চাক্ষুষ মিলন হয়, সেদিন আমার পিতৃদেবও পরলোকে। অদৃষ্টের পরিহাস এমনি নিষ্ঠুর।"

গিরীন্দ্রমোহিনীর এ সময় একা পথ পরিক্রমা চলেছে, বেদনার স্রোতকে দু'হাতে ঠেলে। স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে অকৃত্রিম ও গভীর হৃদয় বন্ধন এ সময়েই গড়ে ওঠে ও মৃত্যু পর্যন্ত অটুট থাকে।

'সখি সমিতি'র প্রস্তাবকে কেন্দ্র করেই দুই অচেনা নারীর পত্রালাপের মধ্যে দুটি হৃদয় বাঁধা পড়তে থাকে। স্বর্ণকুমারী দেহের সৌন্দর্য ও মনের ঐশ্বর্যে অসামান্যা ছিলেন। নবযুগের বিবিধ গুণের বিকাশ দেখা গিয়েছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই তনয়ার মধ্যে। শিক্ষা ও সাহিত্যের বিচিত্র প্রকাশে স্বর্ণকুমারী সে যুগের নারীশ্রেষ্ঠা, আবার চরিত্রগুণে তেমনি দীপ্তোজ্জ্বল। অপূর্ব হৃদয়-মহিমা ও মহান্ ঔদার্যে তাঁর তুলনা ছিল না। 'সখিসমিতি'কে কেন্দ্র করেই গিরীন্দ্রমোহিনীর পত্রের অবতারণা। এই পত্রাবলীর মাধ্যমে হৃদয়ে হৃদয়ের সন্ধান ও চিরমিলন। 'সখিসমিতি'ই বোধহয় অন্তঃপুরের রুদ্ধদ্বার মোচন করে বাইরের মুক্তির সন্ধান দেয় গিরীন্দ্রমোহিনীকে। তাঁর মুখের কথাতেই শোনা যাক— সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষার প্রচারকল্পেই এই মহিলা সমিতির সৃষ্টি। অসূর্য্যম্পশ্যা অবরুদ্ধা হিন্দু মহিলাদের মধ্যে ইহা এক বিশুদ্ধ নরোজার দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছিল। এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ তাহারা আর কখনও ইতিপূর্বে উপভোগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। 'রমণীতে বেচে রমণীতে কেনে, লেগেছে রমণী রূপের হাট।'

এই 'সখিসমিতি' অনেক অন্তঃপুর নারীর বদ্ধজীবনে মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছিল। গিরীন্দ্রমোহিনীর লেখা থেকেই উদ্ধৃত করা যায়,—"আমার মনে আছে বেথুনে প্রথম উদ্ঘাটিত শিল্পমেলায় যেদিন মহিলাগণ কর্তৃক 'মায়ার খেলা'র অভিনয় হয় এবং মেয়েরা পুরুষদের সম্মুখে গ্যালারিতে বসিয়া সে অভিনয় দর্শন করেন। সে কি এক নূতন আনন্দ সকলে অনুভব করিয়াছিলেন। মনে আছে আমারই পার্শ্বোপবিষ্টা একটি মেয়ে বলিয়াছিলেন, 'এঁরা যদি সকলে চরিত্রবতী হন, তাহা হইলে এরূপ সুচারু অভিনয় ক্ষমতা বিশেষ প্রশংসা ও বাহাদুরির বিষয়।"

এই সখিসমিতির সকল প্রকার কাজেই যে গিরীন্দ্রমোহিনীর অদম্য উৎসাহ ছিল, তা তাঁর বিভিন্ন কথাতেই জানা যায়। "মনে আছে, সখি সমিতির এই প্রথম সম্পাদিকার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা কয় মায়ে-ঝীয়ে স্বহস্ত নির্ম্মিত

নানাবিধ বিচিত্র শিল্প-সম্ভার শিল্পমেলায় প্রদর্শনীতে পাঠাইতাম। আজ সে দিনও নাই, সে উৎসাহও নাই।"

'হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়'[১]—সেটা পত্রের মধ্যেই সুষ্ঠু সমাপন হল। 'আপনি' 'আপনার' বাহুল্য উঠে গিয়ে আরো শক্ত হল মৈত্রীর বন্ধন। চাক্ষুষ মিলনের পরে সে হৃদ্যতা অদৃশ্য গাঁটছড়ায় বাধা পড়ল। এই সহজ মিলনের আনন্দকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় গিরীন্দ্রমোহিনী সাহিত্যে এক অমরত্বের দাবী রেখে গেছেন,—

"রচয়তি শয়নং
সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানং"[২]

—এর অবস্থা যখন, তখন গলির ভিতর পাল্কীর শব্দ হইলেই মনে হইত,—
ঐ বুঝি বাঁশী বাজে।

পূর্বে কোন সংবাদ না দিয়া কতদিন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে উভয়ে উভয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের প্রেমের অভিধানে আদব-কায়দা বলিয়া কোন কথা ছিল না। আমাদের এই প্রণয়াভিসারকে শ্রীমতীর অভিসার হইতে কিছুতেই ছোট বলিতে পারি না। কতদিন আষাঢ়ের সেই ঘনঘোর, সেই মেঘ আঁধিয়ার, সেই মৃদুবর্ষণ, সেই কনক-নিকষ বিদ্যুৎ-দীপ্তি আমাদের এই অভিসারকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে। বাস্তবিক টিপিটিপি মেঘান্ধকারে স্নিগ্ধ দিবস দেখিলেই উভয়ের হৃদয় যে উভয়কে চাহিত তাহা একদিনকার একটি ঘটনায় প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল। সেদিন মেঘমেদুর দিবসে উভয়েই উভয়ের সন্ধানে বাহির হইয়াছি শেষে পথে সাক্ষাৎ।

দুহুঁ লাগি দুহুঁ জনে বাহিরায় পন্থ,
জনু চাঁদ লাগি ফিরে রাহু—রাহু লাগি চান্দ।

আমরা সেকালের সুতরাং 'পাতাল' রোগের হাত এড়াইতে পারি নাই। এই মিলন-সূত্রে আমরা 'মিলন' পাতাইয়াছিলাম।"

দুটি হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়ার এমন আস্বাদ্য কথা বর্তমানের সমস্যা-কণ্টকিত জীবনে যেমন দুর্লভ, তেমনি অচিন্ত্য। দুজনেই সংসারের কর্মজালে বহুবিধ বন্ধনে আবদ্ধ কিন্তু হৃদয়ের মুক্তির আনন্দে দুজনেই সমান উচ্ছ্বসিতা। প্রাণে প্রাণে এমন মধুর মিলন অসম্ভব প্রায় বলেই গিরীন্দ্রমোহিনীর 'মিলনকথা' সহজ ভাবের, সহজ ভাষার বর্ণনায় চিরকালের হয়ে রইল।

সিমুলিয়ার বাড়ীতে প্রথম সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ গিরীন্দ্রমোহিনী দেন নাই। সেদিন স্বর্ণকুমারীর দেহের স্বর্ণকান্তিতে বেশী মুগ্ধ না অন্তরের মহানু

১। রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিচিত্র গীতসংখ্যা ৬৯ ; পৃঃ ৪৪০
২। গীতগোবিন্দ, (জয়দেব) পঞ্চম সর্গ, গীতম, শ্লোকসংখ্যা ১১

সৌন্দর্যে বেশী অভিভূত গিরীন্দ্রমোহিনী না লিখলেও অন্তরের কাছেই যে বাঁধা পড়েছিলেন, তা বিভিন্ন দিনের বহু গল্পকথায় জানা যায়। "আমি একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলাম, তিনি টডের রাজস্থান পড়িতেছেন। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বইখানি মুড়িয়া ফেলিলেন। সেদিনের কথা ভুলিবার নয়। সে কি দামিনী চমক, কি হাওয়ার দমক, কি ভয়ংকর মেঘ গর্জ্জন, কি মুষলধারে বৃষ্টি, আমরা দুইজনেও দারুণ গল্পে নিমগ্না হইয়া গিয়াছিলাম। কখন যে আমার স্খলিত-কবরী হইতে লোহার কাঁটা দুটি তাঁহার শয্যায় পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা কিছুই টের পাই নাই। পরদিন কাঁটাসমেত এই মধুময়ী পত্রিকাখানি পাই।

"অধরে মোহন হাসি, নয়নে অমৃত ভাসে,

বিরহ কাঁদিয়া সারা নয়ন মেলিয়ে উঠি।"

(মিলন ও বিরহ—আভাষ)

'শিখা' ও 'আভাষে' এই মিলন-সম্বন্ধকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন স্বভাব-কবি গিরীন্দ্রমোহিনী।

ওয়ালটেয়ারের দীর্ঘ প্রবাসজীবনে চিঠির আদানপ্রদানই ছিল তাঁর বিরহের শান্তি। তখনকার একটি চিঠি প্রকাশ করে তাঁর আন্তরিক প্রীতির স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের কথা জানিয়েছেন। 'ভারতী' সম্পাদিকার কাছে ভয়ে ভয়ে স্বরচিত কবিতা প্রেরণের কথা গিরীন্দ্রমোহিনী মিলনকথায় লিপিবন্ধ করেন। তাঁর ভয় তো দূরে গেলই বরং সম্পাদকীয় পত্রে উৎসাহ পেয়ে নবীনা লেখিকার মনপ্রাণ ভরে ওঠে। কবিতা লেখার সংকোচ, বাধাও দূরীভূত হল।

শুধু স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে নয়, ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহলেই তিনি 'মিলন' নামে অভিনন্দিতা। এই গুণী, সরল, কোমল-স্বভাবা মহিলাকে যে অনেকেই হৃদয়ের সঙ্গে নিয়েছিলেন, জ্ঞানদা দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনেই তার পরিচিতি মেলে। জ্ঞানদা দেবীর চরিত্র মাধুর্যও অতুল্য। ভারতের প্রথম আই. সি. এস. শুধু নন, রূপে, গুণে, সে যুগের অগ্রগমনে এক অসাধারণ পুরুষের স্ত্রী হয়েও নিরহঙ্কার, নিরভিমান জ্ঞানদাদেবী প্রকৃত সার্থকনামা ছিলেন। নারী প্রগতির মূলে জ্ঞানদা-দেবীর দান নারীজগতে অবিস্মরণীয়। জীবনের সকল সাধনায় তিনি ছিলেন অক্লান্ত-সাধিকা। নবযুগ রচনায় ঠাকুরবাড়ির ভূমিকা সম্বন্ধে যেমন ছিলেন তিনি সচেতন, সেই সাধনায় অবিচ্ছিন্ন যোগে ছিলেন জাগ্রত দৃষ্টি, নিরলস ও কর্মোদ্যোগী। যে কোন সমুন্নতির পথে তাঁর প্রচেষ্টা চিরক্রিয়াশীল। ঠাকুর-বাড়ির বালক-বালিকার সাহিত্য প্রয়াসকে সার্থক করে তোলার উদ্দেশ্যে তাঁর 'বালক' পত্রিকার জন্ম। স্বর্ণকুমারীর 'সখিসমিতি' ও অন্যান্য কর্মপ্রচেষ্টায় তাঁর আন্তরিক যোগ ছিল। পরে 'ভারতী' ও 'বালক' এক হয়ে 'ভারতী ও বালক' নামে কিছুকাল প্রকাশিত হল। আবার 'ভারতী'র একক আবির্ভাব। আপন অঙ্গনে

একজন সাহিত্য-সাধিকার আগমনকে সেদিন অন্তরের অনুরাগে অভিনন্দিত করে নবাগতাকে আনন্দ-বিস্ময়ে ধন্য করেছিলেন। অন্তঃপুরচারিণী গিরীন্দ্রমোহিনী সখিসদনে এমন সানন্দ অভ্যর্থনায় অভিভূত। মেজ-বৌঠানের সহৃদয়তাকে কৃতজ্ঞতায় স্মরণ বহু উচ্ছ্বাসেও যেন অফুরাণ। গিরীন্দ্রমোহিনী এই মহীয়সী মহিলার গুণের বর্ণনায় বারবার মুখর হয়েছেন। তাঁর দুঃখভরা পথচারণে বহু সংশয়, বহু দ্বিধা ঠাকুরবাড়ির কন্যা ও বধূর প্রীতিস্পর্শে স্বচ্ছন্দমুক্ত হয়েছে। 'মিলন-কথা'র সরল ভাষণে এই দুজনকেই উজ্জ্বল মহিমায় প্রকাশ করেছেন। বহু ঘটনার উল্লেখে জ্ঞানদা দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতার অকুণ্ঠ প্রকাশ,

"শিক্ষাকে সম্পূর্ণতর করিবার দিকে তাঁহার যে আগ্রহ দেখিয়াছি তাহাতে তাঁহার নিকট আমি ঋণী ও তাঁহার জ্ঞানদা নামের সার্থকতারও পরিচয় পাইয়াছি। আমার চিত্রকলানুরাগ বৃদ্ধির মূলেও তিনি। অপরাধের মধ্যে গড়ার উপর সেক্সপীয়রের একখানি ও রবির একখানি ছবি বুনিয়া যথাক্রমে তাঁহাকে ও রবির স্ত্রীকে উপহার দিই। পশমে তোলার হিসাবে উক্ত চিত্রিত ব্যক্তিগত সৌসাদৃশ্য নাকি একটু বিশিষ্টভাবেই ধরা দিয়াছিল; এই উপলক্ষ্যে মেজ-বধূঠাকুরাণীর উৎসাহ আবার নূতন করিয়া তাঁহাকে পাইয়া বসিল এবং সে উৎসাহ সংক্রামক হইয়া আমাকেও আক্রমণ করে। মেজ-বধূঠাকুরাণী রহস্যেও অতুলনীয়া; আমাকে শুনাইবার জন্য আজিকার স্যার রবীন্দ্রনাথকে তিনি যে একদিন একটি পয়সা পেলা দিয়াছিলেন, তাহাও এই মধুর স্মৃতি হিসাবে টোকা আছে।"

বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ, জ্ঞানদা দেবীর ঘরোয়া জীবনের আন্তরিক ছবিগুলি গিরীন্দ্রমোহিনীর বর্ণনার ঋজুভঙ্গিমায় অপূর্ব মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সখীর ছোটভাই সেই হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও যে একটি সহজ, সরল যোগ ছিল—সে কথার আভাস পাওয়া যায় 'মিলনকথা'র স্মৃতিচারণে।

ঠাকুরবাড়ি ও দত্তবাড়ির (অক্রূর দত্ত) আবহাওয়া, শিক্ষা, সংস্কৃতির পার্থক্য 'আসমান-জমিন ফারাক'। এখানকার প্রাণখোলা আরামের সঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনীর চলা-বলা নিশ্চয়ই দ্বিধাজড়িত হয়েছে। জ্ঞানদা দেবীর প্রসঙ্গে তাঁর উক্তিতে সেই আভাস—

"আমার তখনকার সঙ্কোচপূর্ণ ও অবরোধ-শাসিত সংকীর্ণ ব্যবহারে হয়ত কতদিন তাঁহার মনে অন্যায় ব্যথা দিয়াছি। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠা স্নেহময়ী ভগ্নীর মত তাহা সহ্য করিয়াছেন। ইঁহার প্রসঙ্গে লিখিত আমার কবিতাও আছে।" কোন্ কবিতাটি সে সম্বন্ধে কবির স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে 'আভাষ'-এর 'সুন্দরী' কবিতাটি হতে পারে। পরবর্তী কবিতা দুটি 'কেন' ও 'সরলা' স্বর্ণকুমারীর কন্যাদ্বয়ের উদ্দেশে রচিত।

কার্যক্ষমতা ও যোগ্যতায় যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে কন্যাদ্বয়ের হাতে 'ভারতী'র সম্পাদনার ভার দিয়াছিলেন, সেই একই কারণে প্রকাশচন্দ্রের হাতেও 'ভারতী'র

সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর ভীতিতেও তাঁর বিশ্বাসের নড়চড় হয়নি। গিরীন্দ্রমোহিনীর লেখাতেই সে কথার উল্লেখ আছে, "আমার পুত্র শ্রীমান প্রকাশচন্দ্রের বাঙ্গলা সাহিত্যে হাতে খড়িও তাহার 'মিলনমা'র প্রদত্ত এবং 'ভারতী'র পত্রেই তিনি প্রথম মক্স করিতে শিখেন। এখন ইংরাজী বাঙ্গলা পত্রিকাদি সম্পাদন কার্যে সিদ্ধহস্ত; কিন্তু সম্পাদকীয় কর্তব্যের গুরুত্ব ও দায়িত্বে মিলনই তাকে প্রথম দীক্ষিত করেন। পাহাড়ে, যাইবার সময় একবার ভারতীর সমস্ত ভার আমার বারণ সত্ত্বেও তিনি উহার হাতে দিয়া যান। প্রকাশের বয়স তখন বিংশতি বর্ষ মাত্র। ভারতী সম্পাদিকার গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা আশ্চর্য এবং এ বিষয়ে তাঁহার ভরসা ও আত্মবিশ্বাস দুঃসাহসিক রকমের হইলেও তাঁহাকে কখনও নৈরাশ্য ভোগ করিতে দেখি নাই।"

গিরীন্দ্রমোহিনীর এই লেখায় স্বর্ণকুমারী সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক অন্তরঙ্গ বিষয় জানা যায়। এরপরে যে ঘটনাটির উল্লেখ করেন, সেটি যথেষ্ট চাঞ্চল্যপূর্ণ।

"সেও আজ অনেকদিনের কথা। আমার স্বামী তখন স্বর্গীয়। আমার মনে আছে, কি এক প্রসঙ্গে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা 'ভারতী' সম্পাদিকাকে কুৎসিত ভাষায় গালি দেন। উক্ত লেখার প্রতি আমি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের[১] দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বঙ্গবাসীকে পুনঃপুনঃ সেই অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের সুনিপুণ লেখনীর তাড়না ভোগ করিতে হইয়াছিল। সে লেখার মধ্যে 'ভারতী'-সম্পাদিকার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার যে নিদর্শন বিদ্যমান তাহা ভুল করিবার নহে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গারোহণ করিলে রেইসের সম্পাদকীয় ভার আমার ভাসুর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের হাতে পড়ে। 'মিলনে'র 'ভারতী' ত্যাগ উপলক্ষ্যে 'রেইসে' (১৫ই মে, ১৯১৫) সে প্রবন্ধ বাহির হয়। বাহুল্য ভয় সত্ত্বেও তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

A Journalistic Retirement—

The retirement of Mrs. Ghosal better known by her maiden name of Shrimati Swarna Kumari Devi, from the editorship of Bharati is a distinct loss to vernacular journalism. With the traditions of a cultured family and of varied culture and accomplishment herself she was eminently fitted by her training, temper and acquirements to hold the post she has hitherto so nobly filled. Besides editing the journal which was started in her father's family with her eldest brother as the first editor, she has contributed largely to Bengali literature; and those contributions of no means order, have considerably helped

১। 'রেইস এণ্ড রায়েৎ' পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি তখন দত্ত পরিবারের বৈঠকখানা বাড়ীতে থাকতেন।

to enrich the language. And she has made the BHARATI what it is on this its fortieth year. How far she has succeeded in gaining one of her objects, namely, the moulding of men of letters it is, no she herself observes, for posterity to say. In the domain of letters many owe her allegiance, and those that do, know it is a pleasure to do so, and proud of it. Her encouragement, though lost on many has been cosmic generally and has made many young men take to literature as a profession and some of them successfully. The present editor of the BHARATI to whom she makes over-charge may be cited as an instance. The editor shares with a friend the burden of responsibility.···

Her is an appreciation of her by a young graduate admirer which has come to our hands and which we publish with pleasure. The verses are the maiden attempt of the young writer and are therefore the more deserving of encouragement.

পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতি—

কেন ভাব সাঙ্গ দেবি, জীবনের কাজ ?
কেন বৃথা ত্বরা এত ? রয়েছে তো বেলা।
এখনো রয়েছে বহু যাত্রী হতে পার ;—
কিসে হবে বিনা তব ভারতীর ভেলা ?
এখনো নীবার পড়ে যজ্ঞভূমি পরে ;
এখনো জ্বলিছে হের বহ্নি সুমঙ্গল,
কে বল তোমার হোত্রী মাতঃ আর
রাখিতে সে পুণ্য-বহ্নি চির-সমুজ্জ্বল !

বিদায়ের কালে দেবি, নমি শতবার।
মাঝে মাঝে দিবে দেখা সেই আশা চিতে
নাশিয়া তমসা জাল বঙ্গের অঙ্গনে,
করিও প্রদীপ্ত তুমি মেঘান্তর হতে।

সাবিত্রী লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করে দত্ত পরিবার ও ঠাকুর পরিবারে একটা হৃদ্যতার স্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এ বিষয়ে গিরীন্দ্রমোহিনী সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে গছেন।

"সুবিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক গোবিন্দলাল দত্তের হিত ঠাকুর পরিবারের অনেকের আলাপ ছিল এবং শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের সহিত

সৌহার্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সাবিত্রী লাইব্রেরির বিভিন্ন বাৎসরিক অধিবেশনে, মনে পড়ে, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা' ও রবীন্দ্রের 'অকাল কুষ্মাণ্ড' প্রভৃতি রচনা পঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন জোড়াসাঁকোর মেয়ে পরিবারের সহিত আমাদের মেয়ে পরিবারের পরিচয় ছিল না। গোবিন্দলাল অবরোধের মধ্যে শাস্ত্রসম্মত স্ত্রীশিক্ষার পাণ্ডা ছিলেন এবং সাবিত্রী লাইব্রেরীকে উপলক্ষ্য করিয়া, নারী রচনা পুরস্কৃত করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। কঠোর রক্ষণশীল দলের "সেনানায়ক" উপাধি ও তদুপযোগী শিরোপা আমি তাঁহাকে অনেকদিন পূর্বেই প্রদান করিয়াছিলাম এবং কোনদিন ভাবি নাই অবরোধের বাহিরে তিনি গুণের আদর্শ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হইতেছে যে আমার সহিত ভারতী সম্পাদিকার আলাপের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দলাল ক্রমে তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া উঠেন এবং আমাদের এই মিলনযজ্ঞের অন্যতম উত্তর সাধক ছিলেন।

ভারতী সম্পাদিকার প্রতি আমাদের বৃহৎ পরিবারের পারিপার্শ্বিক সাহিত্য-অনুরাগী বন্ধুবৃন্দের এই যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, বলা বাহুল্য তাহা তাঁহার সহিত আমার এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়েরই ফল।

তাই আজ 'ভারতী' সম্পাদিকার অসাধারণ ও অক্লান্ত অধ্যবসায়কে অভিবাদন করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।"

গিরীন্দ্রমোহিনীর গদ্য রচনার আরেকটি দৃষ্টান্ত 'সাহিত্যে'র (১২৯৮) পাতাতে ধৃত আছে। এটি তাঁর সমালোচনা সাহিত্য। সাহিত্য জীবনের আদি-পর্বের রচনা এটি। 'অশ্রুকণা' পার হয়ে 'আভাষ'-এর স্তরে কাব্য রচনায় অশ্রু-ক্ষরণের কাল তখনও অতিক্রান্ত হয়নি। ইতিমধ্যে ঠাকুরবাড়ির মৈত্রীবন্ধনে বাঁধা পড়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটকের সমালোচনায় হঠাৎ মেতেছিলেন কেন বোঝা যায় না। কাব্যেই তাঁর হৃদয়গত স্ফূর্তির বিকাশ, সেখানেই আন্তরিকভাবের অন্তরঙ্গ প্রকাশ। মাঝে মাঝে অন্য বিষয়ে রচনা করে সাহিত্যের অপর শাখাতে নিজের শক্তি পরীক্ষাই যেন করেছেন গিরীন্দ্রমোহিনী; একটার পরই তিনি থেমে গেছেন। নাট্যকাব্য রচনার বেলায় যেমন, সমালোচনাতেও তেমনি একটাতেই তাঁর আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তখনও বিশ্ববরেণ্য হন নি, দেশের মধ্যেও সকলের কাছে স্বীকৃতি পাননি। 'সোনার তরী'র যুগ তখন, যে 'সোনার তরী'র কবিতা পাঠে গিরীন্দ্র-মোহিনীর সুরে বাঁধা কবিহৃদয়ের সপ্তবীণায় সুরের ঝংকার উচ্চগ্রামে বেজে উঠেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের রোমান্টিক ভাবনা অনেকেরই সাহিত্যচিন্তায় শান্তি নষ্ট করেছিল। তাঁরা উঠে পড়ে লেগেছিলেন ধিক্কারে, তীব্র নিন্দায় এই কাব্য-রচকের সকল প্রচেষ্টায় কুঠারাঘাত করতে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছেন, যা লিখেছেন কবি তারই কঠোর সমালোচনায়—কিন্তু নবীন তাপসের তপশ্চারণায়,—

মূল সাধনায় বিন্দুমাত্রও চিড় ধরাতে পারেননি। 'সাহিত্য' যেন তখন রবীন্দ্র-বিরোধী কার্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। গিরীন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে 'সাহিত্যে'র তখন গভীর যোগাযোগ। তাঁর কবিতাপুঞ্জ 'সাহিত্যে'র পাতায় প্রকাশিত হচ্ছে। 'সন্ন্যাসিনী', 'সিন্ধুগাথা' পুস্তিকাগুলি 'সাহিত্যে'র তদানীন্তন সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্বয়ং সম্পাদনার ভার নিয়ে প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রতিটি রচনায় কশাঘাত চলছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অকরুণ মনোভাবে ব্যথিত হৃদয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর সমালোচনায় রত হওয়া কিছু আশ্চর্যের নয়। 'মানসী' পাঠে তাঁর অন্তর-জগতে যে আনন্দ-বেদনার বিপ্লব ঘটেছিল তারই বর্ণনায় 'মানসী'র সমালোচনা।

অবশ্য তাঁর সঙ্গে একমত না হয়েও সম্পাদক লেখাটি অগ্রাহ্য করেননি। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য,—

"কোনও সম্ভ্রান্ত মহিলা এই সমালোচনাটি পাঠাইয়া দেন। তাঁহার মতের সহিত আমাদের মতের মিল না থাকিলেও প্রবন্ধটি সাদরে মুদ্রিত হইল।"

গিরীন্দ্রমোহিনীর সাহিত্য রচনার মূল প্রেরণা তাঁর নিজস্ব রসবোধ। কোন নিয়ম, নীতির কঠিন শাসনে তা সীমাবদ্ধ হয়নি। কাব্য রচনায় যেমন ছিল অন্তর প্রেরণা, অন্যান্য রচনাতেও নিজস্ব রীতিতে তার গতি নির্দিষ্ট হয়েছে। কবিতার সংজ্ঞাতেও তিনি স্বীয় মতেরই প্রকাশ করেছেন। "কবিতা মানবহৃদয়োত্থিত অনন্তকালের দুঃখসঙ্গীত। সুখের উচ্ছ্বাস তাহাতে বিপুল প্রাণের দীপ্তি বিভাসিত, যে সঙ্গীত, যে সত্য, আত্মার এক দেহ হইতে অন্য দেহে, এক হৃদয় হইতে অসীম কাল শত সহস্র হৃদয়ে বিচরণ করে, তাহাই কবিতা; একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যথা,—

'আমি কে তা জানলেম না
আমি আমি করি কিন্তু আমি আমার ঠিক হ'ল না।'

ইহাতে শব্দ-বিন্যাসের ঘটা নাই, ইহা মধুর পদগ্রথিত নহে, ইহাতে ভাষার জটিলতা নাই, কিন্তু অতলস্পর্শতা আছে, অনন্তগগনবিহারী বিহঙ্গের মত পক্ষত্ব আছে। আমার বোধহয়, একথা জীবনের মধ্যে ভাবুক মাত্রেরই বারবার না একবার সকলের মনেই হইয়া থাকে এবং মানব মাত্রেরই মনে চিরকাল হইবে। ইহাই কবিতা, ইহাই মানবের জীবনসঙ্গীত। ইহাতে এমন কেহ মনে না করেন যে, আমরা বলিতেছি, গ্রাম্য-কথাতেই মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইবে বা মধুরতার আবশ্যক নাই।"

সেদিন যেমন 'সাহিত্যে-র বিধায়কদের এই সমালোচনায় অন্তরের সায় ছিল না, আজও হয়তো সমালোচনার মানদণ্ডে এ পাশমার্ক পাবে কিনা সন্দেহ, তবুও গিরীন্দ্রমোহিনীর অন্তরের ভাবতরঙ্গের এমন সহজ, অনাড়ম্বর প্রকাশনায় একটা সরল সত্যের স্বচ্ছ প্রকাশ আছে, যাকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। যে কাব্যবাণী তাঁর দুঃখ-জর্জর প্রাণে অনুভবের স্পর্শ দিতে পেরেছিল, ভাবনা-সক্ষম

অন্য হৃদয়ে আজো তা তরঙ্গ তুলতে পারে। বিচারকের দৃষ্টি দিয়ে কাব্য পাঠ চলে না ; সম-হৃদয়ের ভাবনাই কাব্য-পাঠের মূল উদ্দেশ্য। সেদিক দিয়ে গিরীন্দ্র-মোহিনীর কথাগুলির প্রথাগত মূল্যের চাইতেও বেশী একটা দাবী আছে। হৃদয়ের স্পর্শে এর জন্ম বলেই মূল্য।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করতে গিয়ে পূর্বাপর কবিগণের আলোচনা করে নিয়েছেন—শুভকার্যের গোড়াতে পিতৃতর্পণের মত। বলতে গেলে গিরীন্দ্রমোহিনী 'মানসী'র আলোচনা করেছেন হৃদয় দিয়ে। কাজেই এর বিচার যথার্থ হয়েছে। ঠিক সেই সময়ে অনেকের মানদণ্ডেই এতটা আন্তরিকতা ছিল না। তাই রোমান্টিকতা বুঝতে না পেরে কবির ওপরেই তাঁরা খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। কবির হৃদয়কে ভেঙে ফেলতেই তখন তাঁরা বদ্ধপরিকর। গিরীন্দ্রমোহিনীর মূল কথাতেই তাঁর সমালোচনা দেখা যাক।

"ইহাদের পর রবীন্দ্রবাবুর নূতন সৃষ্টি। ইনি বঙ্গসাহিত্যের গলে পারিজাত পুষ্পের হার প্রদান করিয়া, কর্ণে যেন দুইটি সহকার মঞ্জরী পরাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে যেন আধো আলো, আধো ছায়া, আধ স্বর্গ আর আধ মর্ত্ত্য দেখিতেছি। তাঁহার 'মানসী' পাঠ করিতে করিতে চোখের সম্মুখে যেন একখানি রাজ্য ভাসিয়া আসে ; পুস্তক, স্থান, কবিতা সমস্ত ক্ষণেকের জন্য ভাসিয়া যাইতে হয় ; আমরাও যেন 'দীর্ঘ শুভ্র পাখা খুলিয়া' রাজহংসের মত অপার আকাশে ভাসিয়া যাইতেছি, মনে হয়। ইঁহার কবিতার প্রাণ অতৃপ্তি, মানবজীবনও অতৃপ্ত ; তাই বুঝি রবীন্দ্রবাবুর কবিতার সহিত প্রত্যেকের প্রাণের সুর এত মিলিয়া যায়। ইঁহার 'কড়ি ও কোমলে'র 'যোগীয়া', 'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি', 'হায় কোথা যাবে' ইত্যাদি পড়িতে পড়িতে বাষ্পাকুল নেত্রে পুস্তক বন্ধ করিতে হইয়াছে। ইঁহার কতকগুলি কবিতা এমন, যেন সেগুলি মানব-হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। উক্ত কবিতাগুলির গৌরব সমালোচনার বিশ্লেষণে নহে, আমাদের বিশ্বাস উহার গৌরব ভাবুক পাঠকের পুলকিত হৃদয়ে। আমাদের বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা সাধারণ পাঠকবর্গের জন্য নহে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য ; তথায় তাঁহার আসন ও আদর যথোচিত। ইহাতে এমন কেহ মনে না করেন যে, কবির চক্ষু সাধারণের দিকে নাই, কেবল যা কিছু মার্জিত, যা কিছু উচ্চ, যা কিছু সুন্দর তাহারই দিকে ; না, উৎসবের দ্বারে 'কাঙালিনী'ই তাঁহার চোখে পড়ে। তিনি 'বধূ'তে স্বভাব-ললিতা সম্পদাস্বাদনে অনভিজ্ঞা গ্রাম্য বালিকার হৃদয়ভাব, 'গুপ্তপ্রেমে, কুৎসিতার হৃদয় সৌন্দর্য অতি বিশদরূপে আঁকিয়াছেন। কবির 'ব্যক্ত-প্রেম' অবস্থা বিশেষিতা রমণীর মর্ম্মগীতি ; আমরা কবির এই সার্ব্বভৌমিক সহানুভূতি দেখিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত।

বেলা যে পড়ে এল জলকে চল

... ...

শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি। (বধূ, মানসী)

মানসীর মধ্যে যে কবিতাগুলি সর্বোৎকৃষ্ট, আমরা তাহার কেবল নামমাত্র উল্লেখ করিলাম ; 'আত্মসমর্পণ', 'মেঘদূত', 'প্রকৃতির প্রতি', 'সুরদাসের প্রার্থনা', 'কুহুধ্বনি' 'পুরুষের উক্তি', 'নারীর উক্তি', 'বিচ্ছেদের শান্তি', 'সংশয়ের আবেগ', 'মেঘের খেলা', 'পূর্ব্বকালে', 'জীবন মধ্যাহ্ন', 'তবু', 'বিদায়', 'উচ্ছৃঙ্খল' ইত্যাদি। ইহারাই কবির মানসীবালা, অতুলন রূপডালি। 'কুহুধ্বনি' অতীতের স্মৃতি ও বর্তমানের আশা। 'উচ্ছৃঙ্খল' নামক কবিতাটিতে যেন কবির হৃদয় কবিতাকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। এরূপ পূর্ণ কবিতা আমরা আর কোন কবির নিকট হইতে উপহার পাই নাই। রবীন্দ্রবাবুর পরেও অনেক কবি দেখা দিয়াছেন, তন্মধ্যে অক্ষয়কুমারের নাম উল্লেখযোগ্য ; ইঁহার 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি' ও 'ভুল' বঙ্গসাহিত্যের আদরের বস্তু। ফলতঃ রবীন্দ্রবাবুর পরবর্তী কবিরা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে ইঁহার কিরণে ওতপ্রোত। 'মানসী'র মধ্যে যদি সমাজ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি না থাকিত, তাহা হইলে আমরা এ গ্রন্থখানিকে আলোর ঝাড় বলিতাম ; কিন্তু গ্রন্থে উক্ত কবিতাটি থাকায় যেন গোলাপ যূথি মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পগুচ্ছের মধ্যে কয়েকটি গাঁদা সন্নিবেশিত হইয়াছে !"

গিরীন্দ্রমোহিনী কর্তৃক রবীন্দ্রসাহিত্যের দ্বিতীয় সমালোচনা 'রাজা ও রাণী' নাটকখানি। গিরীন্দ্রমোহিনী নিজে কবি ; স্কুল, কলেজের শিক্ষার সংস্পর্শে না এসেও হৃদয়ের স্বাভাবিক আবেগই তিনি তাঁর সাহিত্য রচনা করেছিলেন। নাটকের ধর্ম সম্বন্ধে তিনি হয়তো ততটা সচেতন ছিলেন না। ভাবাবেগ, চরিত্রের সমুন্নতি দেখেই তাঁর কবিহৃদয় অভিভূত। তিনি তাঁর নিজস্ব রীতিতেই নাটকটিরও বিচার করেছেন। সম্পাদক তাঁর লেখাটি ছাপলেও তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতা তখন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে—সাহিত্যের পাতায়। এ কারণেও হয়তো সম্পাদক তাঁকে ক্ষুণ্ণ করতে চাননি।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নাটকটির সমালোচনা করে লিখেছেন, "এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ওই লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ—সেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসংগত। এই নাটকে যথার্থ নাট্য-পরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।"

লিরিকের ভাবোচ্ছ্বাসে যেখানে নাট্যকারের আপত্তি, হৃদয়াবেগের প্রাবল্য সেখানেই সমালোচককে মুগ্ধ করেছে। ইলা এবং কুমারের কাহিনীতেই তিনি মুগ্ধ, প্রশংসায় মুখর। তাঁর নাটকেও এই প্রেমোচ্ছ্বাসের বাহুল্য।

নাটকের বিচারে নাটকীয়তার দিকটা উপেক্ষা করে গেলেও চরিত্র বীক্ষণ ও আলোচনার আন্তরিকতা লক্ষণীয়। 'রাজা ও রাণী' নাটকটি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য, "ক্ষুদ্রে বৃহৎ মুকুর" ; তাতে বিভিন্ন চরিত্রের প্রতিবিম্বন দেখেছেন।

"এই সমস্ত চরিত্রগুলির কেন্দ্রস্থানীয় রাজা বিক্রমদেব, ইহার হৃদয়-বৃন্তের পারিজাত সুমিত্রা। সুমিত্রার সৌরভে সমগ্র কাব্য কানন আমোদিত ; পুস্তক খুলিলে সর্বাগ্রেই সন্ধ্যাতারাবৎ ইহার উজ্জ্বল-মূর্তি পাঠকের চক্ষু আকৃষ্ট করিবে।"

নাটকের চরিত্র আলোচনায় গিরীন্দ্রমোহিনীর পর্যবেক্ষণ যথাযথ হয়েছে। দেবব্রত ও নারায়ণীর চরিত্র যেন শ্বাসরোধ অবস্থার মধ্যে মুক্তির হাওয়া এনেছে। নাটকে ওদের কথাবার্তা, কার্যকলাপ tragic relief এর কাজ করেছে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর মতে "রাজা ও রাণী' ভাবের গাম্ভীর্য ও শব্দমাধুর্যে ও পূর্ণপ্রাণতায় সাহিত্য সংসারে একখানি উচ্চদরের গ্রন্থ।" রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, ভোগসর্বস্ব প্রেম সংসারে নানা অমঙ্গলের সৃষ্টি করে। রাজার প্রেমের প্রগলভতা বাধা পেয়ে প্রতিহিংসায় পরিণত। নিয়তির অমোঘ বিধানের মত এও মর্মান্তিক ট্রাজেডি টেনে এনেছে।

গিরীন্দ্র মোহিনীর সাহিত্যকৃতির পূর্ণ পরিণতি 'জাহ্নবী' পত্রিকার সম্পাদনা। 'জাহ্নবী'র কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে তিনি এই দায়িত্বভার নিয়েছিলেন। ১৩১৩ এর 'জাহ্নবী'র পৌষ সংখ্যাতে জানা যায়, 'জাহ্নবী' যেন কবির প্রতীক্ষায় দিন গুণছিল। "ওয়ালটেয়ারে দীর্ঘ প্রবাসের পর শ্রদ্ধেয়া কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। সিন্ধু তীরবর্তী প্রবাসী কবিকে বহু দিনের পর আবার তার তীরে ফিরিতে দেখিয়া 'জাহ্নবী' তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে।"

দেশের রসিকজনের কাছে গিরীন্দ্রমোহিনীর সাহিত্য সাধনার এ এক পরম স্বীকৃতি। একজন গৃহবধূকে গৃহাভ্যন্তর থেকে ডেকে সাহিত্য সম্পাদনার ভার দেওয়াই, সাহিত্য-সেবীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সাহিত্য পত্রিকা অবশ্য সেদিন নতুন সম্পাদিকার যোগ্যতায় সংশয় মুক্ত হতে পারেননি। 'সাহিত্য' জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ এর মাসিক সাহিত্য সমালোচনাতে সেটা স্পষ্ট।

"জাহ্নবী—বৈশাখ, তৃতীয় বর্ষে 'অশ্রুকণা'র কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 'জাহ্নবী'র সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন। 'জাহ্নবী'র সৌভাগ্য কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের সৌভাগ্য কিনা বলিতে পারি না। সম্পাদকের গুরুভার কবি কল্পনার সখা নহে ; বরং শত্রু। ইতিপূর্বে কবি সম্পাদকের জীবনে তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। প্রুফ, প্রবন্ধ, গ্রাহক ও পাঠকের তাড়ায় 'মানসী' স্বভাবত সংকুচিত হন। তথাপি আশা করি, সর্বান্তঃকরণে কামনা করি 'জাহ্নবী'র পূতধারায় বাঙ্গলা সাহিত্য সরস, উর্বর ও পবিত্র হউক।"

"জাহ্নবী' যে যোগ্যহস্তে সমর্পিত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের রচনা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ পত্রিকাটির সূচিপত্র দেখলেই বোঝা যাবে সম্পাদিকার নৈপুণ্য কতখানি—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—স্বদেশ

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—কিমিয়া (বিজ্ঞান বিষয়ক)

অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—বাঙ্গালা ব্যাকরণের ইতিহাস
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—গঙ্গাবতরণ (কবিতা) ও অন্যান্য
শশধর রায়—উদ্ভিদের দুষ্টামি
অক্ষয় সরকার—গীতায় ভক্তিবাদ
কুমুদরঞ্জন মল্লিক— কবিতা
মোহিতলাল মজুমদার— ,,
মানকুমারী দাসী— ,,
অন্যান্য মহিলা কবি— ,,
অনুপমা দেবী—
দেবেন্দ্রনাথ সেন—কবিতা
শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী—বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণব প্রচারকগণ
সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ—বৌদ্ধযুগের প্রচারকগণ
কালিদাস রায়—কবিতা

'জাহ্নবী' পরিচালনার প্রথম বছরের সম্পাদকীয় বক্তব্য গিরীন্দ্রমোহিনীর অন্তরের ভাবৈশ্বর্যে ও শ্রদ্ধানত চিত্তের বিনীত ভাষণে নম্রসুন্দর এবং যুক্তি ও বুদ্ধিদীপ্ত।

"যাহাদের স্নেহানুরোধ অতিক্রম করা আমার অসাধ্য, তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে নানাকারণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পূত জাহ্নবী বক্ষে এতদিনে আমাকে এইরূপ আত্মপ্রকাশ করিতে হইল। জানিনা, পূততোয়া জাহ্নবী নববর্ষে এ অধমকে কি আশায় গ্রহণ করিতেছেন।

অয়ি নির্ম্মলে, এ দাসী তোমারই মত সাগর সঙ্গমলুব্ধা হইলেও তোমার ওই অপ্রতিহত গতি—ওই প্লাবিনী উচ্ছ্বাস ও তরঙ্গলীলা আমাতে কোথায়? হে দ্রুতগে, তবে আমি তোমার সহিত কেমন করিয়া ছুটিব? অনন্তকাল যে পথে ছুটিতেছে, রবি শশী তারা যে পথে ছুটিতেছে, সেই নির্দ্দিষ্ট কি অনির্দ্দিষ্ট পথে ক্ষুদ্র আমিও ছুটিতে চাই। গঙ্গে তোমার বক্ষে কত আশা ভরা তরণী নিত্য ভাসিয়া যাইতেছে; কেহ জ্ঞানের, কেহ মানের, কেহ ধনের, কেহ ধর্ম্মের, কেহ বা কেবল অধর্ম্মের বাণিজ্য লইয়া উন্মত্ত।

জাহ্নবীর উদ্দেশ্য কি বলিতে হইলে, মোটামুটি সাহিত্যালোচনাই বলিতে হয়। কিন্তু আজিকার দিনে এই নব চক্ষুরুন্মীলিত সুপ্রভাতে সমাজের শিক্ষা দীক্ষা যে নূতন পন্থাবলম্বনে অগ্রসর, তাহা নূতন করিয়া না বলিলেও চলে। এই গড়িয়া তুলিবার দিনে যে একপ্রাণতা, বন্ধন-দৃঢ়তার আবশ্যক, জাহ্নবী তাহারই প্রার্থিনী। মুখ্যতঃ নিষ্পিষ্ট সমাজের আচার ব্যবহারের সংশোধন ও ধর্ম্মালোচনাই জাহ্নবীর জীবনব্রত।

এখন বাংলা সাহিত্যের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া সময়ে সময়ে হৃদয়ে সত্যই নির্মল আনন্দের উদয় হয়। আজ সাহস করিয়া কে বলিতে পারে, আমাদের

মাতৃভাষা-বঙ্গভাষা দীনা? মাসিক, সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক প্রভৃতি যোগ্যতম হস্তে পরিচালিত হইয়া জাতীয় জীবন ও জাতীয় ভাবের উন্নতি সাধন করিতেছে। তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র অন্যতম জাহ্নবীর যদি কিছু গৌরব করিবার থাকে বা হয়, তবে তাহা পূর্ব সম্পাদকের দ্বারাই হইয়াছে ও হইবে; আমি উপলক্ষ মাত্র।'

যে সকল সুলেখক ও লেখিকারা জাহ্নবীকে স্নেহচক্ষে দর্শন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের আনুকূল্যই যে জাহ্নবীর নির্ভর ও গৌরব তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।"

এর সঙ্গে তুলনায় বীরেশ্বর পাঁড়ে সম্পাদিত ১২৯১-৯২ সালে রচিত 'জাহ্নবী'র প্রথম সংখ্যার প্রথমভাগ তুলনা করলে পার্থক্যটা স্পষ্ট প্রতীত হবে। এই পত্রিকাটির ইহবিমুখ ধর্মাশ্রয়ী সূচিপত্রে মূল উদ্দেশ্য মোটামুটি বোঝা যাবে।

আদ্যাশক্তি; আপ্তবাক্; ঈশ্বর ও ধর্ম্ম; ধর্ম্মশাস্ত্রের আবশ্যকতা; নিষ্কাম-ধর্ম্ম; পরকাল ও আপ্তবাক্য; পাতঞ্জল দর্শন; পৌত্তলিক ধর্ম্ম; পৌরাণিক সাকার উপাসনা; মানবের উদ্দেশ্য ও নিষ্কাম ধর্ম্ম; পৌরাণিক সাকার উপাসনা; মানবের উদ্দেশ্য ও নিষ্কাম ধর্ম্ম; যোগ বা নিত্যানন্দলাভের উপায়; বেদ অনাদি কেন?; বেদরহস্য; শরীরের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ; শাস্ত্রআন্দোলন; শিব সংকীর্ত্তন; শ্রীমদ্ভাগবত গীতা; সাধন সঙ্গীত; সুখ দুঃখ ও নিষ্কামধর্ম্ম।

সম্পাদকীয় বক্তব্যে ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণের কারণ সম্পাদক দেখিয়েছেন। উনিশশতকে নতুন যুগের আলোতে যখন নবজাগরণ আরম্ভ হয়েছে, তখন এই ধরণের পত্রিকার নবপ্রকাশন প্রায় অচিন্তনীয়। সূচনায় সম্পাদকের বক্তব্য—

"আজি ঊনবিংশ শতাব্দী। পৃথিবীর আজি উন্নতির দিন। মানব এক্ষণে উন্নত। পশ্চিমভূমির মানবগণের প্রতাপে আজি পৃথিবী কম্পিত। মানব আজি উন্নতি বলে সমস্ত অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছে। আজি মানব সম্পূর্ণ স্বাধীন। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভয়ানক জন্তু সকলও আজি মানবের ক্রীড়াসামগ্রী। জল, বায়ু, অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি দেবগণ আজি মানবের ভৃত্য। এক্ষণে মানব না করিতে পারে, এমন কার্য্যই নাই। মানব এত উন্নত ও এত স্বাধীন যে কোনরকম অধীনতা স্বীকার করিতে চায় না। পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, আচার্য্য, রাজা, ধনী, বলবান কাহারও অধীন হইতে মানব ইচ্ছুক নহে।

পিতা মাতা আপন সুখ সম্ভোগ সাধন জন্য পুত্রোৎপাদন ও স্বাভাবিক স্নেহের বশবর্তী বা ভবিষ্যৎ আশার অধীন হইয়া পুত্রের প্রতিপালন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে কেন? জ্যেষ্ঠভ্রাতা অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়া কি এমন অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন যে তজ্জন্য তাঁহাকে মান্য করার আবশ্যকতা কি? রাজা হয় দস্যু, না হয় সাধারণের ভৃত্য সুতরাং তাঁহার অধীনতা স্বীকার করা কখনই কর্ত্তব্য নয়।

স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই যখন আপনাপন সুখসাধন জন্য মিলিত হইয়াছে, তখন স্ত্রী স্বামীর অথবা স্বামী স্ত্রীর মুখাপেক্ষা বা অধীনতা স্বীকার করিবে কেন? ইত্যাদি বাক্য আজি ঘরে ঘরে আবাল বৃদ্ধ বণিতার মুখে মুখে শুনিতে পাওয়া

যায়। আজি সকলেই সর্বপ্রকার অধীনতা শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আজি মানব মনে স্বাধীনতা স্পৃহা এত বলবতী হইয়াছে যে, ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতেও আজি মানব ইচ্ছুক নহে।

কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই উন্নতির সুবর্ণযুগে মানবের এরূপ দুরবস্থার কারণ কি? একথার উত্তর দিতে হইলে বলিতে হইবে ধর্ম্মভাবের শিথিলতা এবং বাহ্যিক চাকচিক্যময় অন্তঃসারশূন্য পাশ্চাত্য সভ্যতানুকরণপ্রিয়তাই ইহার কারণ।

* * * * *

সর্ব্বথা আজি মানব পশুভাবাপন্ন বা পশু হইতেও নিকৃষ্ট, সুতরাং পতিত। পতিতে উদ্ধার করিবার জন্যই জাহ্নবীর অবতারণা। জাহ্নবী যদি এই পতিত হিন্দুজাতির, এই পাপদগ্ধ ভস্মাবশিষ্ট পদদলিত সগর সন্তানদিগের উদ্ধারসাধন ও আর্য্যকুলের পূর্ব্বগৌরব পুনরানয়ন করিতে পারেন, তবেই ভারতের মঙ্গল ও আমাদের জন্মসার্থক।

১৩১৪ সালে 'জাহ্নবী'তে গিরীন্দ্রমোহিনীর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ১৩১৫ সালে হয়তো সম্পাদনা কাজের গুরুভারে 'নিরুপাধি' নামক কবিতাটি ছাড়া আর কিছু লিখে উঠতে পারেননি। কিন্তু 'জাহ্নবী' যে ক্রমোন্নতির পথে চলেছিল সে যুগের বিখ্যাত লেখকদের রচনাসমৃদ্ধ সূচিপত্রের ওপর চোখ বুলালেই বোঝা যায়।

চন্দ্রনাথ বসু রচিত 'সাবিত্রীতত্ত্ব' গ্রন্থখানির সমালোচনায় সম্পাদিকার গভীর চিন্তন, মনন ও অন্তর্দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সংস্কৃতজ্ঞানের বহু প্রমাণ মিলে তাঁর অজস্র রচনায়। সাবিত্রী পৌরাণিক যুগের আদর্শ রমণী। যুগ যুগ ধরে তিনি রমণীরত্ন হিসেবে অনুকরণীয়। যে শক্তি বলে তিনি মৃতপতির জীবন উদ্ধার করেন, সম্পাদিকা তাকে আধ্যাত্মিক শক্তি বলেছেন। এই শক্তিবলে অসাধ্যসাধন করা যায়।

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে, পুত্রো রক্ষতি স্থবিরে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।"

"সেকালের কন্যাকাগণ যে বর্ত্তমানের তুলনায় অনেকটা স্বাধীন ছিলেন তাহাতে দ্বিরুক্তি নাই। এই শ্রদ্ধেয় নীতিবাক্যের গণ্ডীও, তাঁহারা যে যতবড় তেজস্বিনী হউক না কেন, উলঙ্ঘন করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহারা সকল সময়ে নীতির প্রহরী পরিবেষ্টিত ও ধর্ম্মের কর্ম্মদ্বারা সুরক্ষিত থাকিতেন বলিয়াই কি রণক্ষেত্রে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে, কি সংসারক্ষেত্রে সকলস্থানেই নির্ভীক চিত্তের স্বীয় তেজস্বিতা ও মনস্বিতার পরিচয় দিয়া যাইতে পারিয়াছেন।"

"ইহাই আধ্যাত্মিক শক্তি, বাস্তবিক এ শক্তি অনশনেই পুষ্ট হয়। এইজন্যই যোগবলের প্রধান অবলম্বন উপবাস।" উপসংহারে, এখানে এবিষয়ে লেখক মহাশয়ের মন্তব্য—

"মানুষে কেবল জড়প্রকৃতি নাই। আধ্যাত্মিক প্রকৃতিও আছে। মানুষের এই দুই প্রকৃতির মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা কঠিন। উপবাসে বা অনাহারে সম্বন্ধ দুর্বল হইয়া পড়ে; কাজকর্ম্মে অসমর্থ হয়। কিন্তু অনেক বাঙ্গালী স্ত্রী ধর্ম্মচর্য্যর্থ একাদিক্রমে দুই তিন দিন উপবাস করিয়াও বিশেষ কাতর হন না। ভারত ঋষিতপস্বীরা আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে অদ্বিতীয় ছিলেন। অনশনতত্ত্ব তাঁহারা যেমন বুঝিতেন বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেহ তেমন বুঝেন নাই।"

'জাহ্নবী'র পরিচালনা যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, 'সাহিত্যে'র প্রশংসাসূচক কথাতেই তার স্পষ্টপ্রকাশ—

"আমরা জাহ্নবীর ক্রমোন্নতি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।"

('সাহিত্য'-জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩)

কবি কামিনী রায়

জীবনকথা

রবীন্দ্রযুগে বাস করে, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও যিনি রবীন্দ্র ভাবধারায় নিজেকে ভাসিয়ে দেননি, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিককার নারী কবিশ্রেষ্ঠা কামিনী রায়। তাঁর কর্মজীবনের সাফল্যের পেছনে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা অনিবার্যভাবেই আসে এবং বিচার বিবেচনায় তার মূল্য নেহাৎ তুচ্ছ নয়। পিতা চণ্ডীচরণ সেন সে যুগের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। মাতা যেন এক অগ্নিশুদ্ধা নারী। জীবনের সকল পরীক্ষায় তিনি স্বমহিমায় অনায়াস মুক্তিলাভ করেছেন। ভগ্নী ডাক্তার যামিনী সেনের চরিত্রদীপ্তি, কর্মক্ষমতা, পরহিতব্রত নারীমুক্তির সেই প্রথম যুগে অসাধারণ। কামিনী রায়ের জীবন চর্যাও গুণে, মানে, স্বভাব-সৌন্দর্যে এক রমণীয় দৃষ্টান্ত।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর বাখরগঞ্জ জেলার বাসণ্ডা গ্রামে কামিনী দেবী জন্মগ্রহণ করেন।[১] তিনি চণ্ডীচরণ সেনের প্রথম সন্তান। পিতামহ নিমচাঁদ সেন ও পিতামহী গৌরী দেবী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁদের পুত্র, পৌত্রীর জীবনেও এই ধর্মপ্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে।

কামিনীর চার বছর বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ হয়। বিদ্যা শিক্ষায় হাতে খড়ি মার কাছেই। তাঁর কাছে বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ ও শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ পড়া শেষ হয়। দেড় বছর ক্রমাগত পড়ার ফলে শিশুশিক্ষা তাঁর আদ্যোপান্ত মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

কামিনীর মায়ের অক্ষর শিক্ষাও কম চিত্তাকর্ষক নয়। রান্নাঘরের হেঁসেলে রোজ এক টুকরো কাঠ দিয়ে লেখার অভ্যাস করতেন। সেখানটা কাঁচা মাটির দেয়াল ছিল। লেখা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটি দিয়ে লেপে ফেলতেন, পাছে কারোর চোখে পড়ে। সে যুগে স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শেখাটা গর্হিত ব্যাপার বলে গণ্য হত। লেখাপড়া শিখলে দুর্গতি বাড়বে, গোপন পাপের পথ উন্মুক্ত হবে,—এই ছিল সেকালের ধারণা। তাই মধ্যবিত্ত পরিবারে ছিল বাধা নিষেধের কড়াকড়ি। ধনী পরিবারের নিয়ম অবশ্য স্বতন্ত্র ছিল।

কামিনীর জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা সন্তান পালনের দায়িত্ব সম্বন্ধে স্ত্রীকে একটা পত্র লিখেছিলেন। চিঠিটা নির্দিষ্ট স্থানে না গিয়ে পড়ল, স্থানীয় বিশিষ্ট এক লোকের হাতে। তিনি চিঠিটা পড়ে কামিনীর পিতামহ নিমচাঁদ সেনকে পাঠিয়ে দেন। পুত্রের এই কার্যে তিনি মর্মাহত হলেন, লজ্জা ও সঙ্কোচে কুণ্ঠিত। মাতামহের অবগতির জন্য তাঁকে চিঠিটা পাঠানো হল। তিনিও এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ

১। সাহিত্য সাধক চরিতমালা, পঞ্চম খণ্ড, বঙ্গের মহিলা কবি, যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

হন। এই ছিল সেকালের পল্লীসমাজ। নিমচাঁদ কিন্তু নাতনীকে সযত্নে বহু শ্লোক শিখিয়েছেন। লোকজন এলে কামিনীকে আবৃত্তি করে শোনাতে হত। যাহোক এই মায়ের কাছেই প্রথম পাঠ সমাপ্ত হল। রোজই পুঁথির দপ্তর তুলে রাখবার সময় শিশু কামিনী আবৃত্তি করতেন,

লাগ্ লাগ্ সরস্বতী মোর কণ্ঠে লাগ
যাবজ্জীবন তাবৎ থাক্……।

এরপর আরম্ভ হল বিদ্যালয় জীবন। সেখানে বরাবরই কৃতিত্বের পরিচয়। উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হলেন। পিতার কাছে অংক শিখে এমনই পারদর্শী হয়েছিলেন যে, তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। শিক্ষক শ্যামাচরণবাবু তাঁকে 'লীলাবতী' আখ্যা দিয়েছিলেন। চোদ্দ বছর বয়সে মাইনর পরীক্ষায় কামিনী প্রথম বিভাগে পাশ করলেন। চণ্ডীচরণ সে সময় জলপাইগুড়ির মুন্সেফ ছিলেন। তাঁর পাঠানুরাগ অত্যন্ত গভীর ছিল। তাঁর নিজস্ব একটা লাইব্রেরী ছিল, তাতে ছিল প্রচুর বই। কামিনী মাইনর পরীক্ষার পর অধিকাংশ সময় এই লাইব্রেরীতে কাটাতেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর চিন্তা ও কল্পনার বিকাশ দেখা গিয়েছিল।

আট বছর বয়সে কামিনী প্রথম কবিতা রচনা করেন। কন্যার কৃতিত্বে আনন্দিত পিতা উপহার দিলেন রামায়ণ ও মহাভারত। এই বই দুখানি তাঁর পরবর্তী জীবনে বহু রচনার উৎস জুগিয়েছে। কামিনীর ন বছর বয়সে চণ্ডীচরণ দিনাজপুর জেলার ঠাকুর গাঁ সাবডিভিসনে মুন্সেফ হয়ে যান। সে সময় সেখানে যাওয়া কষ্টকর ছিল বলে স্ত্রী কন্যাকে কেশবচন্দ্র সেনের 'ভারতাশ্রমে'[১] রেখে গিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন একটি 'মহিলা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৭২ খ্রীঃ এম. এ. পাশ করার পর এই মহিলা বিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন।

ভারত আশ্রমে কিছুদিন থাকবার পর কামিনী 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়'[২] এর

বোর্ডার হন। ছ'মাস এখানে থাকার পর পিতার কর্মস্থল মানিকগঞ্জে যান। পরের দেড় বছরের শিক্ষা পিতার কাছেই হয়। প্রতিদিন উপাসনার পর বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের বিশেষ বিশেষ অংশ পড়তে বলতেন। ভাল যা কিছু পড়তেন মেয়েকেও পড়াতেন।

ইংরেজী, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রতিটি বিষয়ে তিনিই মেয়েকে পরিচালনা করতেন। বার বছর বয়সে কামিনীকে আবার বোর্ডিং-এ পাঠানো হল। বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় চণ্ডীচরণ জীবনের একটি মূলমন্ত্র লিখে দিয়েছিলেন। সর্বদা মনে রাখবে, 'my life mission is higher than that of my school companion' (শ্রাদ্ধিকী, পৃঃ ৪০)। ষোল বছর বয়সে বেথুন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা ছিল তাঁর দ্বিতীয় ভাষা।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বঙ্গের মহিলা কবি'তে পাওয়া যায় তিনি F. A. পরীক্ষায় সংস্কৃতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কিন্তু ডঃ ঊষা চক্রবর্তী তাঁর 'Condition of Bengali Women Around the 2nd Half of the 19th Century' বইতে লিখেছেন, "In the F. A. she stood first in Sanskrit and in the B. A. examination she got a 2nd class honours in Sanskrit." বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কামিনী কিছুদিন নীতি বিদ্যালয়ে কাজ করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, "যে নীতি বিদ্যালয়টির সহিত আমার সাক্ষাৎ যোগ ছিল, তাহা ১৮৮৪ সাল হইতে আমাদের উপাসনা মন্দিরে বসিল। ইহার প্রধান উদ্যোগকারিণী ও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, আমাদের কয়েকটি কন্যা। গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের কন্যা সরলা, ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যা লাবণ্যপ্রভা, চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী এবং আমার কন্যা হেমলতা। হেম ইঁহাদের মধ্যে বয়সে সর্বকনিষ্ঠা ছিল। আমি এই নীতি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কর্তা ও উৎসাহ-দাতা ছিলাম। এই কন্যাদের সঙ্গে বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতাম, নীতি বিদ্যা-লয়ের কার্যাদি বিষয়ে পরামর্শ করিতাম, ইঁহাদের সকল কাজে সঙ্গে থাকিতাম।" এ বছরই বেথুন কলেজের লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস্ লিপসোম্বের (Lipsombe) পদত্যাগের পর প্রথম বাঙালী মহিলা গ্র্যাজুয়েট চন্দ্রমুখী বসু ঐ পদ গ্রহণ করেন। কামিনীকেই প্রথমে এ পদের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু তাঁর পিতা স্বীকৃত হননি।[১]

চণ্ডীচরণ সর্বদা দুঃখ করতেন, "বেশীর ভাগ পুরুষেরা আজকাল চাকরী পাইবার আশায় লেখাপড়া শেখে", কাজেই চাকরীর নামে বিরক্ত হয়ে বলেন, "জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এবং জ্ঞানের নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্যই আমি শিক্ষাদান করিয়াছি। চাকরী আমি তাহাকে কখনই করিতে দিবনা।" তখন কয়েকজন বন্ধু

১। কামিনী রায় 'শ্রাদ্ধিকী'তে লিখেছেন, পিতা এ সময়ে পদত্যাগ করার পাছে মেয়ের জীবনে কোন দুঃখ, আঘাত মেয়ের জীবনকে দুর্বহ করে তোলে তাই এই আপত্তি।

একটা সামাজিক সমস্যার চিত্র তাঁর সামনে তুলে ধরলেন। তাঁদের বক্তব্য, সমাজে বহু অনাথা বিড়ম্বিতা ভদ্ররমণী আছেন, যাঁদের জীবনে স্বাবলম্বী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কামিনীদের মত উচ্চশিক্ষিতা মহিলাগণ যদি চাকরী নিয়ে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তাহলে অনেকের পক্ষে পথটা সুগম হয়। কথাগুলি এমনই যুক্তিপূর্ণ যে চণ্ডীচরণ সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলেন ও মেয়ের চাকরির পথে আর কোন বাধা রইল না।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কামিনী সেন বেথুন বিদ্যালয়ে দ্বিতীয়া শিক্ষিকার (2nd mistress) পদে নিযুক্ত হলেন।[১] ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'আলো ও ছায়া'র প্রথম প্রকাশ। এ সময়ে তাঁর বয়স পঁচিশ বছর ; 'আলো ও ছায়া'র অধিকাংশ কবিতাই বহু পূর্বে রচিত। এই কাব্যটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'আলো ও ছায়া'র রচয়িত্রী হিসাবে তিনি বিখ্যাত হয়ে যান। 'সুখ' নামক যে কবিতাটি দীর্ঘ আলোড়ন এনেছিল সেটি ষোল বছর পূর্ণ হবার আগেই লেখা হয়েছিল। পিতা এবং পিতৃবন্ধুর অনুরোধেও তিনি বইটি ছাপতে রাজী হননি। পরে পিতার বন্ধুর[২] চেষ্টায় কবি হেমচন্দ্রের মতামত জানা গেলে 'আলো ও ছায়া' বন্দী দশা থেকে মুক্তি লাভ করল।

কামিনী সেনের সামাজিক অভিজ্ঞতা বলতে গেলে কিছুই ছিল না। মানস গঠনের সমস্ত উপাদান প্রায় গ্রন্থজগৎ থেকেই সঞ্চয় করেছেন। তাঁর চিন্তা ও কল্পনা বিকাশের সহায় হয়েছিল নানাধরণের পুস্তক। ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্যে তাঁর মনোজগৎ গড়ে উঠেছিল। এখান থেকেই তাঁর কাব্য সৃজনের সকল রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। এদিকে লোকের প্রতি গভীর আস্থা এবং সরল বিশ্বাসও ছিল। স্কুলে ছাত্রী অবস্থায় সহপাঠীদের কাছে শুনেছিলেন অল্প বয়সে নবেল পড়া ভাল নয়। গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রচুর অবকাশ থাকা সত্ত্বেও তিনি ইংরাজী নবেল পড়েন নি। মিস লাহিড়ী যখন বলতেন, তিনি নবেলি ছাঁচে নবেলি ভাষায় কথা বলেন, তখন কামিনী মনে মনে আহত হতেন। নবেল পড়া অভ্যাসই ছিল না তখন তাঁর। তিনি তখন প্রায়ই কবিতা লিখতেন। প্রাপ্তবয়স্কা প্রসন্নময়ীর 'কেন মালা গাঁথি' 'কুমারী চিন্তা' কবিতার উত্তরে তিনি লিখলেন 'সঞ্জীবনী মালা'। কবির মন্তব্য, 'প্রসন্নময়ী প্রবীণা বিবাহিতা কুমারীর চিন্তা লিখিলেন, আমি কুমারী হইয়া প্রবীণার মত উত্তর দিলাম। এ এক তামাসা।'

১। *Bethune School & College Centenary Volume*—Page 46. "Miss Chandramukhi Bose became the first principal of the Bethune College. Miss Kamini Sen joined the school as a second mistress, the head mistress being Miss Radharani Lahiri."

২। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছেন এই পিতৃবন্ধু—দুর্গামোহন দাশ। দুর্গামোহন ও হেমচন্দ্র উভয়েই তখন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল। 'বৃত্রসংহারে'র কবি হেমচন্দ্র তখন বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্যতম দিকপাল বলিয়া পরিচিত ও স্বীকৃত। —ভারতবর্ষ, কার্তিক, ১৩৪০

১৮৮৪ খ্রীঃ থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয়া শিক্ষিকা রূপে কাজ করেন। ১৮৯১ থেকে তৃতীয়া অধ্যাপিকা রূপে কলেজের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।[১]

বেথুন কলেজে বি. এ. ক্লাশের ছাত্রী থাকাকালীন কামিনী সেনের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইলবার্ট বিল (১৮৮৩) নিয়ে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কারাবরণ করেন। কামিনী সেন বেথুনের ছাত্রীদের নেতৃস্থানীয় হয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি মিটিং হয়েছিল। স্কুল ও কলেজের মেয়েদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান সম্ভবত এই প্রথম।[২]

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বেথুন কলেজের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এর পরেই কামিনী সেনের জীবনের মোড় ঘুরে যায়।

১৮৯৪ খ্রীঃ স্ট্যাটুটরী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে কামিনীর বিবাহ হয়। বিয়ের অনেক আগেই কামিনীর গুণগ্রাহী ছিলেন তিনি। 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হবার পর তিনি ইংরাজীতে বইটির দীর্ঘ সমালোচনা করেছিলেন।[৩]

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর কয়েকটি সন্তান নিয়ে কেদারনাথ খুব অসুবিধায় পড়েন। কামিনী রায়কে জীবনসঙ্গিনী রূপে পেয়ে সাংসারিক ঝঞ্ঝাট থেকে নিষ্কৃতি পান। কিন্তু 'আলো ও ছায়া'র প্রকাশনে কামিনী সেন তখন সাহিত্যে রীতিমত বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সেই সময় কেদার রায়ের সঙ্গে বিবাহে সাতটি সন্তানের ভার গ্রহণ করে তিনি যথেষ্ট ঔদার্যের পরিচয় দেন। তবে 'শ্রাদ্ধিকী' থেকে জানা যায় কেদারনাথের চরিত্রের তুলনা ছিল না।

কামিনী রায়ের জীবনে কিছু করুণ ইতিহাস আছে। মৈত্রেয়ী দেবীর 'ন হন্যতে' থেকে কিছু অংশ তুলে ধরলে এবিষয়ে স্পষ্ট হবে। শ্রদ্ধেয়া কামিনী রায়ের তখন কবিখ্যাতি দেশজোড়া—তাছাড়া আরো একটা কারণে আমরা মেয়েরা তাঁর প্রতি সমবেদনা অনুভব করতাম। আমরা শুনতাম জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি ভালবাসতেন, জগদীশচন্দ্রও বাসতেন।

এদের বিবাহ ঠিক ছিল, হল না। শোনা যায়, এ বিবাহের ফলশ্রুতি 'আলো ও ছায়া' কবিতার বই। আর পি, সি, রায় চিরকুমার হয়ে রইলেন যাঁকে ভালবেসে, তিনিও এই কামিনী রায়।"[৪]

তবে কেদারনাথের সঙ্গে বিবাহে তাঁর জীবনে যে পরিপূর্ণতা এসেছিল, সে কথা তাঁর জীবন পর্যালোচনেই জানা যায়। কেদারনাথের অনেক সন্তান হয়ে

গেলেও কামিনী রায়ের সঙ্গে তাঁর বয়সের ব্যবধান ন বছরের। খুব অল্প বয়সে কেদারনাথের বিবাহ হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে বিবাহের পর একমাত্র 'গুঞ্জন' ছাড়া দীর্ঘকাল কামিনী রায়ের কোন রচনা প্রকাশিত হয় নাই। এবিষয়ে কোন বন্ধুর অনুযোগে শিশু সন্তানদের দেখিয়ে উত্তর করেছিলেন, 'এরাই আমাদের কবিতা'। একথাতেই তাঁর চিত্তের প্রসন্নতা অনুমেয়। আর গুঞ্জন তো বালগোপালদের গুঞ্জন—শিশুস্বর্গ। মা ও শিশুর পরস্পর বন্ধন স্বর্গীয় সুষমায় ভরপুর।

কিন্তু এই সুখস্বর্গ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই একের পর এক দুর্যোগ তাঁর মাথায় নেমে আসতে থাকে। তারপর আজীবন শোকের আঘাত। মৃত্যুর নিষ্ঠুর পীড়ন বারবার তাঁর জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ডিপ্‌থিরিয়ায় শিশু সন্তানের মৃত্যুতে শুরু হল শোকের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ঘোড়ার গাড়ী উল্টে কেদারনাথ গুরুতরভাবে আহত হন। এই আঘাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। কামিনী রায়ের জীবনে চরম বিপর্যয় এলো। এই শোক সামলে উঠতে না উঠতে আবার পুত্রশোক। চার বৎসর পর কিশোর পুত্র অশোককে হারাতে হল। মৃত্যুর বিচ্ছেদ সবসময় দুঃখের কিন্তু তা যখন শোচনীয়-ভাবে আসে, তার জ্বালা দুঃসহ। কামিনী রায় তাঁর ভগ্নী যামিনী সেনের স্মৃতিচারণে অসংখ্য চিত্রের মধ্যে পুত্র অশোকের করুণ মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন।

যামিনী সেন অবিবাহিতা ছিলেন। একটি নেপালী শিশুকে তিনি সন্তানের মত গ্রহণ করেছিলেন। বিলাতে থাকাকালে এই শিশুটির মৃত্যুসংবাদে তিনি প্রচণ্ড আঘাত পান। এরপরেই ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দেশে ফিরে আসেন। কলকাতার কিছুদিন থাকার পর হাজারিবাগে কামিনী রায়ের কাছে গেলেন। এ সময়ে একদিন অশোকের তীব্র পেটব্যথা হয়। এপেণ্ডিসাইটিস বলে যামিনী অভিমত প্রকাশ করেন। সাহেব ডাক্তার ডাকা হলে তিনি কোন গুরুত্বই দিলেন না। ভবিষ্যতে ব্যথা হলে ক্লোরোফর্ম করা যাবে বলে চলে গেলেন। দ্বিতীয়বার যখন ব্যথা হল, তখন যামিনী কলকাতায়। সেই সার্জেন ডাক্তারকে পাওয়া না যাওয়াতে অগত্যা Miss Omeara M.D. এবং Miss Eva Jullet M. D. কে ডাকা হল। তাঁরা এসে সঙ্গে সঙ্গে অপারেশনের কথা বললেন। খবর পাওয়া মাত্র যামিনী কলকাতা থেকে সার্জেন নিয়ে হাজারিবাগে চলে গেলেন। সার্জেন গিয়েই অপারেশন করলেন, কিন্তু রায় দিলেন, 'It was too late'। ফলে বালককে যে সীমাহীন কষ্টভোগ করতে হল তা বর্ণনাতীত। কাটা জায়গা সেলাই পর্যন্ত করা গেল না। দু রাত, একদিন অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করে অশোক অসহ্য কষ্টভোগ দুঃখ কষ্টের অতীতলোকে চলে গেল। "যামিনী অশোকের শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধবাসরে যে 'অশোকস্মৃতি' পঠিত হয় তাহা তাঁহারি রচনা।"[১]

১। বঙ্গলক্ষ্মী, আষাঢ়, ১৩৩৯, পৃঃ ৫৪২

আর কামিনী রায় নিরুপায় বেদনায় পুত্রের কষ্ট দেখেছেন। শেষের রাত্রে অশোক মায়ের কোলে মাথা রেখে হয়তো একটু আরামই পেতে চেয়েছিল। পাছে ব্যথা লাগে এই ভয়ে মা ছেলের অন্তিম আকাঙ্ক্ষা রাখতে সাহস পাননি। অভিমানী পুত্র দ্বিতীয়বার অনুরোধ করেনি।[১] পুত্রের শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রইল, এই দুঃখ মায়ের হৃদয় তিলে তিলে দগ্ধ করেছে। 'অশোক সঙ্গীত'-এর ছত্রে ছত্রে মাতৃহৃদয়ের বেদনা কাব্যটিকে অশ্রুভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

অশোকের মৃত্যু তাঁর অন্তরকে শতধা করেছে বজ্রদণ্ডের মত। গভীর ব্যথায় সৃষ্টির উৎসমুখ থেকে কবিতার বহুধারা সঞ্চারিত হল। মাতৃহৃদয়ের বেদনাসঞ্জাত এক একটি সনেট দিয়ে সৃজিত 'অশোক সঙ্গীত' (১৯১৪)। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ছ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতে কন্যা লীলাকে হারাতে হল। কবি কামিনী অন্তরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে সাহিত্যসৃজনে মন দিলেন। সৃষ্টির আনন্দে জগতের বহু দুঃখকে অতিক্রম করা যায়। আঘাতে, বেদনায় 'আলো ও ছায়া'র কবি আবার নতুন করে জেগে উঠলেন।

'শ্রাদ্ধিকী' (১৯১৩) শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত প্রিয়জনের স্মৃতির একটি গুচ্ছ। লোকান্তরিত স্বজনের গুণগানে কীর্ত্তিত খণ্ডখণ্ড জীবনচিত্র। এতে আছে পিতা চণ্ডীচরণ সেন, ভ্রাতা যতীন্দ্রমোহন সেন, স্বামী কেদারনাথ ও তাঁর কন্যা সরযূবালা ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা। চণ্ডীচরণ ও কেদারনাথ দুজনেই দারিদ্র্যের জর্জর বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে আপন কৃতিত্বে সমাজের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উভয়েই ছিলেন স্বাধীনচেতা তেজস্বী পুরুষ। ধর্মসংস্কার, সমাজ সংস্কার, রাজনীতি সংস্কার সকল বিষয়েই চণ্ডীচরণের ছিল প্রখর দৃষ্টি, কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে সংকুচিত হতেন না।

সরযূবালা ছিলেন কেদারনাথের প্রথমা স্ত্রীর সন্তান। মাতৃহারা ভাইবোনদের জন্য সরযূবালার যে কী অকৃত্রিম স্নেহ ছিল, তা এই স্বল্পায়ত স্মৃতিকথায় জানা যায়। সরযূবালার চরিত্র মাধুর্য অতুলনীয় ছিল, লেখিকার অন্তরের প্রীতি ও ঔদার্যগুণে সেই বর্ণনা অপরূপ মাধুরী ধরেছে।

ভ্রাতা যতীন্দ্র মোহনের কয়েক বছর আগে (১৯০৩) ভগ্নী প্রেমকুসুমকেও হারাতে হয়েছে। 'ঝরাফুলে' তাঁর উদ্দেশে রচিত সনেট আছে।[২]

দীর্ঘশ্বাসে ভরা 'শ্রাদ্ধিকী'র কয়েকবছর আগেকার লেখা 'গুঞ্জনে' (১৯০৫) শিশু কাকলীতে পূর্ণ সুখনীড়ে মাতৃহৃদয়ের পরিচয় মেলে। তাঁর ছোট্ট বুলবুলকে ঘিরে স্নেহ যেন অঝোর ধারায় ঝরেছে। বনের বুলবুল, আর ঘরের বুলবুলকে নিয়ে কবিতা রচিত হয়েছে। কবিতাটি তৃপ্ত মাতৃহৃদয়ের একটি ছবি।

১। অশোক সঙ্গীত—সনেট (২৮)
২। লোকান্তরিতা সোদরার প্রতি (১, ২)—'ঝরাফুল'

এক বুলবুল বনে থাকে উড়ুক ফুড়ুক
আর বুলবুল কোলে কোলে হাসিভরা মুখ ;
হোথায় দেখ মাথার ঝুঁটি বুকের তলে লাল
হেথায় দেখ কালা চুল, রাঙ্গা ঠোট গাল।
*   *   *   *
সবটুকু দেখে দেখে ভরি রাখি প্রাণে
এ শোভা যে না দেখেছে সে কি সুখ জানে।

(ঘরের বুলবুল, 'গুঞ্জন')

কিন্তু এ সুখ ভাগ্যে দীর্ঘস্থায়ী হল না। 'গুঞ্জনে'র শেষের পাতাগুলি বিচ্ছেদের বেদনায় ভাবাতুর।

বুকে করে রাখ স্মৃতিটুকু তার,
সুখে দুঃখে রোগে শোকে
আশা করে থাক হয়তো আবার
দেখা হবে অন্য লোকে।

(তাহার কল্যাণ হোক, 'গুঞ্জন')

মৃত্যু যেন তার পায়ে পায়ে ফিরছে ; নিষ্ঠুর থাবায় স্নেহনিধিদের কেড়ে নিয়েছে। অশ্রুতর্পণে শোকগাথা রচনা করে, আবার বৃহত্তর জীবন সাধনায় মগ্ন হওয়া ছাড়া দুঃখজয়ের পথ ছিল না। ছেলেবেলা থেকে কর্ম ও কর্তব্য পালনই ছিল তাঁর জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য। Life has a mission পিতার এই উপদেশ তাঁর মজ্জায় মিশে গিয়েছিল। যামিনীর স্মৃতিচারণে লিখছেন,—"আমি যামিনী ও প্রেমকুসুম তিনজনই অন্য ভাইবোনদের অগ্রজা। পিতামাতা পুত্রের সমান যত্নে কিংবা অধিকতর যত্নে আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন ; তাই আমাদেরও সংকল্প ছিল অন্যলোকের পুত্রেরা যাহা করে আমরা তাহা করিব। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বিশ্রাম দিয়া কনিষ্ঠ ভাইবোনের শিক্ষার ভার আমরা বহন করিব। ঘটনা-চক্রে আমি ও প্রেমকুসুম তাহা করিতে পারি নাই। যামিনীর দ্বারা এই কর্তব্য পূর্ণমাত্রায় সাধিত হইয়াছে। নেপালে যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, তাহার প্রায় সমস্তই পরিবারের কল্যাণে ব্যয় হইয়াছে। যখন যতীন্দ্রমোহন চৌরঙ্গীতে দোকান দিলেন এবং দ্বিতীয় ভ্রাতা বিলাতে গেলেন তখন নিজের জন্য মাসে ২৫ টাকা রাখিয়া সমুদয় অর্জ্জন বাড়ী পাঠাইতেন। দুই কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহের ব্যয়ও তিনিই বহন করিয়াছেন।

*   *   *   *   *

এত স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম, এত জ্ঞান, এত কর্ম্মশক্তি কিন্তু এতটুকু অহংকার তাহাতে দেখি নাই। এই সুন্দর মহৎ জীবনখানি বিধাতা আরও কিছুদিন কেন সংসারে রাখিলেন না বুঝিতে পারিলাম না।"[১]

১। বঙ্গলক্ষ্মী, আষাঢ়, ১৩৩৯

এই যামিনীর কোলেই যতীন্দ্র মোহনের শেষ নিশ্বাস পড়ে। অসুস্থ যতীন্দ্র মোহনকে নিয়ে পিতামাতা নেপালে গিয়েছিলেন। যামিনী তখন সেখানকার ডাক্তার। অক্লান্ত সেবা ও চিকিৎসাতেও প্রিয় ভাইকে রাখতে পারলেন না তিনি।

এরপর কামিনী রায় ১৩৩৭ সালের ভাদ্রমাসের 'বিচিত্রা'য় মাতৃ-তর্পণ করেছেন একটি প্রবন্ধে। এটি লেখা হয়েছিল ২২শে আগস্ট, ১৯১৫ (১৩২২)। কোন লেখা প্রকাশের জন্যই তিনি ব্যাকুল হতেন না। মাতৃবিয়োগে ব্যথিতা কন্যা তাঁর সারাজীবনের সংগ্রাম ও সাধনাকে স্মরণ করেছেন। দুঃখের অগ্নিতাপে শুদ্ধা-চারিণী বামাসুন্দরী যেন অমেয় আত্মবলে দশবছর বয়সের পর থেকেই দুঃখের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেছেন। কামিনীর ছ বছর বয়সে চণ্ডীচরণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ধর্মান্তরকে পিতা ক্ষমা করতে পারেননি। কাজেই পিতার জীবৎ-কালে চণ্ডীচরণের পরিবারের সঙ্গে সংযোগ রাখা সম্ভব হয়নি। নিরুপায় নিমচাঁদকে ভাইয়ের সংসারে আশ্রয় নিতে হয়। চণ্ডীচরণের অল্পবয়সেই মাতার মৃত্যু হয়। কাজেই নিমচাঁদ সেন তাঁর পুত্রবধূ ও পৌত্রীকে নিয়ে ভাইয়ের সংসারে গেলে স্বভাবতই সংসারের দায়িত্ব ও কঠিন কাজের চাপ এসে পড়ে বামাসুন্দরীর কাঁধে। নিঃশব্দে দুঃখের ব্রত সাধন করেন, নীরবেই অশ্রু ঝরে পড়ে। শ্বশুরের মৃত্যুর পর দুঃখত্রাতারূপে চণ্ডীচরণ এলেন। নৌকাযোগে এসেছিলেন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে, উদ্দেশ্য একেবারে নিয়ে যাওয়া। তিনি গৃহে যেতে সাহস করেননি। স্ত্রীকে ডেকে পাঠান। গ্রামবাসী উভয়কেই এই সাক্ষাৎ থেকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বামীই যে তাঁর ধর্ম, কাজেই সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে বামা-সুন্দরী পতিসন্নিধানে আসেন, কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সন্তানসহ বামাসুন্দরী গ্রাম ত্যাগ করে চলে আসেন। এইবার তাঁর ভাগ্যে সূর্যোদয় হল। সকল পাওয়াতে তাঁর জীবন ভরে গিয়েছিল। এমন তেজোময়, কর্মদীপ্ত পুরুষ তাঁর স্বামী। কন্যাগণও স্বীয় মহিমায় পিতামাতার মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে কামিনী রায় তখন এক স্মরণীয় নাম। আর সেই যুগের চিকিৎসায় যামিনী সেনের অগ্রগতি অসাধারণ বিস্ময়। ইংরেজ প্রভুরা পর্যন্ত তাঁকে দমিয়ে রাখবার জন্য বহু হীনতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্মখ্যাতি হীন চক্রান্তের পরও স্বতঃপ্রসারিত হয়েছে। প্রতিভার জ্যোতিতে, নিরলস কর্মসাধনায়, স্বভাব মাধুর্যে যামিনী সেন এক অনতি সাধারণ মহিলা। প্রেমকুসুমও বি. এ পাশ করে এলাহাবাদে Cross Thwaite Girls' School-এর প্রধান শিক্ষিকার পদ গ্রহণ করেছিলেন।

বালিকা বয়সে লাঞ্ছিতা, জর্জরিতা বধূর জীবন ভরে গেলো সুখ ও শান্তির অনির্বাণ মহিমায়।

কামিনী রায়ের জীবনকথা পর্যালোচনায় এঁদের কথা স্বতঃই আসে। এঁদেরই একজন তিনি, তার বহুতর প্রমাণ সারাজীবনের কর্মসাধনায় রেখে গেছেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কন্যা লীলাকে হারাবার পর সপত্নী পুত্র নগেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু তাঁকে কঠিন আঘাত করে। এরা দুজন এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ তিনভাই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কামিনী রায়ের জীবনে যেন মৃত্যুর মিছিল। একের পর এক এসেছে কিন্তু তিনি অসীম ধৈর্য ও সংহত চিত্তে সব গ্রহণ করেছেন। ভেঙে পড়েননি, হাহাকার করেননি। তাই প্রশান্ত চিত্তে বলতে পেরেছেন,—

বহু দুঃখ দেছ বলি করি অভিমান
ফিরায়ে কি রব মুখ, হে আমার নাথ,
ঠেলে প্রসারিত বাহু? সহায়ে আঘাত
অবশেষে এনে যদি থাক— অন্য দান
আনন্দ কি আশীর্বাদ করি প্রত্যাখ্যান
দাঁড়াইনু নত শির; তব বজ্রপাত
অমৃত বর্ষণ কিবা, সমান কল্যাণ।

(অনন্ত আশ্রয়—'ঝরাফুল')

এমনি করেই তো জীবনের বিষের পাত্র অমৃত-রসে ভরে তুলতে হয়! এখানে সাধারণের চেয়ে সাধক-সাধিকার জগৎ পৃথক, তাঁদের অনুভব আলাদা। হৃদয়ের এক একটা গ্রন্থি ছিঁড়ে যায়, তাঁরা অনন্তের রাজ্যে দৃষ্টির প্রসারকে উন্মুক্ত করে দেন। তাই কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

তব কাছে, হে অনন্ত, দূর কাছে নাই।
জনম মরণ ঠেলি বাড়াইলে হাত
তোমারেই হাতে ঠেকে।

... ...

স্পর্শ সেই চিরদিন এ তপ্ত হৃদয়
জুড়াক প্রলেপ সম, কবচের মত
শোক শরাঘাতে মোরে রাখুক অক্ষত।

(অক্ষয় প্রদীপ—'ঝরাফুল')

এই প্রজ্ঞা, এই অভয় মন্ত্র সংসারের যাত্রাপথ সুগম করে। কর্মযোগের সকল সাধনায় সিদ্ধি আনে।

একদিন যে ছোট্ট সংসারকে সমস্ত অন্তর দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কবিতা রচনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল জীবনের রঙে, রসে, সেই জীবন বিধ্বস্ত হলে ব্যথিত চোখের দৃষ্টি মেলে ধরলেন বহির্বিশ্বের দিকে। পরিপূর্ণ শক্তি সাহিত্য সাধনায় নিয়োগ করলেন। তিনি তাঁর কৃতিত্বের যোগ্য মর্যাদা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে লাভ করেছিলেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী সুবর্ণ-পদক' দান করে তাঁকে সম্মানিত করেন।[১]

এই জগত্তারিণী পদক প্রতি দুবছর অন্তর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে দেওয়া হয়। ১৯২১ খ্রীঃ রবীন্দ্রনাথ এই পুরস্কারে ভূষিত হন। তারপর যথাক্রমে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র, ১৯২৪ খ্রীঃ অমৃতলাল বসু, ১৯২৭ খ্রীঃ স্বর্ণকুমারী দেবী ও ১৯২৯ খ্রীঃ পান কামিনী রায়।

সাহিত্যে অভিনন্দন কামিনী রায় অন্যান্য ক্ষেত্র থেকেও লাভ করেছিলেন। বৈদ্যবাটির যুবক সমিতির সভাবৃন্দ ১৩৩২ সালের ৭ই চৈত্র তারিখে তাঁকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেছিলেন এবং সাহিত্য পরিষদের বরিশাল শাখা তাঁকে ১৯৩০ সালের ৭ই পৌষ এক অভিনন্দন প্রদান করেন। ঢাকা জগন্নাথ ইন্টার-মিডিয়েট কলেজের ছাত্রবৃন্দও ১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসে তাঁকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন।

কর্মক্ষেত্রেও সমস্ত উদ্যোগ নিয়ে তিনি যোগ দিলেন। বহু হিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে (মতান্তরে, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০শে মাঘ) ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত ১৯শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভানেত্রী হয়েছিলেন। প্রথমে স্বর্ণকুমারী নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি অসমর্থ হওয়ায় কামিনী রায় সভানেত্রী হন।

১। MINUTES OF THE SYNDICATE
FOR THE YEAR 1929
No. 40 THE 20TH SEPTEMBER 1929
REPORT

We recommend that the Jagattarini Medal for 1929 be awarded to Srimati Kamini Roy for original contribution to Letters, written in the Bengali Language. Among her chief contributions may be mentioned Alo-O-Chhaya.

Chunilal Bose
Dines Chandra Sen
Khagendranath Mitter
Shyamaprasad Mukherjee
Amulya Charan Vidya Bhusan

The 19th September, 1929.

Resolved—That the report was adopted and that the medal for the year 1929 be awarded to Srimati Kamini Roy.

১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও তাঁকে একজন সহকারী সভাপতি পদে নিযুক্ত করে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন।[১]

এছাড়া বিভিন্নস্থানে সভানেত্রীর পদে বৃত হয়ে অভিভাষণ দিয়েছেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ২রা মার্চ তারিখে চন্দননগর কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দিরে চতুর্থ বাৎসরিক সভায় সভানেত্রী হয়েছিলেন কামিনী রায়। এই বিদ্যালয়টি স্বনামধন্য হরিহর শেঠ তাঁর মাতা কৃষ্ণভাবিনীর নামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কামিনী রায় সেখানে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, ১৩৩৭ সালের 'প্রবাসী'র বৈশাখ সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৩৮ সালের 'প্রবাসী'র পৌষ সংখ্যায় 'শ্রীহট্টে শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের অভিভাষণ' সাক্ষ্য দেয় শ্রীহট্টে সাহিত্য অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন।

কামিনী রায় চিরদিনই শান্ত, লাজুক, অন্তর্মুখী। নিজেকে সহজে প্রকাশ করতে চাইতেন না। কবিতা বা অন্যান্য বিষয় লিখে অনেকসময় দীর্ঘদিন ফেলে রাখতেন—কোন প্রকাশকের কাছে পাঠাতেন না। প্রথম জীবনে যে কথা লিখেছিলেন কবিতার পাতায়, শেষ জীবনেও সে কথা তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

করিতে পারি না কাজ
সদা ভয়, সদা লাজ
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

প্রসন্ন, প্রশান্ত হাসির আড়ালে আপনাকে আবৃত করে রাখতেন। মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর 'ন হন্যতে' বইতে তার শান্ত, সংযত চরিত্রের সুন্দর লিপি অংকন

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪০, পৃঃ ৫৩ দ্রষ্টব্য

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি ঃ—ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি, এইচ, ডি ; ডি. এস-সি ; সি, আই-সি।

সহকারী সভাপতিগণ ঃ—শ্রীযুক্তা কামিনী রায় বি, এ ; রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্য বিদ্যার্ণব, সিদ্ধান্ত বারিধি, কবিবর শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি ; ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম, এ. পি, এইচ, ডি ; শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ; রায় শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় ; বিদ্যানিধি বাহাদুর এম, এ ; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ।

শাখা সমিতির সভ্যগণ ঃ—স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতিরক্ষণ সমিতি—শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, শ্রীপ্রমথ নাথ চৌধুরী. শ্রীকিরণ চন্দ্র দত্ত ও অন্যান্য।

কার্য্যালয় ঃ—নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্যবর্ষে কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। সভাপতি—আচার্য্য স্যার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। সহকারী সভাপতিগণ ঃ (ক) কলিকাতার পক্ষে—(১) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (২) স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ পদত্যাগ করায়) পরে শ্রীযুক্তা কামিনী রায় (৩) প্রমথ নাথ চৌধুরী ও (৪) শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। 'বঙ্গের মহিলা কবি'—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

করেছেন। "সেদিন আমাদের বাড়িতে কামিনী রায়কে একজন নবীনা মহিলা কবি হঠাৎ বলে বসলেন যে তাঁরা পুরানো হয়ে গেছেন, 'এখনকার যুগে তাঁদের লেখা গ্রহণযোগ্য নয়। কামিনী রায় অন্তরের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মতী, এ অপমানে একটু বিচলিত হলেন না—স্নিগ্ধমুখে চুপ করে রইলেন। আমার মার খুব খারাপ লেগেছিল এই দাম্ভিকতা। মা বললেন, "কামিনী রায় পুরনো হয়ে গেছেন; ইনি যেন আর কোনদিনও পুরনো হবেন না।" বয়সের ভারে যখন ভগ্ন স্বাস্থ্য হয়ে পড়েন, তখনও নারীজাতির উন্নতিকর ও অধিকার বৃদ্ধি সম্পর্কিত আন্দোলনে যোগ দিতেন।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতবার্ষিকীতে এক মহিলা সভায় সভানেত্রীর পদে বৃত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সামান্য রোগভোগের পর ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত লোকে প্রয়াণ করেন।

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

বঙ্গীয় মহিলা কবিদের শীর্ষস্থানীয়া শ্রীমতী কামিনী রায় মহোদয়া ৬৯ বৎসর বয়সে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করিয়াছেন। অল্প কয়েকদিনের জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ২৩শে সেপ্টেম্বরেও তিনি রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মহিলাদের যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সভানেত্রীর কাজ করিয়াছিলেন। তিনি প্রধানতঃ কবি বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করেন, কিন্তু দেশ-হিতকর নানা কাজের সঙ্গে—বিশেষতঃ নারীদের ও নারী শ্রমিকদের হিতকর নানা প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল। তিনি প্রমুখতার ও প্রসিদ্ধির প্রয়াসী ছিলেন না বলিয়া বরং তাহাতে সংকোচ বোধ করিতেন বলিয়া, হয়তো তাঁহার দ্বারা জনসেবা যতটা হইতে পারিত, ততটা হইতে পারে নাই। তাঁহার গভীর স্বদেশ প্রীতি ও দলিত জনগণের প্রতি সহানুভূতি অনেক কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে সন্দিহানতাবশতঃ 'আলো ও ছায়া' রচিত হইবার অনেক পরে বাহির হয়—তাহাও লেখিকার নাম না দিয়া, সেই সন্দিহীনতা বরাবর ছিল। এবারকার 'প্রবাসী'র প্রথম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কবিতাটিতে এই মাধুর্য্য লক্ষিত হইবে। এই সন্দিহানতা না থাকিলে তিনি বাংলা সাহিত্যকে আরও অনেক কবিতা দিয়া যাইতে পারিতেন।

তিনি মহিলা কবি বলিয়া সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও পুরুষ ও মহিলা সকল বাঙালী কবির মধ্যে তাঁহার স্থান উচ্চে। বাহ্য সৌষ্ঠব, শুচিতা, সংযম চিন্তা ও ভাবের প্রগাঢ়তার দিকে বেশী মনোযোগী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কবিতা পড়িয়া কাহারও মনে হইবে না যে, নারী পুরুষের ক্রীড়নক।

কামিনী রায়ের কাব্যপরিচয়

উনবিংশ শতাব্দীতে অন্তরালবাসিনীগণের অনেকেই সাহিত্য সৃজনে তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁদের অভ্যুদয়ে কাব্যের ভাণ্ডার বিচিত্র সম্ভারে, পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। একান্নবর্তী পরিবারের সমস্ত দায় ও চাহিদা মিটিয়ে তারপর সৃষ্টির কাজে তাঁদের আত্মবিনোদন। তাঁদের কাব্যকলা ত্রুটিহীন হতে পারেনি। যে শিক্ষা ও অনুশীলনে শিল্পের সুষমা আসে, সে সুযোগ তাঁদের জীবনে মেলেনি। সুতরাং অভাব তাঁদের অনেক ছিল। ভাষার পারিপাট্য, শব্দপ্রয়োগ-নৈপুণ্য, ছন্দোমাধুর্য সকল বিষয়েই ত্রুটি ছিল। কিন্তু তাঁদের উদ্যম প্রশংসনীয়, এক হিসাবে তাঁরা স্বভাব কবি।

আলো ও ছায়া (১৮৮৯)—গত শতাব্দীর শেষভাগে দীর্ঘ আলোড়িত কাব্য 'আলো ও ছায়া' কামিনী রায়ের (সেন) প্রথম রচনা। ইনি মহিলা কবি হলেও উপরিউক্ত মহিলা কবিগণের একই সরণীভুক্ত নন। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিতা ও পরিশীলিতা। 'আলো ও ছায়া' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে লেখিকা বিখ্যাত হয়ে গেলেন। নাম গোপন রাখলেও কবির পরিচয় অজ্ঞাত রইল না। বিপুল জনপ্রিয়তা ও অভিনন্দনে কবির প্রথম অভিষেক সমাপন হল।

কবি হেমচন্দ্রের উচ্চগ্রামের প্রশংসাই কাব্যটির প্রথম ছাড়পত্র। "এই কবিতাগুলি আমাকে বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে ; স্থানে স্থানে এমন মধুর ও গভীরভাবে পরিপূর্ণ যে পড়িতে পড়িতে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়, ফলত বাঙ্গালাভাষায় এরূপ কবিতা আমি অল্পই পাঠ করিয়াছি।

* * * *

বস্তুত কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্মলতা এবং সর্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি, পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি আর বলিতেই বা কি স্থলবিশেষে হিংসার উদ্রেকও হইয়াছে।"

বারবার প্রকাশকের কাছে প্রত্যাখ্যাত এবং পরবর্তীকালে বহুখ্যাত 'সুখ' কবিতাটি এবং অন্যান্য কবিতাগুচ্ছের এমন অকুণ্ঠ জয়গৌরব কবির চিন্তারও অগোচর ছিল। সঙ্কোচের বিহ্বলতা মন থেকে অনেকটাই মুক্ত হল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ কবির জীবিতকালের মধ্যেই অষ্টম সংস্করণে কাব্যটির সমাদরের ব্যাপক বিজ্ঞাপন।

বিষাদ ও নৈরাশ্যের নিরবচ্ছিন্ন সুর 'আলো ও ছায়া'য় আগাগোড়া ধ্বনিত হলেও গভীর মনঃসংযোগে দেখা যাবে আশা ও বিশ্বাসই কাব্যের মূলসুর। বিষণ্ণতা কাটিয়ে কবিতারাজির ঝোঁক নীতি ও আদর্শের দিকে এবং সেকথা প্রচারে কণ্ঠ জোরালো।

আদর্শবাদের যুগ তখন, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারক হয়ে উঠেছেন। সাহিত্য সে সময় অনেকটাই নীতিবাদী।

১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে প্রিয়রঞ্জন সেন কামিনী রায়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, "কৈশোরেই তাঁহার অদৃষ্টে অনেক দুঃখভোগ সঞ্চিত ছিল, জীবনের প্রভাতেই তিনি যে আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। তাঁহার কণ্ঠ হইতে বড়ই খেদ বাহির হইয়াছিল—

বিষাদ, বিষাদ, সর্ব্বত্র বিষাদ,
নরভাগ্যে সুখ লিখিত নাই,
কাঁদিবার তরে মানব জীবন
যতদিন বাঁচি কাঁদিয়া যাই।

(সুখ—আলো ও ছায়া)

কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে চিঠিতে কামিনী রায় স্পষ্টই লিখেছিলেন,[১] "শ্রীযুক্ত—সর্বদাই জানাইতেন যে, তাঁহার জীবন দুঃখময় ও ভবিষ্যতের ভাবনায় অন্ধকার। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার ছলেই এবং তিনি প্রবাসে যাইবার পূর্ব্বে আমার নিকট একটি কবিতা চাহিয়াছিলেন সেজন্যও বটে, আমি এই কবিতা রচনা করি। 'গিয়াছে ভাঙ্গিয়া সাধের বীণাটি সে আমার'—আমার বীণা নহে।"

সংসার জীবনের স্বন্দ্ব আঘাত, তার রুক্ষ, ঊষর প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় তখনও হয়নি। বোঝা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক বিষাদ কাব্যের সর্বাঙ্গ জুড়ে; করুণ আবহসঙ্গীত আগাগোড়া ধ্বনিত। কামিনী রায় কাব্যের দুইধারার মধ্যবর্তী যুগের পাদপীঠে দণ্ডায়মান। রবীন্দ্র পূর্বযুগের জনপ্রিয় কবি হেমচন্দ্রের ভাব আদর্শের দিকে তাঁর তন্দ্রাহীন দৃষ্টি। আবার রবীন্দ্রনাথের কল্পনার ঐশ্বর্য ও বিপুলতা এবং আত্মমগ্ন চিন্তা; স্বীয় ভাবজগতে বিশ্বরূপের প্রতিফলন; তাও কামিনী রায় সপ্রশংস নয়নে প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতে নতুন যুগের উপরিউক্ত দুটি বাদে তৃতীয় লক্ষণ হচ্ছে Objective criticism of life। জীবন বহুমুখী, জীবনযাত্রার পথে মিলিত সঙ্গীদের কথা বিচার বিবেচনা করে গতিপথ নির্ধারণ করা। 'আলো ও ছায়া'তে এই তৃতীয় লক্ষণ দর্শনে আচার্য শীল কামিনী সেনের কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কামিনী সেনের মনের গঠনও হেমচন্দ্রের ভাব-দীপিত যুগের আবহাওয়াতে বর্ধিত।

'আলো ও ছায়া' একটি বহুতন্ত্রী কাব্য। নানাসুরের প্রতিধ্বনি কাব্যটিকে বিচিত্ররূপিণী করেছে। বিষাদের সুর কাব্যের অঙ্গ জড়িয়ে থাকলেও দুঃখের

১। শ্রীযুক্ত—সম্ভবত জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চ শিক্ষার্থে লণ্ডন যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে কামিনীর হৃদ্যতার বন্ধন ছিল। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কবিতাটি লিখেছিলেন, একথা ভাবা অযৌক্তিক হবে না।

গভীরতা তাতে নেই। তাই নিরাশার কথা বলতে বলতে তার ছেদ টেনে হঠাৎই যেন অন্যতর চেতনায় উচ্চকিত হয়ে বলেন—

বল্ ছিন্ন বীণে, বল উচ্চৈঃস্বরে—
না,-না,-না,-মানবের তরে,
আছে উচ্চ লক্ষ্য সুখ উচ্চতর ;
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে। (সুখ)

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮২), প্রভাত সঙ্গীত (১৮৮৩), ছবি ও গান (১৮৮৬), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) প্রভৃতি কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। 'হৃদয় অরণ্যে' পথ হারিয়ে 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে' অন্তরের বেদনা যেমন গভীর, 'প্রভাত সঙ্গীতে' আনন্দের অভিব্যক্তিও ততটাই সর্বাশ্রয়ী।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি হেথা করিছে কোলাকুলি।

বিশ্বপথের পথিকের অন্তহীন যাত্রায় অসংখ্য মানুষের সঙ্গে মিলন, জগতের আনন্দযজ্ঞের নিমন্ত্রণে মন নিরন্তর আনন্দসাগরে প্লাবিত। কামিনী রায় এই গভীর দুঃখের কথা, আনন্দধারার কথা কান পেতেই শুনেছেন। কিন্তু বিশ্ব-যজ্ঞের শরিক হতে পারেননি। নারীজনোচিত কিংবা চরিত্রগত কুণ্ঠা-সংকোচ নিয়ে তিনি আত্মভাবনাতে কিছুটা মগ্ন। নবযুগের আত্মকথনের সুর তাঁর মধ্যে অনু-রণিত হয়েছে। যুগ পালটাচ্ছে হেমচন্দ্র বুঝেছিলেন, তাই কামিনী রায়ের কাব্যের ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'কবিতাগুলি আজকালের ছাঁচে ঢালা।' ভাবে, ছন্দে, সুরে-লয়ে রবীন্দ্রনাথ পূর্বযুগ থেকে একেবারে ভিন্নতর পথে পদযাত্রা করলেন। নবীনা কবিও এপথের সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু বিপুলতার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেবার তীব্র সাহস, মনোবল কিংবা ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। একপা, দুইপা অগ্রসর হয়েও দৃষ্টি পিছন দিকেই নিবদ্ধ রেখেছেন। 'ছোট প্রাণ, ছোট'ব্যথা' নিয়ে আপন মনে গুণ গুণ করেছেন। নিরাশায় আকুল প্রাণে যেন 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' চোখে পড়েছে—

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও।
তার মত সুখ কোথাও কি আছে
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

(সুখ-আলো ও ছায়া)

প্রকৃত সুখের সন্ধান বঙ্কিমচন্দ্রও করেছেন। সর্বজনের জন্য সে সুখের কথাও বলেছেন, কমলাকান্ত দপ্তরের 'আমার মন' প্রবন্ধে "পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল্য নাই।[১]

কামিনী রায়ের উপরি উক্ত কথা, কিংবা
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ ধরণী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

(সুখ-আলো ও ছায়া)

এই কথাতে বঙ্কিমবাণীরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়! দুঃখ গভীর এবং ব্যক্তিগত হলে নীতি কথাতে সমাপ্তির সান্ত্বনা মেলে না। কিন্তু 'সুখ' কবিতাটি রচনার সময় কবির বয়স মাত্র সাড়ে পনেরো বছর। ভাবাবেগের আধিক্য খুবই স্বাভাবিক। যুগটা তখনও প্রচারের মহিমা কাটিয়ে ওঠেনি। সুতরাং 'আলো ও ছায়া' কাব্য বিশেষ করে 'সুখ' কবিতাটি পাঠকমহলে প্রবল সাড়া জাগিয়েছিল। এই স্তবকগুলি প্রবাদবাক্যেই পরিণত হয়েছে।

'আলো ও ছায়া'র বিভিন্নধর্মী কবিতাগুলি আলোচনা করলেই এর বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। কবির পনের ষোল বছর বয়স থেকে পঁচিশ বছরের রচনা এই কবিতা সম্ভার। সুরের বিভিন্নতা থাকলেও এর গ্রন্থিবন্ধন হয়েছে চিন্তার গভীরতা দ্বারা, সবগুলিই বাস্তবমুখী, জীবন রস মিশ্রিত। কিশোরী বয়সের কাব্য চিন্তাতেও হাল্কা সুর কোথাও নেই। জীবনে আদর্শবোধ ছিল—প্রীতিপূর্ণ হৃদয়—সূক্ষ্ম অনুভূতির জন্য অল্পেই ছিল বেদনাবোধ। এই ব্যথার সুর তাঁর সকল কবিতাতেই ধ্বনিত।

জীবনের যখন সবে সূচনা, সামনে অনন্ত প্রসারিত পথ, আশায় রঙীন স্বপ্ন ভরা দিন, তখন কেন কবির মনে হয়,—

আঁধারের কীটাণু আমরা
দুরন্ত আঁধারে করি খেলা
অন্ধকারে ভেঙ্গে যায় হাট
জীবন ও মরণের মেলা।

('আঁধারে'-আলো ও ছায়া)

পরক্ষণেই আবার বলছেন,

আমরা তো আলোকের শিশু
আলোকেতে কি অনন্ত মেলা।
আলোকেতে স্বপ্ন জাগরণ,
জীবন ও মরণের খেলা।

('আলোকে'-আলো ও ছায়া)

কবির ভাবনা দ্বিধাখণ্ড। দুই বিপরীত চিন্তার ধারা একই বেগে বহমান। 'জিজ্ঞাসা' 'দুঃখপথে' 'সুখ' 'নিয়তি' 'দিন চলে যায়' প্রভৃতি কবিতায় কবি যেন

্যথাভারে নমিত, হৃদয় তাঁর রক্তাক্ত। "জীবন কিসের তরে'—কেঁদে জিজ্ঞাসিছে ্রাণ"—রোদনতুরা কবিকে মনে হয় পথহারা—সুনির্দিষ্ট পরিণাম থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট। াবার 'দুঃখপথের' আর্তকণ্ঠ—

"এই আমি এই আমি ? হায় হায়! এই আমি!
আপনারে নারি চিনিবারে।"

আত্মসমীক্ষণের ফলেই এই দুঃখ বেদনা। কবি তখন বি.এ, পাশ করে :গছেন। হয়তো দর্শনশাস্ত্রের প্রতিক্রিয়া তাঁর মনে প্রবল। 'সুখ'-এ সেই একই সুরের প্রতিধ্বনি,

'জীবন মরণ একই মতন
ধরি এ জীবন কিসের তরে ?'

'থামু অশ্রু থামু'-এ অশ্রুর বাঁধকে ঠেকিয়েছেন। মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি স্নিগ্ধ আলোকে অনেকটা প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। 'কোথায়'-এ তারই আভাস। এমনি করে হৃদয় দোলায় দুলে দুলে তাঁর জীবনের পথ অতিক্রমণ চলেছে—সে পথে আলো ও ছায়ার যুগপৎ আসা-যাওয়া। দুঃখসাগরে অমৃত মথন চলেছে তখন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মর্মাঘাত থেকে সম্ভবত আত্মস্থ হবার চেষ্টা সেই সময়ে।

নিয়তি আমার,
কঠিন পাষাণ সম, কঠোর হৃদয় মম
দ্রবিবারে যে অনল করিলে সঞ্চার
সেই সে অনল গিয়া, উজলি মলিন হিয়া,
আলোকিল জীবনের পথ অন্ধকার।
(নিয়তি আমার)

এর মধ্যে অতুল প্রসাদের দেবসাধনার সুর-ঝংকার শোনা যায়।

দুঃখেরে আমি ডরিব না আর,
কণ্টক হোক কণ্ঠের হার ;
জানি তুমি মোরে করিবে অমল
যতই অনলে দহিবে।[১]

দুঃখ-নিরাশার দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে নবীন আশায় কবির প্রাণে নব উদ্দীপন, কণ্ঠেও তাঁর নূতন বাণী—

গাহিয়াছি, যেই গান গাহিব না আর,
ভুলে যাব বিষাদের সুর
হইবে নূতন ভাষা নব ভাব তার
রাগিণী সে মৃদুল মধুর।

ক্রন্দন-গীতি থামবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দধ্বনিতে তাঁর শ্রবণ জুড়িয়ে গেল—

বিশ্বযন্ত্রে কি মধুর গীত
অনুদিন হইছে ধ্বনিত
পশিতেছে নীরব আত্মায়।

(নীরবে)

অনতি উচ্চস্বরে এই প্রত্যয়ের ঘোষণা সকলের মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে। ব্যথার অভিঘাতে এই নব উপলব্ধি হৃদয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে জাত।

'যৌবন তপস্যা'য় কবির বক্তব্যে দুঃসাহসের পরিচয় স্পষ্ট। নবযুগের লক্ষণ তাঁর কাব্যে প্রতিভাত, আত্মভাবমূলক কবিতা রচনা করতে করতে আত্মকেন্দ্রিকতায় স্থিত থাকতে পারেননি। চিন্তা ফিরে গেছে সমষ্টি চেতনায় কারণ হেমচন্দ্র প্রভাবিত যুগের স্পন্দনও আছে তাঁর মধ্যে। পরস্পর দুটি ধারাই এসে যায়।

এক যাহা আছে মোর অতি যতনের ধন,
জীবনের সারভাগ, কাল, আমার যৌবন
কভু-কভু নাহি যেন যায়।

(যৌবন-তপস্যা)

ধীর, প্রশান্ত, অনুচ্চ কণ্ঠ কবির এমন জোরালো ভাষণ বিস্ময়কর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মকথনে মগ্ন থাকতে পারলেন না। তাঁর বিবেক তাঁকে ঠেলে নিয়ে যায় সমগ্র-চিন্তায়, বৃহত্তর ভাবনায়।

অপরের সুখ দুঃখে সুখ দুঃখ মিশাইয়া,
প্রেমব্রত করিব পালন।

(যৌবন-তপস্যা)

রবীন্দ্রনাথের 'যৌবন স্বপ্নের সঙ্গে' এ কবিতার ভাব ও ভাষায় মৌল পার্থক্য বিরাট। রবীন্দ্রভাবনা যৌবনের মুগ্ধ আবেশে সর্বব্যাপী হয়েছে; বিশ্বের সৌন্দর্য যেন এতে সঞ্চারিত হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে দেশপ্রেমের বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস, জাতির চেতনা সঞ্চারে সাহিত্যের বিপুল আয়োজন তাঁর মনে নাড়া দিয়েছে। মাতৃবন্দনায় তিনি এসেছেন সঙ্গীতাঞ্জলি নিয়ে। আশা ও উদ্দীপনার বাণী রচনা করেছেন—

দেখিনু যতেক ভারত সন্তান
একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান,
আসিছে যেন গো তেজো মূর্তিমান
অতীত সুদিনে আসিত যাহা।—

(আশার স্বপন)

এই স্বদেশ গাথার বিষয়ে কবির নিজস্ব উক্তি স্মরণযোগ্য। কবির বিনয় নম্র স্বভাবের সুন্দর প্রকাশ এতে।

"মা আমার, মা আমার' গানটাতে আমি 'মা' ভাবটাকে সমস্ত অনুরাগ ও ব্যাকুলতা দিয়ে ভরিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ নই বলিয়া দিয়াছিলাম একটা মহৎ সুর—আমার নির্দেশমত স্বর্গত উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় দিয়াছিলেন। অনেক বৎসর পরে রবিবাবু যখন তাঁহার 'অয়ি ভুবনমোহিনী মা'[1] রচনা করিয়া গাহিলেন, সে ভাষা, সে সুর, সে বর্ণনা সৌন্দর্য্য আমার গানটাকে কতদূর পিছনে ফেলিয়া গেল। তবু আমার গানটাকে একেবারে মূল্যহীন মনে করি না। ইহার মূল্য ভিতরের ভাবে-অন্তরের যে সাধনা, যে তপস্যার শিখা একটু প্রকাশ করিতেছে ও অপর প্রাণে সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছে তাহাতেই।"

এক ভদ্রলোক কামিনী রায়কে কথা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন "আপনার 'মা আমার মা আমার' গানটাই আমার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া আমাকে চালাইয়াছে।"

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে লেখা একটা চিঠিতেও তাঁর স্বভাব নম্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। "আমার মনে হয় আমি কিছু অকালপক্ক ছিলাম। কতকগুলি বিষয় আমি রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই লিখিয়াছি, কিন্তু তিনি যখন লিখিয়াছেন অনেক সুন্দর করিয়া লিখিয়াছেন। যাহা শীঘ্র বাড়ে, তাহা শীঘ্রই নষ্ট হয়, প্রকৃতির মধ্যে ইহা সর্বদাই দেখি। অশ্বত্থ বটাদি বনস্পতি ধীরে বাড়ে, কিন্তু তাহারা যত দীর্ঘায়ু হয়, লাউ, কুমড়া, শশা অন্য শাকাদি সেরকম হয় না। ইহারা দুদিনে বাড়ে দু'দিন বাদে মরে। যে সব ছেলে Precocious তাহাদের মধ্যে কেহই বড় হইয়া বড়লোক হয় না। আমার মধ্যেও একটা Precocity ছিল, কিন্তু বয়সের সঙ্গে শক্তিবৃদ্ধি দেখা গেল না। অবশ্য সারাজীবন কতগুলি প্রতিকূল ঘটনার মধ্য দিয়াই আসিতে হইয়াছে। সাহিত্যের সাধনা ও অনুশীলনের সুযোগ ঘটে নাই। মনের জড়তাও ছিল।"

কবি নিজের সম্বন্ধে যাই বলুন, ছেলেবেলা থেকেই তাঁর একটা উচ্চ ভাবাদর্শ ছিল। বৃহৎ জীবনের কর্মসভায় নিজেকে সমর্পণ করার মহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে দেশমাতার পাদদেশে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ উৎসর্গ করাও তাঁর কাব্যকৃতির একটা প্রধান অংশ, 'মা আমার' কবিতায় সেই ভাবই বড় হয়ে উঠেছে।

যেইদিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জন্মভূমি,—মা আমার, মা আমার।

(মা আমার)

বৃহৎ জীবন-চেতনাই তাঁর দৃষ্টিকে সমাজের নিম্নায়ত স্তরে নিয়ে এসেছিল। মনুষ্যত্ব ধর্ম, সেবাব্রত, 'সর্বজন হিতায়' আত্মসুখ বিসর্জন এগুলি তাঁর চরিত্রের ও কাব্যের উপাদান। 'চাহিবে না ফিরে?' 'ডেকে আন্', 'আহা থাক' কবিতাগুলি মানবধর্মে দীপ্তোজ্জ্বল। অন্তরের সৌন্দর্যে, ঔদার্যে কবিতাগুলি অনুপম!

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, স্বদেশ, গীত সংখ্যা-২৩, পৃঃ ২০০

পতিতের প্রতি ঘৃণা নেই পাপের প্রতি ধিক্কার নেই—মানবিক অনুরাগে 'ডেকে আন' 'চাহিবেনা ফিরে' কবিতাগুলির বক্তব্য স্পষ্ট, সুন্দর ও পবিত্র।

জীবনের আদর্শ ও বাস্তব পৃথিবী—এ দুয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। আদর্শ লালিত অন্তর তাই স্বপ্নভঙ্গে আঘাত পায়। 'আলো ও ছায়া'তে সেই আশাভঙ্গের বেদনা—কবির কণ্ঠে নৈরাশ্যের সুর। রমণীর ভাবনাহীন নিশ্চিন্ত আরামের জীবন যেমন তাঁর কাছে অসহ্য, পুরুষের ক্লীবত্বও একইরকম পীড়াদায়ক।

শান্ত, নম্রবিধুরা কবি কখনও উচ্চগ্রামে কিছু বলতে পারেন নি। নিজের ব্যথাভার নীরবে বয়েছেন, ব্যথার রেশ কবিতায় ফুটেছে বিন্দু বিন্দু অশ্রুর মত। আদর্শের কথাও নিম্নস্বরে বলেছেন; তাতে উষ্মা নেই কোথাও, আছে শুধু প্রাণের আবেদন। লজ্জা, সংকোচ তাঁকে বাধা দিত বলে প্রচার বিমুখ কবি জীবনের কর্মসাধনেও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

'পাছে লোকে কিছু বলে', 'কামনা', 'দূর হতে' কবিতাগুলিতে কবি নিজের লজ্জাদীন চেহারা তুলে ধরেছেন। আত্মপ্রকাশের অক্ষমতায় বেদনা বোধ করেছেন।

বিধাতা দেছেন প্রাণ
থাকি সদা ম্রিয়মান
শক্তি মরে ভীতির কবলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

(পাছে লোকে কিছু বলে)

চিন্তার বৈচিত্র্য দেখা যায় কয়েকটি কবিতায় শিশুর প্রতি আকর্ষণে। গুরুভার চিন্তা নেমে এসেছে স্বভাবের সৌন্দর্যে। শিশু আর প্রকৃতি একই সঙ্গে, তাদের পবিত্র শোভা দিয়ে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 'চিনুর প্রতি', 'নববর্ষে বালিকার প্রতি', 'বালিকা ও তারা', কবিতাগুলিতে কবির আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতি ও শিশুর সান্নিধ্যে স্বর্গসুখ উপভোগ করবেন। হৃদয়ের ভারে বলে ওঠেন,

চাহিনা, চাহিনা, কিছুই চাহিনা,
চাহি শুধু এই কানন খানি,
চাহি শুধু মৃদু কুসুমের হাস,
বন বিহগের মধুর বাণী।

(চাহিনা)

প্রেম এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান, কুমারী জীবনের শুভ্র প্রেম, ব্যর্থতার বেদনা, নিঃসঙ্গ যৌবনের দীর্ঘশ্বাস ও দুঃখের গুঞ্জরণে কবিতারাজি অননুভূত স্বাদের পরিবেশক।

'আলো ও ছায়া'র বেদনার ভাগ কবির নিজের। আশা ও আনন্দের বাণী সকলের জন্য। প্রেমের কবিতাসমূহে ব্যথার অশ্রু নিঃশব্দে ঝরে পড়েছে অজস্র-ধারায়, এর অম্লান জ্যোতি বিকশিত হয়েছে সকলের দৃষ্টির সামনে।

সুকুমার সেন বলেছেন, "দৈবাহত অথবা প্রিয় বিড়ম্বিত নারীপ্রেমের সশঙ্ক কুণ্ঠা এবং আত্মলোপী ব্যক্তি নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থতা ইঁহার কাব্যের বিশিষ্টসুর।"

'পঞ্চক' এ পাঁচটি স্তবকে প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদন। 'প্রণয়ে ব্যথা' 'ছাড়াছাড়ি' 'বিদায়ে' কবিতায় ব্যর্থ নিরাশ হৃদয়ের বেদনাগীতি।

আঘাত ও বেদনাতেও অভিযোগের তিক্ততা নেই ; নেই আক্রোশের জ্বালা। উদ্গত প্রাণের এই প্রেমের গৌরব অদ্বিতীয়। কবির স্নিগ্ধ, মৃদু উক্তি

তোমারি গৌরবে গর্ব্ব, তোমারি সুখেতে সুখ ;
তোমারি বিষাদে নাথ ভাঙ্গিয়া যাইবে বুক।

রাধার চিরপ্রেমের বাণীকে এ স্মরণ করায়—

দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলেত ভাল ॥[১]

এই প্রেমের জোয়ারে তিনি অতীতচারী হয়েছেন। ইতিহাসের পাতা থেকে সঞ্চয় করেছেন, কৃষ্ণকুমারীর আখ্যান,—দেশের জন্য নিজের জীবন যার উৎসর্গিত।

'বৈশম্পায়ন', 'চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ', 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীকে' কবির সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরাগ ও অধিকারের পরিচয় স্পষ্ট। পুরাণের প্রেমকথার নবরূপায়ণ তাঁর 'কাদম্বরী' কথাসাহিত্যের প্রতি আসক্তির পরিচয়।

'বৈশম্পায়নে' রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

অচ্ছোদ সরসীতীরে বিচরিছে ধীরে ধীরে
পাগল পরাণ,
প্রতি তরু প্রতি লতা কি যেন কহিছে কথা
উন্মাদিয়া কান।

কবিও যেন মহাশ্বেতার মতই বিচ্ছেদের কঠিন আঘাতে দুঃখের সাধনায় আত্মলীন। সাধনায় সিদ্ধির ফলপ্রাপ্তি হিসাবে তাঁর পুণ্ডরীকেরও আবির্ভাব হয়েছে তাঁর জীবনে নতুনরূপে। আপন উপলব্ধির প্রকাশবলেই 'মহাশ্বেতা', 'পুণ্ডরীক' এমন মর্মস্পর্শী।

রবীন্দ্রনাথ কামিনী রায়ের কবিতার ভাষায় সঙ্গীতময়তার অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। (প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত পত্র থেকে উদ্ধৃত)

"আলো ও ছায়া'য় 'মহাশ্বেতা' আমার ভালো লেগেছিল বেশ মনে আছে। আসল কথা 'আলো ও ছায়া'র লেখিকার ভাব কল্পনা এবং শিক্ষা আছে কিন্তু তাঁর লেখনীতে ইন্দ্রজাল নেই, তাঁর ভাষায় সঙ্গীতের অভাব, আমার এইরকম মনে হয়েছিল।"[২]

প্রিয়নাথ সেন 'আলো ও ছায়া' সম্বন্ধে তাঁর মতামত রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে জানিয়েছেন।

"তোমাকে কাল চিঠি লেখবার পর 'আলো ও ছায়া'র স্থানে স্থানে পড়ে দেখলেম, ইহার ভিতর দুএকটি সুন্দর রচনা আছে—'মহাশ্বেতা'য় যদিও উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব নাই—এবং কাদম্বরী অবলম্বনে লিখিত—তবু গল্পটি বেশ সহজ সরলভাবে লিখিত। হাঁক ডাক নাই কথা স্রোত বেশ একটি ক্ষুদ্র অনাবিল নদীর জলের ন্যায় ধীরে চলিয়াছে। ইঁহার ভিতর এমন অনেক স্থান আছে যেখানে কাঁচা লেখক আড়ম্বর করিয়া লিখিবার প্রলোভন এড়াইতে পারিত না—কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রীর শিক্ষা ও রুচি তাঁহাকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। তবে বিষয়টি প্রকৃত কবির হাতে যেরূপ পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত তাহার কিছুই হয় নাই। ভাবে টলমল করিয়াছে কিন্তু রসোচ্ছ্বাসে প্রকম্পিত।[১]

আলো ও ছায়া

আলো ও ছায়া নামক একখানি কবিতা পুস্তক কয়েকমাস হইল প্রকাশিত হইয়াছে। কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ভূমিকাতে কবিবর যেরূপ প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পুস্তকখানি পাঠ করিতে স্বভাবত কৌতূহল জন্মে; একটু সন্দেহও হয়; বুঝি বা বৃদ্ধ কবি অতি স্তুতিবাদ দোষে দূষিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ পুস্তকখানি পাঠে আমাদের সে আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে।

হেমবাবু লিখিয়াছেন, "কবিতাগুলি আজকালের 'ছাঁচে ঢালা'।" ইহা দ্বারা এই নবীন কবির প্রকৃতি কতক পরিমাণে নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু আজকালের এই ছাঁচ কি? নূতনে পুরাতনে পার্থক্য কোথায়? বঙ্গের কাব্য-কাননে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীন এই পুরাতন সুরের গায়ক, সুরেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তয়িতা। আমাদের এই নবীন কবি বর্ত্তমান যুগেরই লোক—অনেক পার্থক্য থাকিলেও ইনি রবীন্দ্রনাথেরই স্বজাতি। এই দুই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে বিষয়গত ও তাহার বাহ্যিক আকারগত বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে। পুরাতন কবিরা এমন সমস্ত বিষয় লইয়া তাহাদের কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা সাধারণের আয়ত্তাধীন। সাধারণ জিনিষের উপর তাহাদের কল্পনার সৌন্দর্যরাশি ঢালিয়া দিয়া তাহাকে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের আকর করিয়া তুলিয়াছেন; তাঁহারা যে সমস্ত ভাব লইয়া মানবপ্রাণকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক সীমান্তরেখা আমাদের নয়নগোচর হয়। তাঁহাদের ভাষাও ইহার অনুরূপ। তাঁহারা এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করেন নাই, যাহা তাঁহাদের ভাষা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। মধ্যাহ্ন সূর্য কিরণে উদ্ভাসিত হইলে যেমন প্রাকৃতিক

১। চিঠিপত্র, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২৭৩

পদার্থের সর্ব্বাঙ্গ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় ; কিছু আর অপ্রকাশিত রহিল বলিয়া সন্দেহ হয় না, তেমনই তাহাদের ভাব অনুরূপ ভাষায় আবৃত হইয়া পাঠকের চিত্তক্ষেত্রে উদিত হয়, কিছু বুঝা হইল না বলিয়া আর ক্ষোভ থাকে না। তাঁহাদের ভাব ও ভাষায় মধ্যে এই সামঞ্জস্য থাকাতে তাঁহাদের কবিতাতে এমন একটি গাম্ভীর্য্য, অচঞ্চল সৌম্যভাব রহিয়াছে যাহা বর্ত্তমান যুগের কবিদের মধ্যে পাওয়া যায় না। অন্যপক্ষে আধুনিক কবিরা অতি ধীরপদে অন্তরের অতি নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া যে সকল কোমল ভাবের ক্রীড়া দেখিতে পান, যে ভাব পরীর ন্যায় সুমধুর গানে প্রাণকে মুগ্ধ করিতে থাকে, কিন্তু ধরিতে গেলে আর ধরা যায় না, হাত হইতে সরিয়া যাইয়া দূরে ক্রীড়া করিতে থাকে—সেই সমস্ত ভাব লইয়াই ইঁহাদের ব্যবসায়। স্বপ্ন দৃষ্ট স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য রাশির ন্যায়, নিশীথ কালে মৃদু-মধুর পবন সঞ্চালিত দূর সমাগত বংশী নিঃসৃত সঙ্গীতের ন্যায়, অতীব সুখের স্মৃতির ন্যায় ইহা প্রাণস্পর্শ করিয়া প্রাণ মুগ্ধ করিয়া, প্রাণটাকে উদাস করিয়া চলিয়া যায়—ধরিবার ছুঁইবার যো নাই। এ ভাব ভাষায় প্রকাশ হয় না। সন্ধ্যা-গগনের সতত পরিবর্ত্তনশীল কোমল সৌন্দর্যরাশি কেহ কখনও কি চিত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন? গোধূলি সময়ে যখন প্রাকৃতিক জগতের সীমান্ত রেখাগুলি অল্পে অল্পে বিলীন হইতে থাকে, তখন যেমন অনন্তের ছায়া আসিয়া প্রকৃতির মুখে পড়িয়া প্রকৃতির মধ্যে এক অপার সৌন্দর্য্য স্রোত ঢালিয়া দেয়, যাহা প্রকাশ করিতে ভাষা মূক, তেমনই এই সমস্ত কোমল 'ইথিরীয়' ভাবগুলি প্রকাশের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট অর্থবিশিষ্ট কথাগুলি নিতান্তই অক্ষম। এইজন্য বর্ত্তমান যুগের কবিদের ভাষা ভাবাভিভূত, ভাবের আবেগে ভাষা ক্ষুব্ধ, জড়সড়। ভাব ও ভাষার,অসামঞ্জস্য-জনিত সে সৌন্দর্য্য, সে সৌম্যভাব বিনষ্ট হইয়াছে; পৃথিবী গর্ভে উত্তপ্ত বাষ্প-রাশি জমিলে যেমন ভূমিকম্প হইতে থাকে, তেমনই ভাবের প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া এ ভাষাও কম্পিত। ভাষাকে অতিক্রম করিয়া ভাব উধাও হইয়া অনন্ত রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। যাঁহারা এ ভাবের ভাবুক তাঁহাদের নিকট এরূপ কবিতা অধিকাংশ স্থলেই অর্থহীন প্রলাপ মাত্র।

বাণীর বরপুত্র সেলি স্বর্ণবীণা করে ধরিয়া প্রথমে এই সুরে গান করিয়া-ছিলেন। আজ প্রায় ৭০ বৎসর হইল সেলীর স্বর্ণবীণা নীরব হইয়াছে, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত লহরী আজও থামে নাই, বরং দিনদিনই তাহার প্রভাব বৃদ্ধি হইতেছে। সেই সঙ্গীত লহরী আসিয়া এই দুর্দশাগ্রস্ত দেশকেও স্পর্শ করিয়াছে এবং তাহার ফলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাইয়াছি। অবশ্য ইহার দ্বারা আমি রবীন্দ্রনাথকে সেলি বলিতেছি না, তাহা আমার উদ্দেশ্যও নহে। বাঙ্গালী জাতি কিন্তু ইংরাজ জাতি নহে, বাঙ্গলা সাহিত্যও ইংরাজী সাহিত্য নহে, রবীন্দ্রনাথও সেলি নহেন। তবে যেভাবে উদ্ভিজ্জতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা সামান্য বাঁশ ও তৃণকে একই জাতিভুক্ত বলিয়া মনে করেন, আমিও সেইভাবে রবীন্দ্রনাথ ও সেলিকে জ্ঞাতি বলিয়া মনে করি। বাঙ্গলা দেশীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এ নূতন যুগের প্রবর্ত্তয়িতা।

তাঁহার সুললিত কণ্ঠরবে তিনি দেশকে মুগ্ধ করিয়াছেন। এক নূতন সৌন্দর্য্যের দ্বার খুলিয়া দিয়া তিনি আমাদের দেশের নরনারীকে এক নূতন সুখের রাজ্যে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা ও উন্নতির রাজ্যে লইয়া যাইতেছেন। প্রকৃতির মাধুর্য্য বর্ণনে তিনি আমাদের দেশে অদ্বিতীয়। পাখীর কলকণ্ঠে, শিশিরসিক্ত প্রভাত কুসুমের সুমধুর সৌরভ, নীল-গগনে পরিশোভমানা প্রকৃতিরাণী চন্দ্রমার সুবিমল জ্যোৎস্না তাঁহার গানের সঙ্গে যেন মিশিয়া রহিয়াছে। ইহাও রবীন্দ্রনাথের বাহ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান ভাব এক অনন্ত অতৃপ্তি ও অনন্ত-পিয়াস। জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্যের মাঝে ক্ষুদ্র আঁখিটাকে ডুবাইয়া দিয়া একেবারে আত্ম-বিস্মৃত। সেই অনন্ত-সৌন্দর্য্য উপভোগ করাই তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য। তাঁহার অন্য সমস্ত ভাবই এই মহাভাবের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। মনুষ্য যতই চেষ্টা করুক না কেন, সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হওয়া অসম্ভব। এরূপ আকাঙ্ক্ষা কেবল একদেশদর্শী Idealism-এর ফল। এই একভাবে গা ঢালিয়া দেওয়াতে তাঁহার অন্যান্য ভাবের উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি হয় নাই। ইহা একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, অপরপক্ষে ইহাই আবার তাঁহার ক্ষমতারও পরিচায়ক বটে। তাঁহার প্রাণ যে সর্ব্বক্ষণই একই সুরে বাঁধা রহিয়াছে তাহা তিনি তাঁহার "হৃদয়ের গীতধ্বনি"তে স্বীকার করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পরে তাঁহার পদানুসরণ করিয়া আমাদের দেশে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবি দেখা দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বীণার দুই-একটি তান ধরিয়া দিবানিশি এমনিভাবে বাজাইতেছেন, যে দেশের লোক কবিতারসে অনুরাগী হওয়া দূরে থাক বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছেন। এই দুর্দ্দিনে আমরা একটি প্রকৃত কবির স্বাধীন-তন্ত্রীর মধুর নিক্কণে আশ্বস্ত হইয়াছি। এখানে আর কেবল নির্জ্জীব অনুকরণ নাই; নিজ হৃদয়ের সজীব শোণিত প্রত্যেক শিরায় শিরায় সন্তাড়িত হইয়া, প্রত্যেক মাংসপেশীকে সবল করিয়া তুলিয়াছে। মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের সহিত ইঁহার নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও ইঁহাদের মধ্যে প্রভেদ সামান্য নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রেম ইঁহাতে নাই; আমরা কোথায়ও সেরূপ প্রকৃতির মধুর ভাবের বর্ণন পাই নাই, যে গভীর সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের কেন্দ্রস্থানীয় সে ভাব তত তীব্রভাবে ইঁহার ভিতর প্রকাশ পায় নাই। যে অভিজ্ঞতা থাকিলে সঙ্গীতে যে ভাব প্রকাশ পায়, সে অভিজ্ঞতা হয়ত ইঁহার নাই। ইনি 'সুখ', 'নিরাশ', 'দুঃখপথে' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতাতে নৈরাশ্যের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু এ নিরাশায়, এ দুঃখে সে গভীরতা নাই, সে হৃদয়-দ্রাবণী শক্তি নাই। তাই বলিয়া একথা সত্য নহে, যে, যে কোন ব্যক্তি নিজ ব্যক্তিগত জীবনের শোক-দুঃখ অবলম্বন করিয়া কবিতা লেখে সেই কবি।

Our sweetest songs are those
That tell of saddest thoughts.

তাঁহার সুখ নামক কবিতাতে তিনি ছিন্নবীণা, ভগ্নহৃদয়, নিরাশার পৈশাচ রবের, কথা বলিতে বলিতে এমনি আবার আশা ও উৎসাহের তান ধরিলেন। ইহাতেই মনে হয় তিনি এতক্ষণ যে দুঃখের গান গাহিতেছিলেন তাহা প্রকৃত নহে। ইহা কাব্যশাস্ত্রের একটি বিষম দোষ।

ইনি দুঃখের মন্ত্রে দীক্ষিত নহেন। অপার আশা, অদম্য উৎসাহ ও সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রাণোন্মাদকারী ভাবে ইঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাঁধা। ইহার পক্ষে নৈরাশ্যের গান স্বাভাবিক নহে। যেখানে আশার কথা, সেখানেই ইঁহার হৃদয়তন্ত্রী স্বতঃই বাজিয়া উঠে। "যৌবন তপস্যা"তে কবি আপন প্রাণের এই অনন্ত আশার গানই গাহিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবের শিশু। শিশুর ক্রীড়া, শিশুর হাসি, শিশুর ক্রন্দনের ন্যায় তিনিও প্রাণের আবেগে গান গাহেন, গান গাওয়া তাঁহার স্বভাব, 'গান আসে বলে, গান গাই।' আমাদের এ নবীন কবি সে বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন; শিশুর সুখ দুঃখে আর তিনি পরিতৃপ্ত নহেন। জ্ঞানের গরিমা জীবনের নৈতিক আদর্শের গাম্ভীর্য ইঁহার প্রাণে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

চাহি না ফিরিতে আর, শৈশবের লীলাগার
তরুণ কল্পনাভূমি অর্দ্ধ অন্ধকার,
তৃষিত নয়ন আগে, যে দিব্য আলোক জাগে
তাহারই লক্ষ্য করি চলি অনিবার
ধর ধর ক্ষীণহস্ত, তুমি হস্ত বিধাতার।

ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ যে আমাদের আদর্শ জীবনের নিয়ামক নহে, আমাদের জীবনের যে উচ্চতর, আমাদের জন্য যে সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে তাহা কবি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং মধুরতানে সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র গান করিয়াছেন।

পরের কারণে মরণেও সুখ
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদো না আর
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

এই সামাজিক জীবনে আত্মজীবন ডুবাইয়া দিয়া জীবনের চরম লক্ষ্য লাভের কথা এই পুস্তকের সর্ব্বত্রই বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখে গা

ঢালিয়া দিলে যে বিলাসের আবিলতা যে দুঃখের অবসাদ উপস্থিত হয়, তাহা তাঁহার কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় না ; বরং ইঁহার কবিতা পাঠ করিলে প্রাণ সবল হইয়া উঠে, নূতন তেজ হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।

আলো ও ছায়া প্রণেতার প্রতিভা বিশাল মানব হৃদয়ের বিশেষ কোন ভাবে আবদ্ধ নহে। তিনি আপনার সবল পক্ষযুক্ত কল্পনা বলে মানব হৃদয়ের সহিত গভীর সহানুভূতির সাহায্যে জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে আপনাকে পতিত করিয়া মানবের গূঢ় হৃদতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং অধিকাংশ স্থলে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তাঁহার সহানুভূতি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নহে। মানবের সকল অবস্থাতেই তাঁহার সহানুভূতি অসংকুচিতভাবে প্রসারিত। ভ্রান্ত, পতিত মানব তাঁহার পর নহে ; তাহার জন্য তাঁহার স্নেহের হস্ত প্রসারিত। "চাহিবে না ফিরে ?' ও 'ডেকে আন' এই দুইটি কবিতাতে তাঁহার গভীর মানব প্রেম প্রকাশ পাইতেছে। এ কবিতা দুটি এতই সুন্দর হইয়াছে যে পাঠককে সমগ্র কবিতা দুটি উপহার দিতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু স্থানাভাবে তাহা হইল না। পাঠক নিজেই কবিতা দুটি পাঠ করিবেন এ আমার অনুরোধ। দুর্ব্বল পরাজিত মানব হৃদয় মধ্যে যে ঘোর সংগ্রাম তাহা তিনি যেভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। তাঁহার 'বেশী কিছু নয়' শীর্ষক কবিতাটিতে তিনি আপনার শক্তিকে অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। নিজে সবল হইয়া অপরের দুর্বলতাকে স্নেহের চক্ষে সহানুভূতির চক্ষে দর্শন করা সামান্য কথা নহে। বিশুদ্ধ আদর্শ হৃদয়ের ধারণ করা ও চিত্র করা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য ; কিন্তু যে হৃদয়ে দেবদানবের সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা বর্ণনা করা গভীর অন্তর্দৃষ্টি উচ্চশ্রেণীর কবিত্বের পরিচয়ে এই কবিতাটিতে নবীন কবি সেই ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। এই ক্ষমতার উপযুক্ত রূপ উৎকর্ষ সাধিত হইলে যে ইঁনি একদিন উচ্চশ্রেণীর মহাকাব্য লিখিতে সমর্থ হইবেন এরূপ আশা করা যায়। এ কবিতাটি পাঠ করিলে কেহ আর মানব হৃদয়ের গভীর সুখদুঃখ সম্বন্ধে কবির অভিজ্ঞতার অভাব আছে বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না।

এই নবীন কবি যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া আমাদের অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন তাহার দুই-একটির পরিচয় দিয়া আমি এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তাঁহার 'পঞ্চক' শীর্ষক কবিতা স্তবকের এক একটি কবিতা এক একটি অমূল্য রত্ন। তাঁহার মধুময়ী কল্পনার অপর একটি অপূর্ব্ব কুসুম, যে গভীর অথচ মধুময়ী ভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহারই অনুপ্রাণিত লেখনীতে প্রকাশ পাইয়াছে ; আমি তাহার পরিচয় দিতে যাইয়া তাহার মাধুর্য নষ্ট করিব না। পাঠক সেই মূল প্রস্রবণে সুধা পান করিয়া আপন কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন। যে ভাব মানব হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে বাস করে, যাহা মানব সন্তানকে তাহার আধিপত্যের ক্ষুদ্রসীমা ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বর্গের পথে লইয়া

যায়, যাহা প্রাণে প্রবেশ করিলে "ক্ষুদ্র মলিন কীটও দেবতা হইয়া যায়"—সেই পবিত্র প্রেম সম্বন্ধে এ কবির আদর্শ যত উচ্চ যত নির্ম্মল পাঠক দেখুন,—

এত কি কঠিন তব প্রাণ।
তোমারে আপনা দিয়া অতি তিরপিত হিয়া,
আমিও চাহিনা প্রতিদান।
দূরে রও, ঊর্দ্ধে রও, দেবী হয়ে পূজা লও,
পূজিবার দেহ অধিকার।
তার বেশী চাহি নাই; তাও কেন নাহি পাই;
অত কেন অদেয় তোমার?

প্রণয় সে আত্মার চেতন,
জীবনের জনম নূতন,
মরণের মরণ সেথায়।

আলো ও ছায়ার চতুর্থাংশেরও অধিক, মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীক নামক দুটী দীর্ঘ কবিতাতে পূর্ণ। এ দুটি চিত্র বাণভট্ট প্রণীত ভারত বিখ্যাত কাদম্বরী নামক গ্রন্থের দুইটি প্রধান চরিত্র অবলম্বনে লিখিত। এই চিত্র দুটি মূলগ্রন্থের চিত্র দুটির পার্শ্বে রাখিয়া বিচার করিলে এ নবীন কবির অসাধারণ লিপি চাতুর্য্য স্পষ্টই দেখা যাইবে। এ চিত্র দুটি মূল চিত্রের লিখিত চর্ব্বণ নহে, অথবা তাহার 'ক্ষীণতর প্রতিধ্বনি' ও নহে। মূল ঘটনার একত্ব না থাকিলে ইহাকে সম্পূর্ণ নূতন কবিতা বলা হইত। বস্তুত যাহা কাব্যের প্রাণ, সেই ভাব ও আদর্শকে লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া বিচার করিলে ইহাকে কবির নূতন সৃষ্টি বলাই বিহিত। মহাশ্বেতার জীবনে তিনি যে প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ আধুনিক। পুরা জগতে কুত্রাপি এ আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায় না। কাদম্বরীতেও তাহা নাই। সংস্কৃত কবি আপন বিচিত্র প্রেমকে চিত্তবিকার আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিশেষ অন্যথায় হয় নাই। কিন্তু বঙ্গের নবীন গায়ক আপন কবিতাতে এক স্বর্গের মমতা ঢালিয়া দিয়াছেন। অতি কোমল হস্তে তুলিকা ধারণ করিয়া আপন চিত্রে বর্ণচাতুর্য্য অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রতিফলিত করিয়াছেন। মূলগ্রন্থে আদিরসের স্থূলত্ব ও মলিনতা অতি যত্ন সহকারে অপসারিত করিয়া কবি আপন সুখার্জ্জিত রুচি ও সুশিক্ষিত চিত্তবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। মহাশ্বেতার কুমারী হৃদয়ের সেই সুকোমল, সকরুণ ভাব, সে সরলতা, সে গভীর উদ্বেলিত, পবিত্র প্রেম, সে ঐকান্তিক আত্মোৎসর্গ চিরদিনই বঙ্গসাহিত্য কাননে একটি অপূর্ব্ব রত্নরূপে শোভা পাইবে। মহাশ্বেতার চিত্র মূলের সহিত যতটুকু সৌসাদৃশ্য আছে, পুণ্ডরীকের চিত্রে তাহাও নাই। এখানে কবি আপন কল্পনা শক্তির যথেষ্ট পরিচালনা করিবার অবসর পাইয়াছেন এবং তাহাতে আপনার উচ্চ-

শ্রেণীর ক্ষমতার পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছেন। মহাশ্বেতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অনেক কথাই এখানে প্রযুজ্য।

কবি যে সমস্ত সৌন্দর্য্য প্রসূন সৃষ্টি করিয়া আমাদের সাহিত্য কাননকে সুশোভিত করিয়াছেন, তাহার সমস্তগুলির পরিচয় দেওয়া এরূপ প্রবন্ধে অসম্ভব; তাহা হইলে একখানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে। কাজেই আমাকে দুই চারিটির পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইল।

নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা কবির কার্য্য। যিনি নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া মানবের সুখের দ্বার খুলিয়া দেন, তিনি সমস্ত মানব সমাজের পরম উপকারী বন্ধু ও সমগ্র মানব তাঁহার কাছে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। মুক্ত কণ্ঠে এ উপকার স্বীকার করা আমাদের কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনে আমি আজ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, পাঠক বিবেচনা করিবেন। কবি যে তাঁহার সকল চেষ্টাতেই সিদ্ধ মনোরথ হইয়াছেন. একথা আমি সাহস করি না। আর না হইলেই বা কি। স্বয়ং প্রকৃতিরাণী একটি সুন্দর বস্তু সৃষ্টি করিতে যাইয়া কতবার অকৃতকার্য্য হইয়া পরে সফলকাম হন, তাহাতে কেহ দোষ দর্শন করেন না। যদি কেহ করেন, তবে তাহাকে আমরা চিত্তরোগগ্রস্ত বলিয়া মনে করি। মনুষ্যের পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম হইবে কেন? এমন উপকারী বন্ধুর ত্রুটি প্রদর্শন করিতে যাওয়া নিতান্ত সংকীর্ণ হৃদয়ের পরিচায়ক।

শ্রীসীতানাথ নন্দী

।। মাল্য ও নির্মাল্য ।। (১৯১৩); **নির্মাল্য** (১৮৯১)

"গত দশবৎসরের মধ্যে রচিত আমার কতগুলি কবিতা আলো ও ছায়াতে প্রকাশিত হইবার অযোগ্য বলিয়া ইতিপূর্বে উজ্ঝিত হইয়াছিল। সেইগুলির সহিত দুই চারিটি নূতন কবিতা সন্নিবেশিত করিয়া সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা গেল।" 'নির্মাল্যে'র প্রকাশকালে কবির আবেদন ছিল এই। দীর্ঘকাল অবসানের পর, সংসার জীবনের অবসর মুহূর্তে কবি যখন আবার কাব্যভাণ্ডার খুললেন, তখন 'নির্মাল্য' মাল্যের বন্ধনে বাঁধা পড়ে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'মাল্য ও নির্মাল্য' নামে প্রকাশিত হল। সুর ও ভাববস্তুতে একই মাত্রা আছে বলে মাল্য ও নির্মাল্যের যুক্তবেণীতে কোন সংকট হয়নি। কামিনী রায়ের কাব্যের মূল সুর জীবন সঙ্গীত; তাই আছে প্রেমকথন, আছে বেদনাবোধ। রোমাণ্টিক বিষাদ উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কামিনী রায়ও এই বিষণ্ণতার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। আত্মচিন্তা, জীবনমুখিতা এই বিষাদের কারণ। দ্বন্দ্ব-মুখর জীবনের আনন্দ-বেদনা, পাওয়া না পাওয়ার সংগ্রাম কবির ভাবনাকে দ্বিধা-জড়িত, সংশয়াকুল করে তোলে : দুঃখের সুর প্রধান হয়ে ওঠে। 'আলো ও ছায়া' কবিকে রাতারাতি বিখ্যাত করলেও মোহাচ্ছন্ন করেনি। দীর্ঘ প্রশস্তি কাব্যরচনায় মাতিয়ে রাখতে পারেনি। অনেকগুলি বছর পার হয়ে গেল সংসার জীবনের বিধি কর্তব্যের মগ্নতায় তাঁর কাব্যজগত তখন অপ্রকাশের নীরবতায় স্তব্ধ।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'গুঞ্জন' শিশুর কাকলিতে মুগ্ধপ্রাণ মায়ের হৃদয়োচ্ছ্বাস। বন্ধস্রোত আবার মুক্তধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করল। 'মাল্য ও নির্মাল্য' সেই ধারার ক্রম। 'আলো ও ছায়া' এবং 'মাল্য ও নির্মাল্য, দীর্ঘ ব্যবধানে প্রকাশিত হলেও ভাব ও সুরের অবিচ্ছিন্নতা প্রবহমান। 'মাল্য ও নির্মাল্য' সেই হিসেবে 'আলো ও ছায়া'র পরিপূরক।

'মাল্য ও নির্মাল্যে' মাঙ্গলিকে আশা ও আনন্দের যে রাগিণী গাইলেন কবি, ভাবের দিক দিয়েও তা অভিনব ও সুন্দর।—

যে দেশে আছিস্ তোরা সৌন্দর্যের শেষ নাই
জরা সেথা শিশু যউবন,
পুরাতন নাকি সেথা, নূতনের চিরলীলা
জীবনের জনক মরণ।

'মাল্য'তেও এই সুর অব্যাহত, কবির দৃষ্টি প্রকৃতিতে মগ্ন,—তিনি দেখছেন,—

যেমন ঝরিছে ফুল, তেমনি ত্বরিত
বনলক্ষ্মী ফুটাইছে আর ;

তাই তাঁর আবেদন—

একসূত্রে জন্ম মৃত্যু, আনন্দ বেদন
মালা গাঁথি শ্রীচরণে দাও।

(মালা)

'করনা জিজ্ঞাসা' কবির নির্দ্বন্দ্ব প্রাণের অনুভূতির সুন্দর প্রকাশ। সুখ, দুঃখের, ভেদাভেদের প্রশ্ন তাঁকে ব্যাকুল করে না।

জানিনা এ স্নিগ্ধ সন্ধ্যাতে
অশ্রু কেন ওঠে আঁখি ভরি।
দুঃখ নয়, ইহা দুঃখ নয়,
এইটুকু জানিও নিশ্চয়।

(করনা জিজ্ঞাসা)

'কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়'[১] সুখ দুঃখের অতীত এক বোধের রাজ্যে মন তখন বিচরণ করে। অকারণ অশ্রুতে নয়ন আপনিই পরিপূরিত হয়—সুখ নয়, দুঃখ নয়, অন্য এক উপলব্ধি। 'করনা জিজ্ঞাসা'র কবি হৃদয়ানুভূতির আরেক বিশ্লেষণ করেছেন।—

ওগো প্রিয় মোর মনে হয়,
প্রেম যদি থাকে মাঝখানে,
আনন্দ সে দূরে নাহি রয়।

(করনা জিজ্ঞাসা)

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৮৫

কত স্বল্পস্থায়ী এই আনন্দের ক্ষণ। ঘন বিষাদে কবির জগৎ পরিপ্লুত হয়ে যায়।

সকলি আমার মানসের ভ্রম!
বিষাদ বিকল আঁখির ভুল?
আমার নয়নে সবাই কাঁদিছে
পৃথবীর বাতাসে শোকের ধূল।

(আমারি ভুল)

কোন্ এক অ-বলা ব্যর্থতার বেদনা কবির হৃদয় আচ্ছন্ন করে ফেলে। প্রকৃতির স্তরে স্তরে নৈরাশ্যের সুর তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে;—

কুসুম কহিছে মোরে, "বৃথায় ফুটিনু
কোমল নহিল তোর কঠিন হৃদয়।"
তটিনী কহিছে, "গাহি বৃথায় ছুটিনু
রয়ে গেলি স্রোতোহীন বদ্ধ জলাশয়।"

(তিরস্কার)

প্রেমের দ্বন্দ্ব, সংশয় তাঁকে আকুল করে তোলে মাঝে মাঝে। প্রথম যৌবনের স্বপ্নভঙ্গে বেদনার আভাস তাঁর কবিতায় মাঝে মাঝে ছায়াপাত করে।

'লুব্ধা'তেও এই সংশয়ের আভাস, এই ভালবাসার দ্বন্দ্ব। 'শৃঙ্খলিতা', 'বিস্মিতা', 'হৃতাভিজ্ঞান' এই কবিতাগুলি কবির সেই সময়কার অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞান। চাওয়া-পাওয়া-না পাওয়ার এক সংশয়ের মধ্যে কবির কালযাপন চলছে।

তুমি কি চেননা মোরে? কহ সত্যবাণী;
আমি যে ভেবেছি আমি তোমারে সুধাব।
তোমার কণ্ঠের স্বর, তব দৃষ্টিখানি
মনে হয় আমি যেন চিরদিন জানি।

(হৃতাভিজ্ঞান)

রবীন্দ্রনাথের, 'তারি সেই চাওয়া,
সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি চিনি আপনারে'[১]—এই প্রেমের বাণীর আভাস যেন উপরিউক্ত কথাগুলির মধ্যে শোনা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রভাবনার ঊর্ধ্বচারিতা এতে নেই। এ যেন মাটির বড় কাছাকাছি। বাস্তবের স্থূলতার আভাস—

তুমি কি জাননা, কোথা মোর জন্মভূমি;
না জানিয়া কুলশীল, ডাকিলে কি কাছে?
জনম পত্রিকা মোর, পড় নাই তুমি,
দেখ নাই কোনস্থানে কোন্ গ্রহ আছে?'

(হৃতাভিজ্ঞান)

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পূরবী, আহ্বান, পৃঃ ৬৯৯

অভিমান প্রেমকে আড়াল করে দাঁড়াতেই, কর্তব্যের দায় কঠিন হয়ে দেখা দিল। জীবনের প্রথম পদক্ষেপ যে নীতিশিক্ষা পেয়েছিলেন কামিনী, সে তাঁর রক্তধারায় মিশে গিয়েছিল। প্রতিকথায় আদর্শের বুলি। যে প্রেম কর্তব্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে এনে ভোলায়, তাকে তিনি কঠোর ভাষণে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন,—

তোমার মমতা অকল্যাণময়ী,
তোমার প্রণয় ক্রুর,
যদি লয়ে যায় ভুলাইয়া পথ,
লয়ে যাবে কতদূর ?
এই স্বপ্নাবেশ রহিবার নয়,
চলে যাও হে নিষ্ঠুর।

(কর্তব্যের অন্তরায়)

'দাঁড়াও,' 'হাত' কবিতাতেও একই সুর, দু'হাত দিয়ে ঠেলে দেওয়া। নীতি, কর্তব্য যতই চোখ রাঙাক, মন যে অবাধ্য-অবোধ্য। তার আবেদন সব কিছুর সীমা ছাড়িয়ে—নিয়ম, শৃঙ্খলারও বাইরে। রিক্ততার বেদনায় কবির কণ্ঠে আর্তনাদ—

আমার সমস্ত আকুল প্রাণ
"এস গো এস গো" এক আহ্বান
তাহার পানে।
দূরে যে রয়েছে দূরেই থাকে
টলে না তো প্রাণ প্রাণের ডাকে
প্রেমের গানে।

(চির দূরত্ব)

কিন্তু তারপরেই তাঁর মনে হয়, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন কখনই হয় না। আত্মার আত্মীয় এ শুধুই কথার কথা—এ কখনও সম্ভব নয়। জীবনের অনন্ত প্রবাহে ভাসতে ভাসতে দুটি হৃদয় কাছাকাছি হয়, স্পর্শও হয়ত করে পরস্পরকে, কিন্তু পরক্ষণেই দূরের ব্যবধান।

আত্মার আত্মীয় থাকে না আগে
হয় না পরে
কে কাহারে চেনে, চিনিতে চায় ?
স্রোতে ভেসে এসে পরশি যায়
মুহূর্ত তরে।

(চির দূরত্ব)

'ক্ষণমিলনে' রবীন্দ্রনাথের ঠিক একই কথা—একই সুরের প্রতিধ্বনি।

পরম আত্মীয় বলে যারে মনে মানি
তারে আমি কতদিন কতটুকু জানি।

অসীম কালের মাঝে তিলেক মিলনে
পরশে জীবন তার আমার জীবনে।[1]

এই ভাবনা যেমন রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব, তেমনি 'চিরদুঃখ' কামিনী রায়ের স্বীয় চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ। 'মাল্য ও নির্মাল্য' ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হলেও এর প্রায় সকল কবিতাই কবির প্রাক্ বিবাহ যুগের রচনা। সেই সময়কার চিন্তা, ভাবনা, আদর্শ কবিতার মধ্যে আপন মহিমায় রূপায়িত হয়েছে।

আশা ও শান্তির বিপরীত ধারা কবির হৃদয়কে অবিশ্রাম আন্দোলিত করে! প্রেমের বেদনা প্রকাশে তিনি নম্রনত। ধীরে, আপনমনে নিভৃত অন্তরের দুঃখ গীতি প্রকাশ করেন। যে কথা, যে ভাব মনে আসে, সরল ভাষায় তাই ব্যক্ত করেন। রেখে, ঢেকে কথা বলতেও পারেন না, প্রকাশের ভঙ্গীও সরল ঋজু।

তুমি শুধু একবার এসো,
শুধু একবার।
মুখ তুলি চাহি নাই কিছু
লাজে অভিমানে;
এ প্রাণের ব্যাকুল বাসনা
মিশে আছে প্রাণে।

(এসো একবার)

'একটি বাসনা' 'উপেক্ষিতা' কবির কুমারী হৃদয়ের আঘাত ও বেদনা-বাষ্পের নিরাবরণ প্রকাশ। মৃদুকণ্ঠের বিলাপ প্রাণকে ব্যথিত শুষ্ক করে তোলে। প্রথম জীবনের প্রস্ফুট ভালবাসা উপেক্ষিত, দলিত। বিভিন্নমুখী চিন্তায় তাঁর অন্তর নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত। আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকায় নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কখনও ভালবাসাকে বাসনা, প্রবৃত্তি মনে করে অন্তরকে শান্ত করতে চান। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করেন,—

আমি ভাবি ভালবাসা ভাল হইবার আশা,
পরের ভিতরে পেয়ে ভালর সন্ধান,
তার ভালটুকু নিয়া সঞ্জীবিত রাখি হিয়া
আপনার ভাল যাহা সব তারে দান।

(ভালবাসা)

'প্রতিভার প্রতি প্রেম' 'পঙ্ক ও পঙ্কজ'-এ কবি জাগতিক ক্ষুদ্র সুখ, চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব থেকে নিজেকে ঊর্ধ্বায়িত করেছেন। ক্ষমা ও মহত্ত্বে, হৃদয়ে মহানুভবতার বিকাশে কবিতা দুটি সুন্দর ও উজ্জ্বল। অবহেলিত প্রেমের বেদনায়, ভাগ্যের পরিহাসে যে বাদল নেমেছে তাঁর মনে, সেই ধারাবর্ষণে কবির মাল্য রচনা। কিন্তু শেষ চরণে এসে তিনি আত্মস্থ হয়েছেন। 'আশীর্বাদ' থেকেই তাঁর আত্মশক্তির

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, 'ক্ষণ মিলন', চৈতালী, পৃঃ ৫৫৫

সঙ্গে পরিচয়। অক্টোবরে কবি বোধহয় নিজের জন্মদিনের কথাই বলেছেন। পিতামাতার পূত আশীর্বাদ তাঁর জীবনের দুঃস্বপ্ন থেকে জাগিয়ে দিয়েছে। 'কবির কামনা' 'আত্মবিস্মৃতি'তে ঘুমভাঙা প্রভাতে নতুন দিনের পথ রচনা। জীবনের অর্থ ফিরে পেয়েছেন, আত্মবিস্মৃতির মোহ ঘোর কেটে গেছে। জীবন ভরেছে আনন্দে ও গানে—

মধুর প্রভাত বেলা
তরুণ জীবনে অরুণ কিরণে
করিতে করিতে খেলা।
নূতন আশায় ভরিয়া উঠিল, কহিল নূতন ভাষ,
চারিদিকে তার ফুটিল সহসা, ছিল যাহা অপ্রকাশ।

(কোথায় ছায়া)

জীবনের লাবণ্য ও সুষমা প্রত্যাগত। আনন্দের জোয়ারে মগ্ন তিনি। জগৎ ও জীবন যে আনন্দে পরিপূর্ণ সে উপলব্ধিতে মন পূর্ণ—

অনুভবি কেবল জীবন,
অতীত সে হয় অন্তর্ধান,
নেহারি অনন্ত বর্ত্তমান,
অমৃত পূরিত ত্রিভুবন।

আধঘুমে

'আধঘুমে' তেরটি কবিতার সংকলন, 'মাল্য ও নির্মাল্যে'র দুই খণ্ডের মধ্যে সেতুবন্ধন। এই ত্রয়ী কাব্যধারার মধ্যে ভাবনার অবিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান। জীবনে তাঁর বহু শুভ সংকল্প আছে। তাতে বাধা পড়লেই জেগে ওঠে পুঞ্জিত ব্যথার অভিমান। বাইরের জগতে যখন জীবনের প্রবাহ, তখন কবির সময় কাটে অর্ধ-জাগরণ ও অর্ধ-নিদ্রায়, চেতনা ও সুষুপ্তির মধ্য সীমায়। কিছু না করতে পারার দুঃখ কবিকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। মনে তাই নিরন্তর নিরাশার গভীর দুঃখ।

যাহা পেতে চাই, যাহা হাতে পাই
সদা ভিন্ন এ উভয়
বাঞ্ছিত প্রাকৃত স্বপ্ন জাগরণ
কোথা গেলে এক হয়?

(আধঘুমে—২)

কবির এ বেদনা-ভরা উক্তি রবীন্দ্রবাণীকে স্মরণ করায়—

'যাই চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।'[১]

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, উৎসর্গ ৭, পৃঃ ৮১

কবির হৃদয়ে সংকল্প আছে অনেক, কিন্তু পূর্ণতার সন্ধান পান না তিনি। অন্তরের বেদনা গুমরে মরে নিজের ভিতরে, আপনাকে পূর্ণ করার সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নাই কিংবা সাধনা নাই। মনের গভীর দুঃখের কথা মুখের ভাষায় মাঝে মাঝে প্রকাশ হয়,

আমি এ অতৃপ্ত অপূর্ণ আমি
আমার সম্পূর্ণ আমারে চাই
দেবের প্রসাদে যাহা হতে পারি—
আজিও আমি তাহাতে নাই।

(আধঘুমে- ৩)

অন্তরের অন্তঃস্থলে শক্তির প্রার্থনা চলে, জীবনের স্রোতে আপনার স্বপ্ন ও সাধনাকে রূপ দিতে চান। আশা পূর্ণ হয় না অন্তর্যামীর কাছে ভগ্ন হৃদয়ের প্রার্থনা—

হে সুন্দর তব অনুরাগে
দিব ঢেলে যদি কাজে লাগে
বিন্দু বিন্দু জীবনের লোহ।

(আধঘুমে—৫)

অন্তরের অন্তরে চলে তাঁর প্রেমময়ের জন্য প্রতীক্ষা। একদিকে প্রেমসাধনা, অন্যদিকে জগতের কর্মযজ্ঞে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া—এই তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষা। এখানে ব্যাঘাত ঘটলেই হৃদয় বেদনার্ত হয়ে ওঠে। 'আধঘুমে'র শেষের কবিতা-গুলিতে স্বপ্নভঙ্গের বেদনার সুর—

আজ এই বড় দুঃখ, তুমি ফিরে এসে
আমারে হেরিলে রূপে আরো হীনতর
তবু তো এসেছ তুমি, আমি অনিমিষে
দেখিতেছি শতগুণে তোমারে সুন্দর।

(আধঘুমে—১২)

হৃদয় ভেঙ্গে যায়, দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা ব্যর্থতায় অবসান, তবু শোভন-হৃদয়া তিনি শান্ত-স্মিত মুখে সব সহ্য করেন। মান নেই, অভিমান নেই, অভিশাপ নেই, অতি প্রিয়জনকে জীবনের পথে এগিয়ে যাবার উৎসাহ তাঁর কণ্ঠে। শেষের কবিতা কয়েকটিতে শুধুমাত্র প্রিয়ের উদ্দেশে মৃদু-উচ্চারিত সঙ্গীতে 'আধঘুমে'র নিবেদন শেষ করেন।

নির্মাল্য

'নির্মাল্য' সত্যিই নির্মাল্যের মত পূত, শুভ্র। অনাঘ্রাত কৌমার্যের প্রেম-জীবনের আদর্শ অম্লান দীপ্তিতে বিকশিত। কয়েকটি উপকথা, কাহিনী রচনায় আদর্শ প্রেম, পাতিব্রত্য সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন।

কহিছে কোবিদ 'ভুজঙ্গী রমণী
প্রত্যয় কর না তায়,
সুলভ প্রণয় বস্ত্র অলংকারে
তার কাছে কে না যায়।'

(উপকথা, নির্মাল্য)

নারী সম্বন্ধে বিজ্ঞজনের এই মহাজ্ঞানের পরীক্ষা করতে এল রাজার নন্দন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায়।

ভাবিল কুমার জগতের মাঝে
আছয়ে যতেক নারী,
বসন ভূষণে বাঁধা প্রতিপদে ?
বিস্ময় হইছে ভারী।

(ঐ)

কৃষকবেশী রাজপুত্রের হৃদয় কৃষক-তনয়ার প্রেমে স্নিগ্ধ হল। উন্মুক্ত ভালবাসায় তার অন্তর পরিপূর্ণ। শেষ পরীক্ষার জন্য রাজধানীতে ফিরে গিয়ে দীর্ঘদিনের অবসানে দাস, দাসী, চৌদোলা পাঠিয়ে দিয়েছে তাকে সসম্মানে নেবার জন্য। কৃষক-বধূ কৃষক-স্বামীর প্রতীক্ষায় দিন কাটায়। রাজবধূরূপে সকলে এসে প্রণাম জানায়, হতচকিত কৃষকবালা চিঠি পায়—

"মরেছে কৃষক যুবরাজ প্রিয়া
তুমি এবে"

(ঐ)

যুবরাজের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করে সাধ্বী রমণী পতির খড়মজোড়া নিয়ে অনুমৃতা হল। কৌতুকে উল্লাসে যুবরাজ যখন এলো, তখন তার প্রিয়া পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

চিতাভস্ম হেরি হাসে ম্লান হাসি
দ্বাদশীর নিশি শেষ

(ঐ)

'তিন কন্যা'র উপাখ্যানেও প্রেমের সুন্দর বিশ্লেষণ। দেব দেউলে তিন কন্যার প্রার্থনা—প্রথমার রূপ প্রার্থনা, রূপ যৌবন দিয়ে একটি হৃদয়ে অধিকার নেবে।

'চাহিনা দেবত্ব, অশ্ব গজ ভূমি
একটি হৃদয়ে রাজত্ব চাই।'

এ যেন সেই চিত্রাঙ্গদার প্রার্থনা।

দ্বিতীয়ার প্রার্থনা একই স্তরের। তার রূপ আছে। সেই রূপ যেন অক্ষয় হয়ে দয়িতের মন চিরদিন আকৃষ্ট রাখে। তৃতীয়া শুভারমণী। প্রেমই তার আদর্শ। তার প্রার্থনা, (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়)—

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালবাসায় ভোলাব
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো না গো
গান গেয়ে দ্বার খোলাবো।[১]

তাই অঞ্জলি ভরে পুষ্পার্ঘ দিয়ে নিবেদন জানায়—

দেহে যারা আছে থাক কিংবা যাক্
কিছুতে না কিছু আসে না যায় ;
প্রাণেশের হিয়া প্রেমে ভরা থাক্
এ মুখ সুন্দর রহিবে তায়।

(তিনকন্যা)

'ইন্দু ও যামিনী'ও একটি সুন্দর কাহিনী। একাদশী সুন্দরী কুমারী ইন্দু মহাভারতের কাহিনী শুনে শুনে স্বয়ংবরা হতে আকাঙ্ক্ষা জাগে। বাস্তব-অনভিজ্ঞা কিশোরী স্বপ্নের জাল বোনে। মালা গেঁথে আকাশের গায়ে কল্পিতজনের গলায় পরাতে গিয়ে ধুলোয় লোটায় সে মালা। সে কুলীন কন্যা, তার স্বপ্ন এ জীবনে কোনদিনই পূর্ণ হবে না। অভিজ্ঞা মাসী তাকে সস্নেহে বোঝায়। কুলীন কন্যার অনিবার্য গতি স্বরূপ মাসী, বোনঝি দুজনেরই বৃদ্ধপতি জোটে। কুমারীত্ব ঘুচিয়েই পতিদের প্রস্থান। মাসী জানে এই নিয়তি, মেনে নেয় জীবন। কিন্তু ইন্দু স্বপ্নভরা মন নিয়ে অকালে শুকিয়ে যায়।

. প্রেম চিন্তায় বেশীক্ষণ তন্ময় থাকতে পারেন না কবি। কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁকে সচকিত করে তোলে। আদর্শ থেকে, কর্মৈষণা থেকে বিচ্যুত বলে ম্রিয়মান হয়ে পড়েন ;—

বর্ত্তমান দশা মোর, অনেকের মত
চলি ফিরি করি কাজ ; হায় কাজ মোর
ভেবেছিনু আর কিছু মহত্ উন্নত,
চেয়ে দেখি হাতে মোর শৃঙ্খল কঠোর।

(যত যায় দিন)

কিছু করতেই হবে ; জীবনকে ব্যর্থ, উদ্দেশ্যহীন হতে দেবেন না—এই তাঁর সংকল্প। বড় হোক, ছোট হোক সেই কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে হবে—এই তাঁর সংকল্প, তবেই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা—

যাই করি কিছু যেন করি,
স্বপন না ভাল লাগে আর
সাধিয়া একটি ক্ষুদ্র ব্রত
সাঙ্গ হোক জীবন আমার।

(আকাঙ্ক্ষা)

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড

জগতে কোন কাজই ছোট নয়। যে কোন কাজকেই জীবনের ব্রত হিসাবে নেওয়া চলে। এখানে মক্ষমূলরের কথা উল্লেখযোগ্য। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ স্থাপনের সময় উপদেশ যাচঞা করিয়া মক্ষমূলরকে পত্র লেখা হইয়াছিল। মক্ষমূলর সেই পত্রের উত্তরে নবীন পরিষৎকে কয়েকটি ছোট খাট উপদেশ দিয়াছিলেন। একটা উপদেশ এইরূপ ;—বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক গ্রামের ও প্রত্যেক নদনদী বিল খাল প্রভৃতি নাম সংগ্রহ করিয়া সেই সেই নামের উৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা পরিষদের একটা কর্তব্য হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য যে, কাজটা অতি ছোট ; এবং আমাদের পরিষৎ এ পর্যন্ত এত ছোট কাজে হস্তার্পণ করিয়া আপনার মহত্বকে সংকুচিত করিতে সাহস করেন নাই।"[১]

যাঁরা নিজেদের পদমর্যাদা নিয়ে দূরে থেকে, অন্যদের কৃপা ভিক্ষা দেন, অপরের শ্রদ্ধা কাড়েন, কবি তাঁদের কেউ নন। তিনি রবির কিরণ, চাঁদের আলো, দখিন হাওয়ার মত সুলভ হয়ে সকলের মধ্যে বিরাজ করতে চান।

সকলের জন্য প্রীতি, মমতা সমভাবে বর্ষিত বলে, কবি সকল জনের দুঃখ বেদনা আপন হৃদয়ে অনুভব করেন। 'নীরবে', 'ভুলচুক', 'সংসারজ্ঞান', 'বিদেশী', 'আক্ষেপ', 'ঊষার মরণ', বিচিত্র ব্যথাভার কবির হৃদয়কে উতলা করে তোলে।

বিফল স্বপন ভরা, নিতান্ত দুঃখের ধরা,
প্রেম পুণ্য স্বরগের, এ দেশের নয়,
দেখিয়াছি রঙ্গমাঝে গরিবেরে রাজ সাজে
মানবের জীবনেও সেই অভিনয়।
(সংসার কাজ)

আনন্দ-বেদনা, হাসি অশ্রু চিরদিন তাঁর মনে যুগপৎ আলোছায়া বিস্তার করেছে। সকলের হাসিভরা মুখ দেখে তাঁর হৃদয়ে আনন্দের ধারাবর্ষণ হয়েছে। আনন্দ-গান এ জগতে চিরস্থায়ী নয়। ব্যথা বাষ্প ছেয়ে ফেলে চার দিক, জগতের দুঃখে কবি-হৃদয় অশ্রুমুখী হয়ে ওঠে। বেদনা ও হর্ষগীতি ক্রমান্বয়ে ধ্বনিত। যে ভাব হৃদয়ে ওঠে, তাই সরল মনে সরল ভাবে প্রকাশ করেন। ছন্দ-ভাষা কোন-দিকেই দৃষ্টি দেন না। কাজেই তাঁর কবিতায় সর্বদাই একটি সরলতত্ত্বের সহজ প্রকাশ। 'মিলন-মহত্ত্ব', 'সৌন্দর্য ও ভালবাসা', 'আমাদের কেহ তুমি নও', 'সংশয়' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে প্রেমের আনন্দ ও বিস্ময় ; কখনও বা পাওয়া-না-পাওয়ার স্বন্দ্ব। 'নির্ণয়', 'নববর্ষ'তে আশার সংগীত। আবার তিরস্কারে তাঁর পরি-বর্তিত সুর—

পশ্চিমে আশার রবি ডুবেছে আমার,
ঢাকিছে জীবন ক্রমে গাঢ় অন্ধকার—

'বুঝি বা হল না', 'সম্মুখ ও পশ্চাৎ', 'প্রবাসে' একই মানসিকতায় রচিত।

১। চরিত কথা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পৃ. ৬৮

মানব প্রেম, মানুষের সুখে দুঃখে কবির দৃষ্টি ঘন নিবদ্ধ। কবির মন দুর্গতদের জন্য সদাব্যথিত। জীবন-লীলা অতিক্রম করে প্রকৃতির দিকে যখন দৃষ্টি পড়েছে, তখন কবির নয়ন তন্দ্রাহারা। মুগ্ধ হৃদয়ের স্বতোৎসারিত কথা—

বিশাল প্রকৃতিগ্রন্থ, প্রাণ তৃপ্তিকর,
উজ্জ্বল বরণ চল করি অধ্যয়ন।

(শারদীয়া-নির্ম্মাল্য)

অথবা, ভাবাবেগে বলেন,—

এ সৌন্দর্য্য, এ আনন্দ আমার মাঝার
রহিবে না চির দিন ? পাইবে কি লয় ?

(আকাঙ্ক্ষা-নির্ম্মাল্য)

'যমুনা-কল্পনা' অতীত-স্মৃতি মন্থন ও সৌন্দর্য্য-প্রীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'সাহিত্যে'র প্রথম বর্ষে এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়। তাই পাঠ করে মুগ্ধ হৃদয় কবি-বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ সেন লিখেছিলেন, "স্ত্রী কণ্ঠে এমন সুন্দর সংগীত খুব কম শুনিয়াছি।"

'যমুনা' নামে একটি কবিতা লিখে তাঁর প্রীতি মুগ্ধ হৃদয়ের নিদর্শন স্বরূপ কামিনী রায়কে উপহার দিয়ে ছিলেন। 'সাহিত্যে'র দ্বিতীয় বর্ষের আষাঢ় সংখ্যায় কবিতাটি মুদ্রিত হয়।[১]

'যমুনা-কল্পনা'য় পুণ্য সলিলা যমুনার তীরে দূরাতীতের কথা স্মরণ করে ভগ্ন-হৃদয়েরও বটে, আবার রূপমুগ্ধতায় নিবেদন রেখেছেন কবি। এর সর্বাঙ্গই সুন্দর ; শেষাংশ রূপে, ভাবে দ্বিতীয়াহীন।

ধীরে ঊষাকর ধরি সেই পুণ্য জলে
নামিয়া করিব স্নান,
আমি সেই বারি গানে বিশ্বের পীরিতি
অমিয় করিব পান।
কাল প্রভাত মারুতে, অরুণ কিরণে
কালিন্দীর শ্যামকূলে
বুঝি ধরার বাঁধন আঁখি হতে মোর
সহসা যাইবে খুলে।

(যমুনা-কল্পনা)

দেবেন্দ্রনাথের উপলব্ধির গাঢ়তা কবিতাটিকে মূল্যাতীত করেছে। এর রূপ-মাধুরী বহুগুণে বর্ধিত। কবির মন যেন যমুনাতীরে ভ্রমণরত। 'দিল্লী', 'স্মৃতি চিহ্ন', 'সাজাহান', 'প্রাচীন কীর্ত্তি দর্শন' প্রভৃতি তারই চিহ্ন। 'প্রিয় গ্রন্থগণের প্রতি' কবির সরল মনের সরল ভাব প্রকাশ। সৌন্দর্যের বিশাল রাজ্যে তাঁর মন

১। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল। রূপ-দর্শনে তৃপ্ত হিয়া ফিরে এসেছে আপন গৃহে। দৃষ্টি পড়েছে চিরসাথী গ্রন্থগণের প্রতি। তাদের প্রতি প্রীতি সম্ভাষণে আপন হৃদয়-ভাব প্রকাশ করেছেন।

নয়নেতে লয়ে গেনু তোমাদেরি আলো,
করিয়া হে পথ প্রদর্শন,
তোমাদের প্রাণ লয়ে বাসিয়াছি ভাল,
চিনিয়াছি প্রিয় অগণন।
বাহিরিয়া, তাহাদের পেয়ে পরিচয়
তোমাদের চিনেছি আবার,
জগতে বিফল দান যাইবার নয়,
দিলে শোধ দুনা পাবে তার।
(প্রিয় গ্রন্থগণের প্রতি)

'দীনের বাসনা' কবিতাটি কবি হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদনে সত্যই নির্মাল্য হয়ে উঠেছে। তাঁর রাজাও রবীন্দ্রনাথের রাজার মত বিশ্বাধিপতি—রাজাধিরাজ।

শুনাও বচন তব, মস্তকে আমার
আশীর্ব্বাদ হস্ত তব রাখ স্নেহভরে ;
তব রূপ, স্পর্শ তব, স্বর মধুময়,
জানাইবে কাছে তুমি, জননী আমার। (দীনের বাসনা)

'পিতা তুমি', 'অভাব কি থাকে অপূরণ ?' কবিতাদ্বয়ে কবির সারা প্রাণ যেন অঞ্জলি হয়ে পরম পিতার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে।

তুমি প্রভু আমি দাস তব,
জীবন নিজস্ব মোর নয়,
যাহা আজ্ঞা শিরে ধরি লব,
তুমি জান কিসে ভাল হয়।

এই আকুল প্রার্থনাতেই নির্মাল্যের সার্থকতা।

॥ গুঞ্জন ॥

১৩১১ সালে প্রকাশিত 'গুঞ্জন' শিশুরাজ্যের কবিতা। ছড়ার ছন্দ ও সুরে শিশুরাজ্যের প্রবেশ দ্বার খুলে দিয়েছেন কবিজননী। এক জননী রচনা করে অন্যান্য মায়ের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। বাৎসল্যের মাধুর্যে ভরা উৎসর্গ পত্রটি নতুনত্বের স্বাদ এনেছে।

যে ঘরেতে ছেলে কোলে বসে আছে মা,
যেথায় শিশুরা ঘিরে মার চারিধার।
আমার গুঞ্জন গান সেইখানে যা,
মায়ের আশা, শিশুর ভাষা কে বুঝিবে আর ?
(উৎসর্গ, গুঞ্জন)

'প্রভাতী' কবিতা থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী যে কোন কবিতা পাঠ করলেই বোঝা যায়, মা ও শিশুর এ এক আলাদাজগৎ। অন্য কেউ এই স্বর্গীয় সুষমা পরিপূর্ণ উপলব্ধি করতে পারবেন না। তাই বালগোপালদের জননীর করে এই গ্রন্থ সমর্পণ।

'প্রভাতীতে কান পাতলে শোনা যাবে, প্রভাতীর মঙ্গলরাগ মৃদু নিনাদিত। প্রকৃতির প্রসন্নতা যেন কবিতাটির সর্বাঙ্গে জড়ানো। 'ঘুমের দেশে গান' এ মায়ের অশেষ স্নেহ, ব্যাকুলতা অক্লান্ত ধারায় বর্ষিত—

তোমার তরে আমার সে গান, শুনবে না আর কেউ
তোমার প্রাণে লাগবে গিয়ে আমার প্রাণের ঢেউ।

প্রতিটি কবিতায় বিগলিত মাতৃত্ব স্বমহিমায় প্রবাহিত। স্বীয় ঘরের ছোট্ট মেয়ে বুলবুলের প্রতি উৎসারিত স্নেহ ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে বনের বুলবুলটির জন্য মার হৃদয় করুণাসিক্ত করেছে।

মানুষ জননীর কণ্ঠে স্নেহ ঘন সুর—
"মা বাপ এল মনে করি অন্ধ ছানাগুলি
মাথা তুলি খাবার আগে আছে মুখ খুলি।"

(বনের বুলবুল, গুঞ্জন)

এই বাৎসল্যের প্রকাশ ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যের একটি বিশেষ অংশ। হেমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী, মানকুমারীর কাব্যের প্রধান অংশ গড়ে তুলেছিল। হেমচন্দ্রের শিশুর হাসিও স্বর্গের অমিয়মাখা।

আয় আয় আয় শিশু, অধরে ফুটায়ে
অই স্বরগের ঊষা
ঐ অমরের ভূষা
তুলিয়া হৃদয়ে দেরে মানবে ভুলায়ে।[১]

সন্তান স্নেহে আত্মহারা জননীর সমস্ত চিন্তা ভাবনা তার শিশুকে কেন্দ্র করে একটা নতুন জগতের সৃষ্টি করেছে। সমস্ত জগৎ যেন শিশুতে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

ওরে আমার বুলবুলিটি আমার বুকের ধন,
বল তো তোরে কোথায় রেখে তৃপ্ত হবে মন।
চোখের চাউনি, ভুরুর ভঙ্গি হাসির ঢেউগুলি,
কাঁদবার তরে ঠোঁট ফুলানি, সোহাগ বিজুলি।
সবটুকু দেখে দেখে ভরি রাখি প্রাণে,
এ শোভা যে না দেখেছে, সে কি সুখ জানে।

(ঘরের বুলবুল)

১। শিশুর হাসি, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊনবিংশ শতকের গীতি কবিতা সংকলন, পৃঃ ৩৮৮

এই পংক্তিগুলি ছড়ারাজ্যের মা ও শিশুর কথা মনে করায়। পুত্র গর্বে গরবিনী মার কত কথা মনে আসে।

এ ধন যার ঘরে নাই
তাদের কিসের জীবন।
তারা কিসের গরব করে
আগুনে পুড়ে কেন না মরে।[১]

পুত্রহীনা জননীর জীবন ব্যর্থ। সংসারে তার বেঁচে থাকাই অন্যায়। পুত্রবতী মা আগুনে পুড়ে মরার পথ বাতলে দেয়।

প্রজাপতির ফুলে ফুলে বিহার, আকাশ জুড়ে পাখীর রাজত্ব—দেশ-বিদেশে আনাগোনা, জলের মধ্যে মাছের প্রতাপ—বিস্তীর্ণ এদের এলাকা কিন্তু যত বড়ই এদের বিচরণস্থল হোক, পুটুরানীর মত স্বর্গসুখ কারোর নেই। মায়ের বুকে তার মহারাজত্ব—এর তুলনা কোথায়!

এই নাড়ী ছেঁড়া ধনদের জন্য কত ভাবনাই রেখে গেছেন মা, দিয়েছেন পথের সন্ধান—

প্রাণটা যে দেয় দেশের তরে
মারে মরে ভালই করে
পরে দেশটা লুটে খাবে
তা কি প্রাণে সয়?

(দেশের তরে)

গভীর চিন্তা নেই, কোন উচ্চ ভাবনা নেই। ছোটদের রাজ্যে ছোটদের উপযোগী কথোপকথন। কখনও গর্ব কখনও অকারণ পুলক, কখনও ছোটখাটো উপদেশ। সাধারণভাবে জীবনের পরিচয়।

'আপনার দাম', 'আপন উপরে' কবিতাগুলিতে ছোট ছোট উপদেশ নীতি কথায় ভারাক্রান্ত না হয়ে স্বীয় দীপ্তিতে বরং উজ্জ্বল হয়েছে।

আমা হ'তে কিছুই হবে না
'বলে' যারা করে হায়, হায়,
আপনার অপমান করে
বিশ্বাস করে না বিধাতায়।

(আপনার দাম)

এরা যেমন অপদার্থ, তেমনি জীবন সার্থক তাদের,—

আপন উপরে যারা ভর করে,
পর মুখ নাহি চায়,
ধন্য তাহারা ধন্য!—যারা পরমুখ নাহি চায়!

(আপন উপরে)

১। হাসি খুসি, ১ম ভাগ, যোগীন্দ্রনাথ সরকার

'নূতন শিশু', 'দিনে দিনে', 'মিঠা' একটি নবজাত শিশুর জন্ম থেকে একটু একটু করে বড় হয়ে ওঠার অ্যালবাম। আর আছে মায়ের হৃদয়ের অমৃত-বর্ষণ।

নূতন শিশু ঘরে এল, দেখবে এস সবে,
সযতনে নূতন জনে কোলে তুলে লবে।

(নূতন শিশু)

ছোট ছোট শিশু দেখে, তাদের আধ আধ কথা শুনে যেমন আমরা এক ধরণের স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করি, 'গুঞ্জন' পাঠেও সেই মনোভাব হয়।

অতি ছোট, দুধ খায়, শুয়ে মার কোলে ;
ছ' মাসের মার পাশে বসে' বসে' দোলে ;
দশ মাস, হামা দিয়া হেথা সেথা যায় ;
বছরের, মার হাত, ধরিয়া দাঁড়ায়।

(দিনে দিনে)

এই একই ভাব, একই কথা দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যক্ত করেছেন তাঁর 'মন্দ্রে'র 'আগন্তুকে'—

সব দুঃখ- দৈহিক যন্ত্রণা কিংবা ক্ষুধা
সব সুখ- পান করা মাতৃস্তন্য সুধা

দ্বিতীয় অঙ্কেতে তুমি দাও হামাগুড়ি,
বেড়াও রে চতুষ্পদ ঘরময় জুড়ি'।

... ...

তৃতীয় অঙ্কেতে গিয়া
একেবারে চতুষ্পদ অবস্থা ছাড়িয়া
দ্বিপদে উত্তীর্ণ তুমি।[১]

মা ও শিশুর কথা ও ভাবনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'ও সৃষ্ট। কিন্তু রূপে, স্বাদে 'গুঞ্জন' থেকে তা অনেক আলাদা। রবীন্দ্রনাথের শিশুর স্থান মায়ের কোল থেকে আরম্ভ করে সর্বত্র—জগৎ পারাবারের তীরে তারা খেলা করে। এই শিশুদের জন্য রবীন্দ্রনাথ সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন—

ইহাদের করো আশীর্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটে শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সম্বাদ,
ইহাদের করো আশীর্বাদ।[২]

মা ও শিশুর চিরন্তন আলাপে তাদের মধুর সম্পর্ক বিচিত্র ভাবনা দিয়ে রচিত 'শিশু' কাব্যটি অনন্য।

১। দ্বিজেন্দ্র রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, 'মন্দ্র' পৃঃ ৩৩৫
২। রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড

খোকা মাকে শুধায় ডেকে,
'এলেম আমি কোথা থেকে
কোন খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'[১]

সরল শিশুর এই সহজ প্রশ্নটি দর্শনের গূঢ় তত্ত্ব। মার উত্তরও তেমনি অনবদ্য।

'ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।'[২]

হাজারো প্রশ্নে শিশুর মন ভাবনা-উতল। মাকে জড়িয়ে তার চিন্তা, ভাবনা; মায়ের কাছে সকল প্রশ্নের সদুত্তরের আকাঙ্ক্ষা। মা ও সন্তানের স্নেহ কামনায় উদগ্র চিত্ত—দোষে গুণে খোকা যে তার অন্তরের ধন। দোষ গুণের বিচারও তার হাতে।

তোমার শাসন আমরা মানি নে গো।
শাসন করা তারেই সাজে
সোহাগ করে যে গো।[৩]

খোকার রাজ্য অসম্ভবের রাজ্য, কত উদ্ভট কল্পনা, কত অকারণ-অবারণ চিন্তা মাকে ঘিরে আবর্তিত।

সেখানে মায়ের বাসা বাঁধতে ইচ্ছা করে, খোকার মনের হদিস পেতেও তার ব্যাকুলতার অন্ত নেই।

'গুঞ্জন'-এর চিন্তা এমন বিশ্বব্যাপী নয়। এমন সর্বজনীন নয় এর আবেদন। ছোট্ট নীড়ের সুখ দুঃখ দিয়ে মা ও শিশুর লীলা। এখানকার হাসি, কান্না, সুখ দুঃখে মায়ের মন নিয়ত আলোড়িত।

পীড়িত শিশু নিয়ে মায়ের দুশ্চিন্তার অবধি নেই। মায়ের কোল শূন্য করে চলেও গেল একদিন। মায়ের বেদনার্ত হৃদয় কেঁদে বলে,—

কেন এল, কেন গেল
কোথা গেল চলে?
ফের কবে দেখা হবে
কে দিবে গো বলে?

(কবে কোথায়)

সন্তান হারানোর ব্যথা যতই মর্মান্তিক হোক, তবুও শান্ত-সংযত জননী নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেন—

বুকে করে রাখ স্মৃতিটুকু তার
সুখে দুঃখে রোগে শোকে

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড
২। " "
৩। " "

আশা করে থাক, হয়তো আবার
দেখা হবে অন্য লোকে।

(তাহার কল্যাণ হোক)

গুঞ্জরণের মধ্যেই 'গুঞ্জন' ধ্বনিত। আনন্দের দিনেও মায়ের মনের হর্ষোচ্ছ্বাস উচ্চ নিনাদিত নয়: আবার দুঃখের ঝড় যখন এলো, তখন দেবতার ধন তিনি ফিরিয়ে নিয়েছেন ভেবে মনকে শান্ত করার চেষ্টা।

॥ অশোক সঙ্গীত ॥ (১৯১৪)

কিশোর পুত্রের অকাল বিয়োগে জননীর করুণ বিলাপ এই 'অশোক সঙ্গীত'। তাঁর গভীর দুঃখের মর্মবেদন বিশ্বপিতার পায়ে নিবেদিত। হৃদয়ের শূন্যতার ব্যাপ্তি সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিফলিত দেখতে পাচ্ছেন তিনি। তাঁর চোখে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করে শ্মশানের চিতানল প্রজ্জ্বলিত। তাঁর মনে হয়,

নিষ্ঠুর সৌন্দর্য আজ মুখে প্রকৃতির,
মমতা বিহীন হাস, উপহাস তার,
দ্বিগুণ ব্যথায় ভরে ব্যথিত হৃদয়,

(অশোক সঙ্গীত-১)

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে এতই ভালবাসতেন যে, কোন অবস্থাতেই তাঁকে নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর মনে হয়নি। তাঁর মুক্তি ছিল 'আলোয় আলোয় এই আকাশে,— ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।'[১] প্রিয় দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর পুত্র শোকাতুরা কন্যা মীরাকে লিখলেন, "শমী যে রাত্রে চলে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে. আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল।"[১]

শমী তাঁর অতি আদরের পুত্র; সমস্ত শান্তিনিকেতনের প্রাণ। সেই শমী বেড়াতে গিয়ে অকালে চলে যাওয়াতে কবি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। সারা অন্তর জুড়ে ছিল শমীর স্মৃতি। সে পরিচয় তাঁর বৃদ্ধবয়সেও পাওয়া গেছে। ধীর, প্রশান্তভাবে মৃত্যুর এই কঠিন দণ্ড সহ্য করেছেন। 'স্মরণ' এর পরে আর শোক গাথা রচনা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই, তাঁর তুলনা কারোর সঙ্গে চলে না। বিশেষ করে নারীর জগৎ সীমিত, খণ্ডিত। চার বছর আগে কামিনী রায়ের স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। শোকার্তা কবির সেই ব্যথা উপশম হবার আগেই আবার সন্তান বিয়োগের গভীর দুঃখ। একা একা মৃত্যুর এই তীব্র বেদনা সইতে হয়েছে। পুত্রহারা জননী তাঁর অন্তরের গভীর শোককে কবিতার স্তবকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ৫৮টি সনেটে এটি একটি শোককাব্য। প্রতিটি সনেটে মাতৃহৃদয়ের

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১০৮, সংখ্যা ৩৩৯

আকুলতা, আবেগ প্রতিফলিত। ভাষায় নেই কোন আড়ম্বর, ছন্দ, অলংকারের পারিপাট্য নেই—মনের কথা সহজ ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ছাপানো সেই সমস্ত কবিতা, তবু তাতে ভক্তকণ্ঠের পরিপূর্ণ নম্রতা—

তুমি শক্তিমান
দিতে পার, নিতে পার ;—দিয়াছিলে তাই
অতুল সৌভাগ্য মম। তবু দুঃখ পাই
কেড়ে নিলে বলে' মোর ; হে ঐশ্বর্য্যবান,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান তব—প্রাণের সন্তান।

(অশোক সঙ্গীত-২)

এখানে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চিত্রাঙ্গদার আর্তনাদ যেন প্রতিধ্বনিত।

"একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়, দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষা হেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূল্য রতন ?"[১]

মিল থাকলেও এ দু'য়ে পার্থক্য অনেক। প্রথমটায় কবির ব্যক্তিগত শোক অশ্রু হয়ে ঝরেছে প্রতিটি অক্ষরে ; দ্বিতীয়টি মহাকাব্যের কাহিনী ; কবির কল্পনা। তবু মধুসূদনের অসাধারণ প্রতিভায় 'শোকের ঝড় বহিল সভাতে'।[২]

অশোক সঙ্গীতের তৃতীয় কবিতায় মায়ের কল্পনাতে পুত্রের ক্ষুদ্র জীবন যেন পুষ্পের মত পূর্ণতা ও পবিত্র সৌন্দর্যে দেব-মহিমা লাভ করেছে।

"দুদিনের তরে
এসেছিল, রে দুঃখিনি, তোর ভাঙ্গাঘরে
দেবতা সে।"

অথবা—

"পুষ্প জন্ম দুদিনের, সৌন্দর্য্যে সৌরভে
সে ছিল পুষ্পের জ্ঞাতি।"

৪, ৫, ৬, ৭ সংখ্যক প্রতিটি কবিতায় একই ভাব ব্যঞ্জনা। স্বর্গ থেকে খসে পড়া একটি তারা তাঁর পুত্র। দেবতার সন্তান, দেবজ্যোতি নিয়ে কয়েকটি বছর মর্ত্য জীবন কাটিয়ে গেছে। মার ধারণা, আপন ভেবে দেবভোগ্য উপচারে তার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করেননি, তাই হয়ত বিধাতার রোষ। ধনীগৃহের বিতাড়িত দাসীও চুরি করে দেখে যায় পালিত পুত্রকে। কবির সে ভাগ্য পর্যন্ত নেই।

পুত্র চলে গেছে অ-ধরা, অ-দেখা লোকে, মানুষের সীমানার অনেক দূরে। তাই মায়ের কাতরোক্তি—

একবার ফিরে আয় স্বপ্নের মতন
বারেক শুনায়ে যারে মধুমাখা স্বর,

(অশোক সঙ্গীত-৪)

পুত্রকে হারিয়ে নজরুলের কণ্ঠে এরকমই বুকফাটা ক্রন্দন—বহুশ্রুত তাঁর শোকগীতি—

শূন্য এ বুকে পাখী মোর, আয় ফিরে আয়, ফিরে আয়
তোরে না হেরিয়া সকালের ফুল অকালে ঝরিয়া যায়।[১]

অশোক সঙ্গীতে মায়ের বেদনা-অশ্রু গলে গলে পড়ছে প্রতিটি কবিতায়। এ ব্যথায় সান্ত্বনা নেই,—অন্তর তাঁর নিঃস্ব, বিশাল প্রান্তরের মত খরতাপে বিশীর্ণ। সম্ভব-অসম্ভব কত ধরণের চিন্তা তাঁকে আকুল করে তোলে। প্রিয়জনের বিরহে শোকের অশ্রু ফেললে, স্বপ্নে তার দেখা পাওয়া যায় না—লোকমুখে প্রচারিত এ সংস্কারে কবি তাঁর মনকে শক্ত করতে চান অশ্রু ধারাকে নিরুদ্ধ করে। যেখানে গেছে পুত্র তাঁর, সে যেন আনন্দে থাকে এই তাঁর অন্তরের প্রার্থনা। পুত্রের প্রাণ যেন তাঁর মত অধীর না হয়। কিন্তু আনন্দের মধ্যে থেকেও পুত্র যেন তাঁকে মাঝে মাঝে স্মরণ করে ও স্বপ্নে দেখা দিয়ে যায়। 'মা' ডাকে তাঁর শ্রবণ, মন জুড়িয়ে দেয়।

গুণী পুত্র দূরে কর্মস্থলে রাজধানীতে থাকে, পল্লীর বৃদ্ধা মাতা পুত্রের অজস্র বাল্য স্মৃতির মধ্যে নিয়ত তাঁকে স্মরণ করেন, পুত্রের আগমনের আশায় দিন গোনেন। কিন্তু কবির পুত্র দূরে বহুদূরে ; আশা, ভাবনার অগম্য তীরে কোন্ অদৃশ্যালোকে চলে গেছে, স্মৃতিভারে পড়ে আছেন জননী। কোনদিন কোন উপলক্ষ্যেই তার দর্শন পাওয়ার উপায় নেই ; রিক্ত, ধূসর অন্তরে জননী পুত্রের চিত্র নিয়ে বাল-দেবতারূপে পূজা করেন। অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে কবি বলছেন,

তোমার দেহের সাথে হল ভস্মীভূত
আমার অগণ্য আশা। ভেবেছিনু মনে
আমার শ্মশানে আসি তুমি সযতনে
বিছাইবে পুষ্পরাশি ; ওরে প্রিয়সুত,
ভেবেছিনু অশ্রু তব, ভক্তি-রস-পূত,
অমর করিবে মোরে।

(অশোক সঙ্গীত-১৩)

মেঘনাদ বধ কাব্যে পুত্রের শেষকৃত্যের সময় রক্ষোরাজ রাবণের হাহাকারও এরকম হৃদয় বিদারক—

১। নজরুল রচনা সম্ভার (১ম)

ছিল আশা, মেঘনাদ মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।[১]

স্মৃতির জ্বালা সহনাতীত। এ বিশ্ব ছেড়ে মায়ের (কবির) চিন্তা মহাবিশ্বে যাত্রা করেছে। এ জীবন শেষে মহাকালের অনন্ত রাজ্যে যদি পথ খুঁজে না পাওয়া যায়, যদি প্রিয়তম পুত্রের দর্শন না মেলে, এ তপ্ত বিরহ একদিন জুড়িয়ে যাবে। তবে ব্যাকুলতা কিসের।

আবার ভিন্নতর ভাবনায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়। মহা পারাবারের স্রোতে আমরা বুদ্বুদের মত উঠি, পড়ি, লয় হই। এক সত্তার বিভিন্ন তরঙ্গলীলা। কিন্তু তবুও কবির আত্মা ত্রিভুবনময় সকলের মধ্যে পুত্রকে খুঁজে নয়ন তৃপ্ত করবেন।

কত গভীরতত্ত্বে মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন কবি। আমিত্বের চেতনায় কবির অন্তর প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

আমি ছাড়া যত কিছু আছে বলা যায়,
সকলি আমাতে লীন ; চেতনা জাগায়
যতটুকু, ততটুকু সত্য সে কেবল
আমারি চেতনা মাঝে,—বাকী সব ছল।

(অশোক সঙ্গীত-১৮)

রবীন্দ্রনাথের 'আমি'তে এই চৈতন্যের লীলারই পরিপূর্ণ বিকাশ—

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুণি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।[২]

রবীন্দ্রনাথের 'আমি' ১৩৪৩ সালের রচনা। কামিনী রায়ের এই লেখা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের। মাঝে বিশ বছরের বেশী ব্যবধান।

চৈতন্যের দীপ্ত আলোও মায়ের অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করতে পারল না। অন্তরে ক্ষত থেকে রক্তধারা ঝরতেই লাগল।

শতধা-বিভক্ত মায়ের হৃদয়ের ব্যথার স্মৃতিতে পূর্ণ এই কবিতারাজি। নানা-ভাবে নানারূপে নিত্য স্মরণ করছেন পুত্রকে। একাগ্রচিত্ত জ্ঞানভিক্ষু পুত্রের পাঠরত চেহারা ভুলতে পারেন না। কিন্তু বি-দেহীর দেশে রক্তমাংসের স্মৃতির

১। মধুসূদন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, পৃঃ ৩১৭
২। রবীন্দ্র রচনাবলী

যদি কোন মূল্য না থাকে, তাহলে কি হবে! এ যে আঘাতের পরে আঘাত। সান্ত্বনা মেলে না কোথাও। সান্ত্বনা পান না মৃত্যুর পূর্বরাত্রি স্মরণ করে। কষ্টক্লিষ্ট দেহে পুত্র চেয়েছিল মায়ের বুকের কোমল স্নেহস্পর্শ। পুত্রের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন নি—সে দুঃখ তাঁকে তিলে তিলে দগ্ধ করেছে। তাঁর অন্তরাত্মা ভেদ করে বেরিয়ে আসে ক্রন্দন,—

পাছে ব্যথা দিই ভয়ে ভ্রান্ত স্নেহভরে
না রাখিনু শেষ ভিক্ষা, কথাটি না কয়ে
মুদিলে অনিদ্র আঁখি, সে বেদনা সয়ে'।

(অশোক সঙ্গীত-২৮)

পনেরো বছরের কত স্মৃতি, কত ছোটখাটো ঘটনা মাকে কাঁদায়। জীবনের পরপারে মিলনের কথা ভেবে কিছুটা সান্ত্বনা মেলে। প্রিয়জনদের বিচ্ছেদে মরণ যে শ্যাম সমান হয়ে উঠেছে।

'মরণ যে ভয়াবহ, সে হয়েছে প্রিয়
চুরি করি প্রাণাধিক জনে; আজ তাই
তার অভ্যর্থনা তরে আগুসরি যাই
মধ্য পথে, ডেকে বলি, 'এস বরণীয়'।

(অশোক সঙ্গীত-৩৬)

শোকে অধীরা মায়ের ভাবনায় আদি-অন্ত নেই। যে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু দেখে সিদ্ধার্থের সাধনা। তাতে কি তত্ত্ব লাভ হল? সংসার তো সেই দুঃখের পারাবারই রয়েছে। যাঁর অন্তর যত বিশাল, দুঃখের পরিমাণ তাঁরই তত বেশী। তিনি যে সকলের দুঃখই বুক পেতে নেন।

বিশাল হৃদয়—
যার যত, তার প্রাণ তত দুঃখময়,
নিজ বক্ষে লয়ে ব্যথা পর বক্ষঃ হতে।

(অশোক সঙ্গীত-৩৯)

আপন হৃদয়ের দুঃখ দিয়েই পরের দুঃখের তীব্রতা বুঝবেন কবি। এরপর আপনাতে উদাসীন হয়ে থাকতে পারবেন না।

রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন বঙ্গজননীকে স্মরণ করে,

তব স্নেহ ডোরে।
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভাল ছেলে করে।[১]

সে কথা পুত্রহারা জননীও অনুভব করেছেন। তাই গভীর শোকেও মনে হয়, ছেলে যদি বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আপনার শক্তি নিয়োগ করতে মায়ের কাছে বিদায় চাইত,

১। রবীন্দ্র রচনাবলী

মাগো জীবনের কাজ
মোরে আহ্বানিছে দূরে, মানবের হিতে
আমার হৃদয়রক্ত হইতে ঢালিতে।

(অ. স-৪৪ নং)

তিনি তো এই শুভ সংকল্পে, মহৎ কর্ম প্রয়াসে বাধা দিতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর পুত্র যে আরো অনেক দূরে, চাওয়া-পাওয়ার অতীত পারে। মৃত্যু প্রিয়জনকে দৃষ্টির সীমার বাইরে নিয়ে যায়। স্ত্রীকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথের গভীর উপলব্ধি,

নয়ন সমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।[১]

এ অভিজ্ঞান কবি কামিনী রায়েরও। কিন্তু মাতৃহৃদয় দুঃখকে অতিক্রম করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। প্রতি কথায় পরিপূর্ণ মাতৃমূর্তিরই প্রকাশ।

হৃদয়ে রেখেছি তারে তবু এ হৃদয়
কাঁদে নিত্য। এত কাছে ছিল না তো আগে?
তবু দূরে গেছে বলি চোখে ঝরে জল।

(অ. স-৪৫ নং)

একদিনকার প্রার্থনা 'বড় করে দাও দেব, আমার এ ঘর' তা যে এমন করে পূর্ণ হবে তা কি প্রার্থী কোন দিন বুঝেছিলেন? বুকের ধনকে সরিয়ে দুনিয়ার সকল শিশুকে পুত্রস্থানে বসিয়ে দেবেন, এ যে কবির কল্পনাতেও ছিল না। অভিমান নেই, জ্বালা নেই, শুধু কণ্ঠক্লিষ্ট স্বরে বলেন,

তুমি বড় করে দিলে মোর ভাঙ্গা ঘর,
তুমি করে দিলে পুত্র, ছিল যারা পর,

(অ. স)

শেষের কথায় অভিমানের সুর এসে যায়—

তারপর কি বুঝিয়া কি করিলে নাথ,
মাতৃবক্ষ বাড়াইতে একি বজ্রাঘাত।

(অ. স)

রবীন্দ্রকাব্যের আরেক মায়ের বুদ্ধিহত, ব্যথাদীর্ণ বাক্য—

শুধু কি মুখের কথা শুনেছ দেবতা
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা।[২]

মাতৃহৃদয়ের নিরাবরণ প্রকাশ এই 'অশোক সঙ্গীত' কাব্যখানি। যে কথা সাধারণ দিনে বলতে পারতেন না—বিরহের অন্তরালে সে সব লজ্জা, সংকোচ সব

১। রবীন্দ্র রচনাবলী
২। ঐ

চাপা পড়ে গেছে। প্রতিটি কথনে মনে হয়, 'দুঃখ তাহার অসীম পাথার পার হল গো পার হল।' পুত্র শোকে সন্তান বিরহের দুঃখ প্রকাশে বাকী রইল না কিছুই।

দুঃখ গাথার শেষ প্রান্তে এসে বলছেন, মৃত্যুতে নবজন্ম হয়েছে পুত্রের। এক বছর ঘুরে আসায় মৃত্যু দিন নয়, নূতন জীবনের জন্মদিন পালন করছেন।

সেই পুণ্য দিনে কেন অশ্রু-উপহার
দিব তোরে, আর্দ্র করি আমাদের শোকে?
হে নির্ভীক, ধন্য হোক জন্মদিন তব।

(অ. স-৫৮ নং)

মাতৃত্বের বেদনায়, পরিপূর্ণ মাতৃত্ব-রসে কাব্যটি অপরূপ মহিমান্বিত হয়েছে।

॥ জীবন পথে ॥

সহযাত্রা

'জীবন পথে' কবি জীবনের আলো-ছায়ায় ঘেরা এক আলেখ্য বিশেষ। 'সহযাত্রা', 'একলা', 'ঝরাফুল' এই তিনটি ধারার ত্রিবেণীসংগম 'জীবন পথে' কাব্যটি। এতে আছে বহু সুখের স্মৃতি আর অসংখ্য দুঃখের গীতি। পূর্বরাগ থেকে শুরু করে অনুরাগ রঞ্জিত জীবনের কত মাধুরী সঞ্চিত হয়ে আছে 'সহযাত্রা'র সনেটগুলিতে। আনন্দঘন মুহূর্তের হর্ষোজ্জ্বল চিত্র এক একখানি। অনেক পাওয়ায় পরিতৃপ্ত মনের শান্ত নিবেদন। উচ্ছ্বাসের উন্দামতা নেই, উল্লাসের উতরোল নেই, কেবল কৃতজ্ঞচিত্তের মৃদু গুঞ্জরণ ও ভরা প্রাণের পরিতোষ। জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রমণের পর সুখ-স্মৃতি রোমন্থনের রোমাঞ্চের দাগ আছে 'সহযাত্রা'র কবিতাগুলিতে। প্রেমের উত্তাপ কিভাবে কবির হিমকঠিন হৃদয়কে বিগলিত ধারাতে পরিণত করেছিল; তার ইতিহাস লেখা আছে প্রথম ছ'টি কবিতায়। সুরেশ চন্দ্র সমাজপতির অনুরোধে এই কবিতাষষ্ঠক 'সাহিত্যে'র জন্য কবি দিয়েছিলেন। জেসিকা ওয়েষ্টব্রুক নামে একজন ইংরেজ মহিলা 'আলো ও ছায়া'র ইংরেজী অনুবাদ করতে অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি জীবন-রসসমৃদ্ধ সনেটগুলি দেখে অনুবাদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর অনূদিত এগারটি সনেট 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে (Modern Review 1929, Vol. XVI, No. 5) প্রকাশিত হয়েছিল। 'সহযাত্রা'র প্রথম সাতটি এবং ১০, ১৩, ১৪, ১৫ সংখ্যক কবিতাগুলি ভাষান্তরিত করেছিলেন। 'আলো ও ছায়া'র উচ্ছ্বাস-আকুল অল্পবয়সের কলতান অপেক্ষা ভাদ্র মাসের ভরানদীর মত অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ পূর্ণপ্রাণের মৃদুধ্বনি এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনা বিদেশিনীকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। নিবিড় অনুভূতির আত্মকথন 'সহযাত্রা'র সনেটরাজি। কবিজীবনের চরিতকথাও বলা যেতে পারে একে। 'সহযাত্রা' যেমন পূর্ণতার গান, তেমনি 'একলা' ও 'ঝরা ফুল'-এ রিক্ততার

বেদন। নিঃসঙ্গতা, হতাশা, সর্বহারার বেদনার্ত সুরের মূর্চ্ছণা 'একলা' ও 'ঝরা ফুল'কে অশ্রু-ভারাক্রান্ত করে রেখেছে।

প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ।
প্রেমের বেদনা থাকে
সমস্ত জীবন ॥[১]

কামিনী রায়ের 'জীবন পথে'র পত্ররাজিতে রবীন্দ্রনাথের এই বাণী প্রত্যক্ষ সত্য রূপে দেখা যায়। 'সহযাত্রা'র কবি তাঁর জীবনের অমৃতমাধুরীর এক একটা দুর্লভ মুহূর্তকে কাল প্রবাহ থেকে ছিনিয়ে বাক্-বন্দী করেছেন। এগুলিকে তাঁর জীবনকাব্যের ছিন্নপত্র বলা যেতে পারে। তবে এ পত্র নিজেকেই নিবেদিত এক গোপন আনন্দ-ভাণ্ডার। নিবেদন, প্রত্যাখ্যান, মিলনের যে ধারাবাহিকতা রঙে, রসে স্বাদে তা অনুভববেদ্য।

দূরে ছিনু, প্রাণপণ সাধনার ফলে
আনিলে নিকটে মোরে, কোন ইন্দ্রজালে
দেখেছিলে দেবপ্রভা মানবীর ভালে ?

(সহযাত্রা-১)

প্রথম জীবনের ব্যর্থতার বেদনা তাঁর অন্তরকে কঠিন করেছিল। প্রকৃত প্রেমেও তাঁর সংশয় ঘোচে না। রূঢ় প্রত্যাখ্যান তাঁর কণ্ঠে বড় নির্মম সুরে ধ্বনিত হয়েছিল—

করিনা প্রত্যয়
প্রেমের স্থায়িত্বে আমি, কভু নাহি সয়
নর ভাগ্যে এত সুধা।

(সহযাত্রা-২)

কিন্তু জগতে যা খাঁটি, তা সকল আঘাতেও আপন গৌরবে টিঁকে থাকে। একদিন তার জয় হবেই। হলও তাই। শান্ত ব্যথিত কণ্ঠে কবি বলেছেন,—

তোমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করেছে আমার
বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা।

(সহযাত্রা-২)

এ বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা অতীত জীবনের। এ রূঢ়তার আঘাত বাজে নিজেরই বুকে। যে প্রেম আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে জানে, পথের মাঝেই যার সিংহাসন, তার থেকে কতদিন মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে! শেষ পর্যন্ত সব সংশয়ের অবসানে নিজেকে সমর্পণ করে কবির আত্মমুক্তি ও আকাঙ্ক্ষিত শান্তি।

১। লেখন, ৩৭নং, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহুভার বহে নারী, বহু কষ্ট সহে,
কেবল নিজের ভার দুর্বহ তাহার
এ বোঝা নামায়ে লও।

(সহযাত্রা-৬)

আপনাকে বিলিয়ে দিয়েই নারী জীবনের সার্থকতা। জীবনের সুধাপাত্র তখন পূর্ণ হয়। নিশ্চিন্ততার আশ্রয়ে যে আরাম পাওয়া যায়, তারই আভাস মেলে কবির কথায়। এমন চিন্তাহীন আনন্দে সন্দেহ জাগে স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে কোন্‌টা সত্য ? এই সুখাবেশে জড়িয়ে থেকে মন স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, তাই মনে হয়,

'স্বপন যদি মধুর এমন
হোক সে মিছে কল্পনা।
জাগিয়ো না আমায় জাগিয়ো না।'

সহযাত্রায় কবির অনুরোধ,—

এ আরাম, শান্তি, মধুরতা
জাগ্রতে মিলে না যথাতথা
স্বপ্ন যদি তবু রাখি ধরে। (৭)

জীবনের সকল দ্বিধা, সকল সংশয় অবসানে নিশ্চিন্ত আনন্দে মন ভরপুর। আধো জাগরণে, আধো স্বপ্নে কবি জীবনকে দেখছেন মধুময়।

অমৃত পড়িতে পাতে পিয়া নিঃসংশয়ে,
কহিব, মানব ভাগ্যে অমৃত সম্ভবে। (১০)

সরল মনের অকুণ্ঠ প্রকাশই কবিতাগুলিকে সহজ সৌন্দর্য দান করেছে। ১১নং কবিতাতে কবির স্বভাবের সরল মাধুরী অতি সুন্দর, আপন হৃদয়খানি মেলে দিয়েছেন নদীর তুলনায়।

দিতে পার যদি
পথে আর যাত্রা শেষে, সর্বস্বান্ত করি
আপনারে, এ বেদনা হবে অবসান। (১১)

কিন্তু ভরাপ্রাণের জোয়ারে একদিন ভাঁটা পড়বেই। জীবনের ধর্মই তা, কোন চাওয়াকেই নিঃশেষে পাওয়া যায় না, কোন পাওয়াকেই চিরদিন ধরে রাখা যায় না। এ কারণেই জীবন অশ্রুমুখী। পরম পাওয়ার আনন্দে যে হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে, দুদিন পরে সে-ই কেঁদে বলে,—

যত প্রেম চাই
... ...
দুটি প্রাণ—কাছাকাছি থাকে, কিবা দূর—
পূর্ণ মিলনের তরে কভু সৃষ্ট নয় ;
যে যার আপন ভার বহি চলে যায়,
বিরহ ব্যথিত চিত্ত, চির তৃষাতুর। (১৪)

জীবনের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। যে মধুর স্বপ্নে রজনী ছিল মাধুর্যে ভরা, নিশাবসানে নিঃশেষিত চিত্তের অনাবৃত রূপ দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কবি জানেন 'পূর্ণ প্রাণে পাবার যাহা, রিক্তহাতে' তাকে চাইতে নেই। বিশ্বাসের দৃঢ়তায় ফাটল ধরেছে। 'হায়রে অতীতে আজ হাসে বর্ত্তমান।' (১৬নং)

কবিতার মত জীবন যদি ছন্দে, সুরে পূর্ণ না হয়,—না হোক,—বাসনার গন্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর দুনিয়ায় এসে দাঁড়াতে হবে। এতো কবির আজীবনের ধ্যান জ্ঞান। নিজ জীবনের সুখ দুঃখের বাইরে কর্তব্য পালনের প্রতিজ্ঞা তাঁর কথায়—

যদি কোন কাজ
ঘরের বাহিরে থাকে, জীবনের লাজ
তাই দিয়ে ঢেকে দিব, থাকিতে সময়। (২০)

অনেক ভাবনা, অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বের পর কবির মনে হয়, ক্ষণিকের অভিমানে, মুখের কথায় হৃদয়ের গভীর প্রেম ফুরিয়ে যায় না। শ্রান্ত, ক্লান্ত হৃদয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়, আবার মিটে যায়। অভিমানাহত দৃষ্টি ভুল অনুমান করে, ভুল সিদ্ধান্ত করে। ভুল ভেঙ্গে গেলে দৃষ্টির স্বচ্ছতায় মনে হয় এ অভিমান নিরর্থক। অনুতাপবিদ্ধ বাণী উচ্চারিত হয়—

আজ অন্ধকার রাত্রে তব সঙ্গিনীর
দৃষ্টি হোক তব দৃষ্টি ; হাতে দিয়া হাত
চল ধীরে, দেখা দিবে কাল শুভদিন। (২২)

সংশয়মুক্ত অন্তর রাহুমুক্ত চন্দ্রের মত আবার পূর্ণজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। জীবন সঙ্গীর প্রতি মান অভিমানের অবসান ঘটেছে। বিবাহিত জীবনের দ্বাদশ বছর পূর্ণতে তৃপ্ত, কৃতজ্ঞ চিত্তের নিবেদন শেষ সনেটে—'যদিদং হৃদয়ং মম' এর সুর যেন নতুন করে শোনা যায়—

আমার হৃদয় পাতি আজ চাহি নিতে
সমস্ত হৃদয় তব, তুমি এস আজ
পুরাতন সঙ্গী, স্বামী, ধর বর বেশ
তোমারে নূতন করি বরিব প্রাণেশ।

একলা

বিবাহিত জীবনের দ্বাদশ বছরের পূর্তিতে নবজীবনের যে মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন, তার স্থায়িত্ব মাত্র তিন বছরের! প্রেমের কথা বর্ণনায় কোন আবরণ না রাখলেও তিনি কিন্তু ছিলেন সংযতভাষী। উচ্ছ্বাসে, উদ্দামতায়, কোন সময়েই জীবনকে লঘু করে তোলেননি। আবার সঙ্গীহীন রাত্রিদিন ব্যথাভরা প্রাণেও সংযতবাক্।

স্মৃতির বেদনায় গাঁথা। রিক্ত প্রাণের করুণ রোদনে ভরা প্রতিটি কবিতা। 'শ্রান্ধিকী'তে কেদারনাথের পরিচয় পেয়ে এই কবিতার মর্মবেদন, কবির দুঃখের ভার বুঝতে কষ্ট হয় না। কেদারনাথ ছিলেন অত্যন্ত কোমলপ্রাণ, সকলের সুখ-সুবিধার জন্য আপন হৃদয়খানি বিলিয়ে দিয়েছিলেন। 'শ্রান্ধিকী'তে দেখেছি সন্তানদের শিক্ষা, রোগমুক্তির জন্য তিনি সর্বস্বপণ করতে পারতেন। কত যে কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন, তার বহু পরিচয় ওখানে আছে ;

চিরদিন শান্তিহীন পরিশ্রান্ত দেহ
অতিশয় মমতায় ব্যথিত জীবন ; (একলা-২)

কাজেই কবির ব্যথাভরা প্রাণের মৃদু উচ্চারণ আমরা গভীরভাবেই উপলব্ধি করতে পারি ; যখন তিনি বলেন,

জীবনের সাথী মোর গিয়াছে কোথায়,
আমার এ শূন্যগৃহে ফিরিবে না আর,
আমার এ হৃদয়ের বেদনার ভার,
বহিতে হইবে একা। (১নং)

গভীর দুঃখের মধ্যে তাঁর মনপ্রাণ, চিন্তা ভাবনা তলিয়ে গেছে। দাম্পত্য-জীবনের ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ঘটনাও এখন তাঁর কাছে পরম রমণীয় মনে হয়। বহুপ্রাপ্তির পরেই শূন্যতার গর্ভে তিনি নিমজ্জিত। অন্তরের রিক্ততা যে কত গভীর, অতীত দিনের প্রতিটি ঘটনাতে তার প্রকাশ। নিজের দুঃখের ভারে তিনি বিবশা, ভাষা, অলংকারের দিকে দৃষ্টি নেই। সহজ, সরল ভাষায় প্রাণের গভীরের কথা বলেছেন।

আজ যদি আসে মৃত্যু অজানা ওদেশে
নিয়ে যেতে, তুমি আগে দীপ হস্তে ধরি
আসিবে দেখাতে পথ, আশ্বাসিতে প্রাণ।

(একলা-৩)

এই পংক্তি কয়টি রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ'-এর ৪ নং কবিতার শেষাংশকে মনে করিয়ে দেয়। জীবনসঙ্গিনীকে হারিয়ে কবিগুরুরও একই ভাবনা।

আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে
হে কল্যাণী, গেলে যদি, গেলে মোর আগে
মোর লাগি কোথাও কি দুটি স্নিগ্ধ করে
রাখিবে পাতিয়া শয্যা চিরসন্ধ্যা—তরে ?[১]

কবি-পত্নীর মৃত্যু হয়েছিল ১৩০৯ সালে। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে ২৭টি কবিতা রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে আঠারোটি সনেট।

কামিনী রায়ের পতিবিয়োগ হয় এর সাত বছর বাদে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে।

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্মরণ, বিশ্বভারতী, পৃঃ ১২

সতেরোটি সনেটে 'একলা'র স্মৃতিচয়ন। বহু কবিতার মধ্য দিয়েই 'একলা'তে 'স্মরণ'-এর প্রভাব লক্ষণীয়। একই বেদনা, একই পরিস্থিতি—শুধু প্রকাশভঙ্গী আলাদা।

কামিনী রায়ের কবিতাগুলি প্রাত্যহিক জীবনের স্পর্শ দিয়ে গড়া; পনেরো বছরের অনেক পাওয়ার বিহ্বল মুহূর্ত, আনন্দঘন প্রহর,—সবই যে অতল অন্ধকারে ডুবে গেছে তার কাহিনী। তাছাড়া তাঁর শোকাশ্রুর অবিরাম বর্ষণ, দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে এই ব্যথার ইতিহাস রচনা চলেছে।

'এষা'র সঙ্গে 'একলা'র কেউ তুলনা করলেও 'এষা'র হাহাকার, স্থূলতা এতে নেই। কামিনী রায় চিরদিনই সংযত। 'একলা' তাঁর শোকসঙ্গীত হলেও কান্নার স্বর উচ্চগ্রামে ওঠেনি একবারও। সংসার-লীলার অসংখ্য চিত্রণ এতে আছে ঠিকই, কিন্তু এ যেন আপনার কাছেই মৃদুস্বরে আত্মকথন। আন্তরিকতার স্পর্শে, সরল ভাষণে তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা সকলের হৃদয় করুণ রসে ভরে দিয়েছে। পুরবী রাগে তাঁর ব্যথার সুরের সঙ্গে পাঠক একাত্মতা অনুভব করে।

রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ-এর প্রভাব এখানে থাকলেও ব্যবধানও যে বিরাট—তা কারোরই বলার অপেক্ষা রাখে না। মধ্যবয়সে স্ত্রীকে হারিয়ে যে আঘাত তিনি পেয়েছিলেন, তাঁর সেই ক্ষতচিহ্ন দিয়ে 'স্মরণ'-এর বহু কবিতা সৃষ্ট। শূন্য-জীবনের অসহায়তার করুণ স্বর প্রথম কবিতাগুলিতে স্পষ্ট কিন্তু স্থিতধী রবীন্দ্র-নাথ অপূর্ব আত্মসংযম দ্বারা হৃদয়কে প্রকাশ করলেন অনন্ত আকাশে। তাই তিনি অনায়াস-ছন্দে বলতে পারেন—

অশ্রুধৌত হৃদয়-আকাশে
দেখা যায় দূর-স্বর্গপুরী।
তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।[১]

তাঁর হৃদয়ের ব্যাপ্তি অনন্ত আকাশ ছাড়িয়ে যেন দূরে, আরো দূরে বিস্তৃত। তারপরই তাঁর ভূয়োদর্শন বা পরমোপলব্ধি।

এই আত্মদর্শন রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব। এখানে তিনি অনন্য, এখানে তিনি একক। এই পরমদর্শনের পর 'স্মরণ' রচনাও শেষ। এর সঙ্গে কারোর তুলনাই চলেনা। কিন্তু কামিনী রায়ের ভাবনাও আপনাকে অতিক্রম করতে পেরেছে। উচ্চ ভাবনা আছে কিন্তু সঙ্গীতময়তার অভাবে তাঁর কবিতা প্রথম স্তরে কখনও পৌঁছাতে পারেনি। তবে তাঁর চিন্তাধারাও নিত্যশোক থেকে তাঁকে মুক্ত করেছে। সেজন্য বলা সম্ভব হয়েছে—

কবে মিশে গিয়েছিনু দোঁহে একাকার,
মিলিত দোঁহারে কেন ভেবেছি অন্তর? (১৩নং)

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্মরণ, বিশ্বভারতী, পৃঃ ২১

এই সনেটটির কল্পনা অন্যান্য সবকটি থেকে আলাদা। অন্যগুলিতে তাঁর দাম্পত্যজীবনের দিনলিপি ও খণ্ডিত জীবনের বেদনার্তি।

এখানেই মাঝে মাঝে রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। ঝড়ের রাতের পরে প্রসন্ন সকালের মত রবীন্দ্রনাথের অন্তরে শান্তির কারুণ্য এসেছে।

আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক—
এই কথা মনে জানি নাই মোর শোক।[১]

কামিনী রায়ের কবিতা ঠিক এরই প্রতিধ্বনি না হলেও এই ধরণের সুর পাওয়া যায়—

এতদিনে হলে তুমি নিত্য সহচর,
সকল চিন্তার মোর, সকল চেষ্টার
সমভাগী, সমব্যথী; দেহ তেয়াগিয়া
আমার হৃদয়পুরে বাঁধিয়াছ ঘর। (একলা-৮নং)

কয়েকটি শিশু সন্তানকে নিয়ে নারী জীবনের যে অসহায় করুণ অবস্থা—তাতে এই উপলব্ধি কম বিস্ময়ের নয়। লেখার সারল্যের গুণে 'জীবনপথে'র বিভিন্ন খণ্ডগুলির আবেদন পাঠকের হৃদয়ের গভীরে স্থান পেয়েছে।

ঝরাফুল

'জীবন পথে'র ভূমিকাতে শেষাংশ ঝরাফুল সম্বন্ধে কবির বক্তব্য, " 'সহযাত্রা' ও 'একলা'র কবিতাগুলি একসূত্রে গ্রথিত মালার ন্যায়, শেষাংশের গুলি কতকটা অসম্বন্ধ অথবা ছিন্নসূত্র মালার স্খলিত ফুলের ন্যায়। এই জন্যই ইহার নাম ঝরাফুল হইল।"

'ঝরাফুলে'র প্রথম কবিতার মধ্যে 'আলো ও ছায়া'র কবিকে পাওয়া যায়। আত্মচিন্তা তুচ্ছ করে পরার্থে নিজেকে নিঃশর্ত সমর্পণ

আপনার যতটুকু ঢালিব নিঃশেষে,
লুপ্ত ক্ষুদ্র স্বার্থসুখ, বহুর ভিতর
বাড়াইয়া শক্তি ভক্তি, চেতনা সাধন, (বহুর ভিতর)

কিন্তু আত্মবিসর্জনের সুখ বা মহিমা তাঁর হৃদয়ে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি। পরে তিনি সংশয়ে ভুগেছেন। পাওয়া, না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব তাঁর মনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, তাঁর আদর্শ 'স্বপ্ন নু, মায়া নু' বলে মনে হতেই তাঁর আশাভঙ্গের বেদনা।

ফেলে সত্যধন
রঙ্গীন মিথ্যার বোঝা করিয়াছি পুঁজি,
শেষে শ্রান্ত, সংশয়ের সাথে যুঝি,
চাহিয়াছি উল্কাসম ত্যজিতে স্বগণ। (ভাবুকের ভুল)

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্মরণ, বিশ্বভারতী, পৃঃ ২৬

এক এক করে প্রিয়জনেরা জীবনগ্রন্থি থেকে খসে গেছে। বিচ্ছেদ আসতেই বোঝা গেছে, বন্ধন কত দৃঢ় ছিল। নিজেকে বঞ্চিত করেছেন, তাদের প্রাপ্যও দেননি। হৃদয়ের সুধাপাত্র শূন্য রয়ে গেছে। এখন বুঝেছেন, 'স্থূল ফুল ফেলে ছোটা সৌরভের পিছু' একেবারেই বাতুলতা।

'শিশুসেতু' ও 'মাতৃজন্ম' কবিতাদ্বয়ে মাতৃত্বের মহনীয় স্বাদে অন্তর তাঁর পূর্ণ। দম্পতির দুই প্রেমহৃদয়ের মাঝে যেটুকু ফাঁক থাকে, ক্ষুদ্র শিশু এসে তাকে লুপ্ত করে অখণ্ডতার সৃষ্টি করে। এক স্বর্গীয় আনন্দে মাতৃহৃদয় ভরে তোলে। অনাস্বাদিতপূর্ব অমৃতের স্পর্শে মা বলেন,—

নারীহৃদয়ের গুপ্ত ঐশ্বর্য্যের দ্বার
দিলি খুলে ক্ষুদ্র হাতে ; করি তোর দাসী
শিখালি সেবার সুখ ;

(মাতৃজন্ম)

শিশুর কলকাকলিতে ঘর ভরে ; জননীর অন্তরের সুধা শতধারায় উৎসারিত হতে থাকে ! সেই আনন্দে রচিত হয় 'গুঞ্জন', মা ও শিশুর অনন্তলীলারহস্যে ভরা। সন্তানদের গল্পের ক্ষুধা মিটানোর জন্য লেখা হয় ধর্মপুত্র,—উৎসর্গিত হয় পুত্রকন্যাদের। সেই অশোক বুলবুল সবাই একে একে মাতৃঅঙ্ক শূন্য করে চলে গেছে অনন্তের পথে। জীবন থেকে সরে যাওয়া সেই প্রিয়দের স্মৃতি দিয়ে রচনা ঝরাফুল।

প্রথমেই স্মৃতির অর্ঘ্য ছোট বোন প্রেমকুসুমের জন্য। ১৯০৩ খৃঃ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে প্রেমকুসুমের মৃত্যু হয়। দুবছর পরে সেই ব্যথার স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকে 'লোকান্তরিতা সোদরার প্রতি-২'তে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ব্যক্ত করেন.

হইয়াছে শেষ
দেহের বেদন যত, যত অশ্রুধার,
জাগে শুধু মাতৃত্বের নয়নে অধরে।

কবির জীবনে শুরু হয়েছে মৃত্যুর্মিছিল। ১৯০০ খৃঃ এক শিশুসন্তানকে হারান। যে মাতৃত্বের আনন্দে অধীর হয়েছিলেন সন্তানবিয়োগে সেখানেই চরম আঘাত, বেদনাশ্রুতে হৃদয়ের দুই কূল ভেসে গেল। জীবনপথে যাঁর হাত ধরে যাত্রা করেছিলেন, তিনিও একদিন তাঁকে একলা, অসহায় রেখে মাঝপথে বিদায় নিলেন। 'সিন্ধুর প্রতি' কবিতায় সমুদ্রের অবিশ্রাম গর্জনে কি তিনি নিজহৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনতে পান। ১৯০৯ খৃঃ যখন এ কবিতার জন্ম—তখন তাঁর হৃদয়েও তো এমনি 'অতৃপ্ত আকাঙ্খা কাঁদে আশা নিরাশায়' ?

গভীর বেদনায় 'অভব্য দৈবের' প্রতি তাঁর অন্তরের অভিমান—

জীবনের সুধাপাত্র নিঃশেষে ভরিয়া
ভাবিনু করিব পান, চেখে চেখে ধীরে—

তুলিয়াছি পূর্ণ পাত্র অধরের তীরে,
সহসা দৈবের হস্ত সে পাত্র ধরিয়া
টানিল সবলে, লবণাক্ত তপ্ত অশ্রুনীরে
মিশিল যেটুকু ছিল বাকী।

(অভব্য দৈব)

জীবনের পাত্র বার বার ভেঙে আনন্দ নিঃশেষ হয়ে গেছে। গভীর দুঃখে এক হাতে অশ্রুমোছা, অন্য হাতে ব্যথা বাষ্পে ভরা এক একটি কবিতার জন্ম।

একসাথে জন্মবৃদ্ধি, একসাথে মরা
জীবনের কামনার, ফোটা আর ঝরা
রাশি রাশি কুসুমের, ফল নাহি রয়।

(অভিমানে)

'ঝরাফুল'-এ বিচ্ছিন্নভাবে এক একজনের স্মৃতি তাঁর হৃদয় ভারাতুর করেছে। অনুজাকে স্মরণ করার পরে যাঁরা হৃদয়ের প্রায় সর্বাংশ জুড়েছিলেন—তাঁদের হারানোর ব্যথা। স্বামী পুত্রের অন্যত্র তর্পণের পরও এখানে স্মৃতির কয়েকটি পাতা তাঁরা জুড়ে আছেন। 'ঝরাফুল'-এ অশোকের উদ্দেশে আবার ছ'টি সনেট বিরচিত। অবশেষে বেদনাভরা হৃদয়খানি পরমপিতার পদে সমর্পণ করেছেন।

আনন্দ দিয়াছ যত সে তো পুরস্কার
নহে মোর কোন পুণ্য কোন যোগ্যতার,
বেদনা দিয়াছ যত তাও সব নয়
আমার পাপের শাস্তি। ওহে পূর্ণজ্ঞান,
পূর্ণ প্রেম, কি বুঝিবে তোমার বিধান ?
শুধু বুঝি তুমি মোর অনন্ত আশ্রয়।

(অনন্ত আশ্রয়)

'ভিক্ষাত্যাগ' কবিতাটি উচ্চভাবের গৌরবে মহীয়ান। অন্তরের সকল দীনতা, সকল বাসনার সমাপ্তি। চিরসুন্দরের পায়ে নিবেদিত প্রাণের শান্ত রসের সঙ্গীত—

আমি নিত্য নতশিরে
প্রণমিয়া তব পদে করি নিবেদন
যা কিছু পেয়েছি আমি, দিবার মতন,
তুমি যা লইবে আমি চাহিব না ফিরে।

(ভিক্ষাত্যাগ)

'অক্ষয় প্রদীপ'ও ভক্তহৃদয়ের বিশ্বাসে উজ্জ্বল, প্রণতিতে রমণীয়।

তব কাছে, হে অনন্ত, দূর কাছে নাই,
জনম মরণ ঠেলি বাড়াইতে হাত
তোমারেই হাতে ঠেকে।

(অক্ষয় প্রদীপ)

কবির এই নিবেদনে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর ধ্বনিত হয়। রবীন্দ্র-কাব্যেও মৃত্যু শোকে ব্যথা-দগ্ধ প্রাণে অসীমের উপলব্ধি—

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই

রবীন্দ্রনাথের মত কামিনী রায়ের জীবনে মৃত্যু ঘন ঘন উল্কাপাতের মত নেমেছে! সাময়িকভাবে মহান উপলব্ধি এলেও শোক-সন্তপ্ত অন্তরে চিরশান্তি মেলে না। দেহের রক্ত দিয়ে গড়া কত সন্তানকে মৃত্যু ছিনিয়ে নিল। অশোকের অভাবই প্রাণের গভীরে এক বিরাট ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। মাতৃ-হৃদয়ে কোন কিছুতেই সান্ত্বনা মেলে না,—

ভাস্কর বা হইতাম যদি চিত্রকর,
তোমার প্রতিমা, পুত্র, যেতাম রাখিয়া
ধবল প্রস্তরে কুন্দি, অথবা আঁকিয়া
চিত্রপটে; (মানসী প্রতিমা)

বসন্ত আসে, প্রকৃতির বুকে বর্ণে, গন্ধে, পত্র-পুষ্পে আনন্দের হিল্লোল। কবির প্রাণকেও চকিতে নাড়া দিয়ে যায়। কিন্তু কবি-চিত্ত প্রিয়-স্মরণে চির ব্যাকুল। তাই প্রকৃতির এ আনন্দের দান নিঃশেষে গ্রহণ করবার শক্তি কই! মনে যে তাঁর অবিরাম প্রশ্ন,—

দূরে কোন্‌খানে
থাকে অদেহীরা, বঁধু পার বলে দিতে?

(বসন্তাগমে)

গাছের পাতা ঝরে যায়। আবার নবপত্রে তার সারা অঙ্গে পুলকের শিহরণ। কিন্তু মানুষের জীবনে মৃত্যু যা নিয়ে যায়, তার জন্য হাহাকার মেটে না। বিশেষ করে পুত্রশোক। অশোকের বিচ্ছেদ মাতৃহৃদয়কে অ-শোক করতে পারে না। বৃক্ষের জীবনের সত্য মানুষে সম্ভব নয়। তাই কবির সান্ত্বনা মেলে না কিছুতেই। কণ্ঠে তাঁর বিক্ষোভের সুর।

'নিত্যস্মৃত'তে একই বেদনা। এই অনন্ত বিরহের কোন সান্ত্বনা নেই। হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অবিরাম রক্ত-ক্ষরণ চলছে। তাঁর প্রতিটি কথায় গভীর বেদনার আর্তনাদ—

আনন্দ উৎসবে,
গীতবাদ্য সম্মিলিত বাল-কলরবে
তোর কণ্ঠধ্বনি লাগি মোর বক্ষঃস্থলে
ব্যাকুল বেদনা জাগে—

(নিত্যস্মৃত)

এই নিত্যস্মরণে পুত্রের পনেরো বছরের ক্ষুদ্র জীবনের ছোটবড় সকল ঘটনা বিরাট হয়ে মায়ের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। মৃত্যুর চার বৎসর পরেও অশোকের জন্মদিন তাঁর প্রাণকে ব্যাকুল করে তোলে। অবুঝ শিশুর মত তাঁর মনে হয়—

> ঊনবিংশ বরষের আশীর্ব্বাদ শিরে,
> পার হয়ে ব্যবধান এ ধরণী তীরে
> এস নামি হে কুলেন্দু ; প্রভাত সংগীতে
> মিলাও তোমার কণ্ঠ ; ভাই ভগিনীতে
> যেমন বসিতে বস' ঘিরে জননীরে।

(মাঘের চতুর্থ দিনে)

অশোকের তীব্রতা না মিলাতে কন্যা লীলাকেও হারাতে হলো ছ' বছর বাদে (১৯২০ খ্রীঃ)। প্রতিবেশীর কন্যার বিবাহে আপন দুহিতার জন্য হাহাকার আরো বাড়ে। কিন্তু জীবনান্তে বিচ্ছেদের শেষ হবে, মায়ের এই সান্ত্বনা।

'গুঞ্জনে' আমরা ছোট্ট বুলবুলের ছবিটি দেখেছিলাম মাতৃস্নেহে ভরপুর সুন্দর একটি চঞ্চল শিশু। পাঁচ বছর পরে সেও লীলার অনুগামী হল। 'কন্যা বুলবুলের প্রতি' মায়ের সেই দুঃখক্রন্দন। কিছুদিন পরে পরেই মৃত্যু কবির প্রিয়জনদের গ্রাস করেছে। মাতৃহৃদয় বেদনায় শতধা-দীর্ণ, তাঁর আকুল ক্রন্দন গিয়ে ঠেকেছে অমৃত-ময়ের চরণে। দেবতার দানে তাঁর হৃদয় শ্রদ্ধায়, প্রশংসায় পূর্ণ হয়েছে, বুকের রক্ত দিয়ে গড়া স্নেহ-পুত্তলীদের মৃত্যুযন্ত্রণায় ফিরিয়ে নিলে সেই করুণাময়কেই নির্মম কঠোর ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। 'অদ্ভুত প্রেম' ও 'ঘোর রহস্যে' নিষ্ঠুর বিধাতার বিধানকে মর্মান্তিক মনে হয়—

> হায়রে অদ্ভুত প্রেম, দানে অনুপম,
> ফিরে নিতে ক্ষিপ্র হস্ত বিনা দ্বিধা লেশ।
> মানবের নিষ্ঠুরতা মানে পরাজয়
> তব বিধানের কাছে। হে শান্ত নির্ম্মম,
> না চাহিতে দাও, সে কি হারাবার ক্লেশ
> শিখাবে একান্তে তাই ? আর কিছু নয় ?

(অদ্ভুত প্রেম)

গভীর মমতা দিয়ে মায়ের হৃদয় গড়ে এত আঘাত দেওয়া কেন, সে তাঁর কাছে রহস্যময়। কোমল প্রাণে আঘাত বেশী লাগবে বলেই নিষ্ঠুরের এই বিধি বলে কবির দৃঢ় বিশ্বাস।

কবি কামিনী রায় যে স্বল্পবাক্, লজ্জাশীলা তাঁর লেখায় সে পরিচয় আছে। এমন কি রচিত কবিতাবলীও অনেক সময় প্রকাশ করতে অযথা বিলম্ব করেছেন। আপনাকে প্রকাশেই ছিল তাঁর কুণ্ঠা।

প্রার্থনা ছিল তাঁর দেবতার কাছে—

হে স্বামিন যাহা নির্দেশিলে
করিতেছি শিরোধার্য, ভিক্ষা এই আছে—
পালিতে নির্দেশ যোগ্য শক্তি যেন মিলে,
জীবনে বহিতে মৃত্যু তাও না ডরাই।

(একভিক্ষা)

সারাজীবন এই কঠিন পরীক্ষাই দিতে হয়েছে। মৃত্যুর কঠিন স্পর্শ তাঁর হৃদয়মন তীব্র বিষে গভীর নীল করেছে। 'একলা', 'ঝরাফুল' সেই মরণাধিক যন্ত্রণার কাহিনী।

দীপ ও ধূপ (১৯২৯) :

'দীপ ও ধূপ' নামের মধ্যেই কাব্যটির সার্থকতা। এই দীপ অন্তরের আলোয় প্রদীপ্ত। ধূপের গন্ধে মানবতা-সমৃদ্ধ গুণের প্রকাশ! 'দীপ ও ধূপে'র প্রকাশনা কাল ১৯২৯ খৃঃ, তখন কবির জীবন অস্তাচলের ধারে ঠেকেছে। বহুদর্শিতায় জীবন তাঁর পরিপূর্ণ। বহু ভাবনা, বিচিত্র চিন্তায় 'দীপ ও ধূপে'র কবিতাগুলি উজ্জ্বল। মানবপ্রীতি, বিশ্বজনীনতা, দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞান, ছোটবড় নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সমদৃষ্টি তাঁর কাব্যকে অমূল্য করেছে। বিভিন্ন ধরণের, বহুবিধ মননের নব্বইটি কবিতায় 'দীপ ও ধূপে'র আয়োজন। ১৮৯০ থেকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লিখিত কবিতা ও সনেট 'দীপ ও ধূপে' স্থান পেয়েছে। প্রকাশক জীর্ণ খাতা ও ছিন্ন পত্রাবলী থেকে কবির বিভিন্ন বয়সের কবিতা গ্রন্থিবদ্ধ করেছেন। দীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে রচিত বহু কবিতা প্রকাশের আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে বন্দী ছিল। প্রকাশক বলেছেন, নানা কারণে সংকলনে কিছু ত্রুটি আছে। রচনাকালের ক্রমানুসারে অথবা বিষয় অনুসারে কবিতাগুলির স্থান নির্দিষ্ট হয়নি। তারিখ থাকা সত্ত্বেও অনেক স্থানে অনবধানতার জন্য তা মুদ্রিত হয়নি।

কবি নিজেও তাঁর কাব্য প্রকাশের ব্যাপারে নিরুৎসাহ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "যাত্রার পর প্রত্যাবর্তন নাই, তাহার জন্য উন্মুখ হইয়া আছি; বাছাবাছির দিকে এখন আর মন দিতে পারিতেছি না। দেশান্তরে যাইবার সময় কেহ যেমন বহুদিনের সঞ্চিত অনেক কাজের এবং অকাজের সখের জিনিষ প্রতি-বাসীদের মধ্যে বিলাইয়া যায়, তাহার দামের কথা ভাবে না, অন্তত কিছুদিন কাজে আসিবে, ভাল লাগিবে এই মনে করিয়াই খুসী হয়, আমার কবিতাগুলিও সেই-ভাবেই দিয়া আমি খুসী।"

জীবনের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, এখন মঙ্গল আরতির আয়োজন। কবির আশা, এ ক্ষীণ আলো হয়তো পথভ্রান্ত পথিককে পথের নিশানা দেবে।

মাঝে মাঝে অজানা আশঙ্কা কবিকে ব্যাকুল করে তোলে। কিন্তু ভগবানে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের বলে সকল শঙ্কার অবসান হয়। 'আশ্বস্ত'-এ সেই আশ্বাসের সুর, জীবনের অর্থের সন্ধানও পাওয়া যায়।

জীবনের গতি সমের দিকে। বহু খ্যাতিতে যাত্রাপথ তাঁর কুসুমাস্তীর্ণ হয়েছে; তবু 'অলজ্জিত'-এ কণ্ঠ তাঁর মৃদু, নম্রতায় তিনি ধীর—

কণ্ঠে মোর নাহি ফোটে সুর
বীণা হাতে বাজেনা মধুর,
কি দিয়া তুষিব সবে,
কি কাজে লাগিব ভবে,
এ শোচনা কর প্রভু দূর।

(অলজ্জিত)

'স্বজন সঙ্গে', 'ভাইরে আমার ভাই', 'অমৃতের পথে' প্রভৃতি কবিতায় সকল জনের সাথে অপূর্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, অসীম উদারতা। অতিক্রান্ত জীবনের পরম অভিজ্ঞতায় তিনি অক্লেশে বলতে পারেন।

সবাই হেথা আপন জন, নাইকো কেহ পর
একের সুখে উঠছে ভরে' সকলের অন্তর,
সুখী সকলের অন্তর।

(স্বজন-সঙ্গে)

'ভাইরে আমার ভাই'তে একই ভাব—একই সুর। জীবনের চলার পথে সুখে দুঃখে কভু আনন্দ, কভু বেদনায় অন্তর বিহ্বল হয়েছে, কিন্তু একা এই ভার কোনদিন বইতে হয়নি। হাত বাড়িয়ে দিলে সামনে, পেছনে কেউ না কেউ সে হাত ধরে প্রেম ভরে হৃদয়ের স্পর্শ দিয়েছে।

আর 'অমৃতের পথে' তো বিশ্ব মানবতার জয়গান। অলক্ষ্য পথে সকল মানবের যাত্রা চলেছে অফুরাণ পথে। ধনীর চলায় ধনমত্ততা, দৃষ্টিতে তার তাচ্ছিল্য। জ্ঞানী শান্ত, নির্বিকার। এ মরসংসারে অমৃতের সন্ধান তিনিই দিতে পারেন।

কবি সে বিশ্বের প্রাণে মিলাইয়া প্রাণ,
সুখে দুঃখে সকলেরে শুনাইছে গান;
* * * *
রুদ্রেরে সুন্দর করে, তিক্তে সুমধুর,
ব্যথারে আনন্দ, তার, অন্তরের সুর,
* * * *

(অমৃতের পথে)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিতর্পণে 'চরিত্রকথা'য় বলেছিলেন, "ইতর সাধারণ সকলেই সম্মুখে যাহা পড়ে, তাহাই কুড়াইয়া লইয়া সেই কয়টা

"জিনিষকে কাজে লাগাইয়া যেন-তেন-প্রকারেণ তাড়াতাড়ি জীবন যাত্রায় দৌড়িয়া চলিয়াছে, আশে পাশে যাহা আছে তাহার প্রতি মনঃসংযোগের অবকাশ পাইতেছে না। কিন্তু কয়েকজন লোক এই আশে পাশে চাহিয়া অন্যে যাহা দেখে না, তাহাই দেখেন এবং ইতর সাধারণকে যখন দেখান, তখন তাহারা নূতন কি দেখিলাম বলিয়া চমকিয়া ওঠে"।[১]

কবি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা সকলের উদ্দেশেই উজাড় করে দিয়েছেন। চিত্র-শিল্পী, যিনি জগতের চলমান স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন—তাঁর কর্মধারাও বিপুল।

বাহিরে যা, সুদূরে যা, পৌঁছায় সে ঘরে,
বিস্মৃতেরে অতীতেরে সঞ্জীবিত করে
তুলিকায়, অস্ফুটেরে করে স্ফুটতর,

(অমৃতের পথে)

জগতে বিরাট কর্মযজ্ঞ চলেছে, সেখানে নিজের শক্তি অনুসারে সকলেই কর্মরত। বিশাল এই কারখানায়—

কেহ লেখে, কেহ খোদে, প্রাসাদ নিৰ্ম্মায়,
খাটে কেহ ঘাটে বাটে, মোহ বহি যায় ;
... ...
নমস্য সবাই মোরে কিছু করে দান,
সুখ দেয়, দুঃখ হতে করে পরিত্রাণ।

(অমৃতের পথে)

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যের সুরও এই ভাবধারার সঙ্গে অভিন্নরূপে মিলে যায়। 'জাতির পাঁতি'তে তাঁর গভীর দর্শনের পরিচয়। জগতের সকলেই সমান, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উচ্চ, নীচ সব তুচ্ছ। সকলের ধমনীতে একই রক্তধারা প্রবাহিত। মহামানবের সেবার জন্য সকলে জাগ্রত প্রাণ।

মালাকর তার মাল্য জোগায়
গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে,

চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়
নট তারে তোষে নৃত্যে-গানে,

যোদ্ধারা তারে সাঁজোয়া পরায়,
বিদ্বান তার ফোটায় আঁখি
জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য যোগায়
কিছু যেন জানা না রয় বাকী।

'অমৃতের পথে'তে সকলের কর্মধারা বিশ্লেষণ করে নিজেকেও সেই স্রোতে মিলিয়ে দিতে কবি একাগ্রচিত্ত। আকুল প্রার্থনায় তাঁর শেষ নিবেদন,

দুঃখ দেছ, মৃত্যু দেছ, দোঁহে করি রথ
চলিব আলোকে নিত্য অমৃতের পথ।

শেষ যাত্রার আগে কবির মনে বিভিন্ন ধরণের চিন্তার তরঙ্গ। কালের প্রবাহে সব কোথায় ভেসে যায়। কবির মনে হয় তিনশো বছর পরে,—

আমার জন্য থাকবে না কো চেয়ে
আসছে বলে পথের দিকে কেউ,
প্রাণের কূলে আসবে না কো ধেয়ে
অপর একটি ব্যাকুল প্রাণের ঢেউ।

এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র বিপরীত সুর,—

উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে।

'তীর্থ পরিক্রমে'র বক্তব্যও সুন্দর।

অন্ধকারে নয়,
আলোকে খুঁজিতে হবে আত্মপরিচয়;

এই আত্মপরিচয়ের সন্ধানই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-সাধনা, ঋষিগণ বলেছেন, 'আত্মানং বিদ্ধি', পাশ্চাত্য দর্শনেও বলে, 'Know Thyself'।

'তীর্থ পরিক্রমে' কবি জীবন তীর্থ পরিক্রমার কথা বলেছেন। কাজেই জীবনকে সুকৃতির দ্বারা প্রস্ফুট করতে হবে।

জন্মিয়াছ জীব মর্ত্যে, মৃত্যু কবে আসে
তাই ভেবে আজীবন কে মরিছে ত্রাসে?

মৃত্যু ভয়ে যে সদা শঙ্কিত সে কাপুরুষ জীবন পলাতক। তার জীবনে কেবল পরাজয়ের গ্লানি।

"Cowards die many times before their death".[১] 'গীতস্পর্শে' কবির সুর অন্য রকম। তার মন ঘরের পানে।

যশঃ আমি চাহি নাই, চেয়েছিনু স্নেহ,
চেয়েছিনু একখানি শান্তিভরা গেহ।

নিভৃত ঘরের নিরালা অবসর রবীন্দ্রনাথেরও কাম্য।

ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে
ধন নয়, মান নয়, একখানি বাসা
করেছিনু আশা।

১। Shakespeare, Julius Caesar, Act. 2. Scene I

'বেঁচে রব' কবিতাটিতে সকলের প্রাণের গোপন বেদন যেন বাণীময় হয়ে উঠেছে।

"কিছু করে যাব, যেতে দিবনা বিফলে
দুর্লভ এ জন্ম মম।"

মানবজীবন কর্মযোগের দ্বারা সার্থক হয়ে উঠুক এ অনেকেরই মনোগত বাসনা। কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনেককেই বলতে হয়—'যত সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না।'

কবি জীবনের সার্থকতার পথে প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

প্রদীপ সার্থক হয় প্রদীপ হইয়া,
আপনারে প্রকাশিয়া আর আলো দিয়া।

(বেঁচে রব)

নদীর মত হতে পারলেও জীবন সার্থক—

নদী বহে যায় শুধু সাগরের পানে,
যেতে যেতে দুই কূল ভরে ধনে ধানে।

(বেঁচে রব)

সত্যেন্দ্রনাথের 'ঝর্ণা'র বক্তব্যও একই—

ধূসরের ঊষরের কর তুমি অন্ত
শ্যামলিয়া ও পরশে করগো শ্রীমন্ত।[1]

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কবি নানা কাজে আপনাকে পূর্ণ করে তুলতে ব্যগ্র।

বেশী কথা বলিও না বলায়ো না মোরে
কথা না দেখায় পথ।

(বাক্য ভীত)

শেষ খেয়ার আগে হিসাব-নিকাশের কাজ সারবার পালা—

যেতেই হবে যেতেই চাই
কিসের ডাকাডাকি?
আসিতে ফিরে বাসনা নাই,
যাবার আগে ভেবেছি তাই,
কারেও যেন ভুলেও আমি
না দিয়া যাই ফাঁকি।

(যাবার আগে)

আমাদের এ জীবনে হাজারতর বন্ধন। এ বন্ধন ছিন্ন করে যাবার কথা ভাবতে মনের তন্ত্রীতে টান পড়ে। ব্যথা বাজে অন্তরে। মনে হবে কত অসমাপ্ত কাজ

১। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ঝর্ণা, কাব্য সঞ্চয়ন, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ৫ম সং, পৃঃ ১৪২

রইল, রইল কত অপূর্ণ সাধ। কবি কিন্তু সকল বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন,—

সময় হলে ছাড়তে তরী
বাজবে যখন বাঁশী
তার আগেই হিসাব ছাড়ি
উঠব গিয়ে তাড়াতাড়ি
বলব না কো—"দাঁড়াও সারেঙ্গ
কাজটা সেরে আসি।"

(যাবার আগে)

এর পরে কয়েকটি কবিতায় পরাধিগত, শৃঙ্খলিত দেশ ও দুর্গত দেশবাসীর জন্য কিছু আশা, উদ্দীপনার বাণী রচনা করেছেন।

পূর্ব পারের দেশ আমাদের, উদয় দিগন্তের প্রথম আলো আমাদের ললাটেই স্পর্শ করে। সুপ্ত মগ্ন দেশবাসীর চেতনা জাগিয়ে তুলছেন উদ্দীপনার বাণীতে—

জাগা ডেকে, জাগা ঠেলে,
বল—"ঘুমোতে নাই,—
নূতন যুগে প্রভাত নব,
আমরা আবার বাহির হব ;
গেয়ে নূতন গান।

(যুগ প্রভাত)

'জাগরণী সঙ্গীতে' এই উদ্যম, এই চেতনা আরো গভীর, ঋদ্ধিতে, জ্ঞানে পূর্ণ প্রতিটি স্তবক—

জাগরে আমার আমি,
জাগরে দেহের স্বামী,
নূতন আলোকে স্ফূর্ত্ত
জাগো জাগো।

(জাগরণী সঙ্গীত)

রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' 'চৈতালি'তে ভারতের গৌরবগাথার মত কামিনী রায়ও অতীতচারী হয়েছেন।

হে ভারত জেগেছিলে সকলের আগে,
নেহারি প্রভাত সূর্য্য, উচ্ছ্বসিত চিতে
আনন্দ বিস্ময়ে মুগ্ধ, আশা অনুরোধে
ভরে ছিলে চারি দিক নব নব গীতে।

(নব জাগরণ)

কিন্তু ভারত আপনার সাধনা, ধ্যান-ধারণা ভুলে মূঢ়তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল—

সেই কালে ধ্যানের পশ্চাতে
আসিল কি ঘোর তন্দ্রা, করিল বপন
মন্ত্রতন্ত্র, ক্রিয়াকাণ্ড, জ্ঞান শক্তি যাতে
নিদ্রিত নিষ্ক্রিয় রাখি জাগায় স্বপন ?

(নব জাগরণ)

'চরৈবেতি' মন্ত্র ভুলে ভারত অচলায়তনে নিজেকে স্থবির করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উক্তি—

যে জাতি চলে না কভু তারি পথ পরে
তন্ত্র মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।[১]

আশা, ভাষা জোগানোই কবিদের কাজ। তাঁরা স্রষ্টা, তাঁরা সত্যদ্রষ্টা,—তাই Great men think alike।

কামিনী রায়ের

তবে এইবার
দাঁড়াও মা, আপনার পায়ে করি ভর
চেয়ে দেখ, দেখ চেয়ে পূর্ব্ব সিন্ধুপার
উদিছে নবীনভানু, অপূর্ব্ব ভাস্কর।

(নব জাগরণ)

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তও বলেছিলেন, "এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না— আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কাল স্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণ প্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠে বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যা বিজ্ঞান মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।"[২]

'দুর্ব্বলের ক্রন্দনে' সকল দুঃখ অবসানের জন্য কবির আকুল প্রার্থনা। 'এরা', 'নর্ম্মদার শিষ্য', 'ওরে তোরা ভাবঘেরর দল' প্রভৃতি কবিতা মুক্তিকামী সর্বত্যাগী সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে রচিত। 'তাহারি জয় হোক' দেশাত্মবোধ ও বিশ্ববোধের মহান্ উপলব্ধির দ্বারা অভিব্যক্ত।

'আমার' বলে শক্ত করে
ওরে ঘরে রাখবে ধরে
মা জননি, তাও কি কভু হয় ?

(তাঁহারি জয় হোক)

১। রবীন্দ্রনাথ, দুই উপমা, চৈতালি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬২

২। বঙ্কিমচন্দ্র, আমার দুর্গোৎসব, কমলাকান্ত

রবীন্দ্রনাথের 'স্নেহগ্রাসে'র সঙ্গে এর অভিন্নতা বিশেষ নেই। রবীন্দ্রনাথও পুত্রবতীকে স্নেহবন্ধন থেকে মুক্ত সন্তানের মুক্তি প্রার্থনা করেছেন,—

দীর্ঘ গর্ভবাস হতে জন্ম দিলে যার
স্নেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার ?[1]

(স্নেহগ্রাস)

কারারুদ্ধ চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রকে দেখে 'মুক্তবন্দী'তে তিনি যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তা তুলনাহীন।

লৌহদ্বার কারাগারে আজি অকস্মাৎ
মনে হয় ভবিষ্যের পেয়েছি সাক্ষাৎ ;
মনে হয় ভারতের ভাগ্যলিপিখানি
বিধাতার হস্ত হতে ক্ষণতরে আনি
কে মোরে দেখায়ে গেল।

(মুক্তবন্দী)

তাঁর সেই সত্যদর্শন ব্যর্থ হয় নি। যদিও তিনি শৃঙ্খলমুক্ত ভারতকে দেখে যেতে পারেন নি কিন্তু তাঁর সেদিনকার অনুভবই পরম সত্য।

'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' এই আর্যবাণী এ যুগে চিত্তরঞ্জনের জীবনে পরম সত্য হয়েছিল। ভোগী চিত্তরঞ্জন ত্যাগী চিত্তরঞ্জনে রূপান্তরিত হয়ে এক মহান্ আদর্শের সৃষ্টি করলেন। কবি সে কথা উল্লেখ করে 'মুক্তবন্দী'র বন্দনা শেষ করেছেন।

কোনদিন ভোগে মুক্তি ভেবেছিলে মনে,
আজ তুমি ত্যাগে মুক্ত, বসি দেবাসনে।

(মুক্তবন্দী)

'সত্যগ্রাহী'র তিনখণ্ডে 'জীবের মাঝে শিবের বাস' সে কথাই বিভিন্ন ভাবে, ভাষায় প্রকাশ। 'এরা যদি জানে', 'সেবা ধর্ম্ম', 'তারকেশ্বরীয়' সেই একই উপলব্ধিতে রচিত। একই ভাবধারা নিয়ে 'ধরায় দেবতা চাহি' পর্যন্ত পরপর কবিতাগুলি মহামানবের জয়গান। বহু বছরের রচনা বলে 'দীপ ও ধূপে'র বিচিত্র ভাবনার লীলা তরঙ্গায়িত। দুর্গতদের জন্য তাঁর অন্তর ভারাক্রান্ত, চোখে উদ্বেল অশ্রু। সমাজের নিম্ন স্তরের দিক হতে দৃষ্টি পড়েছে নারীজাতির প্রতি। দিকে দিকে নারীর লাঞ্ছনা, নারীর নিগ্রহে সমস্ত নারীর প্রতিভূ হয়ে তিনি উচ্চকণ্ঠে নারীর দাবি জানালেন,—

জ্ঞানের আলোক, ন্যায়ের বিচার
তারে দিতে হবে ভাই।

১। রবীন্দ্রনাথ, চৈতালি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬১

নারী আত্ম-সচেতন হয়ে উঠেছে, তাকে পদদলিত, বঞ্চিত করে রাখা যাবে না—'নারী জাগরণে' সেই প্রত্যয়।

'ঠাকুরমার চিঠি' আলাদা পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশিত হলেও এটি 'দীপ ও ধূপে'র বহুধা-ভাবনার একাংশ।

'ঠাকুরমার চিঠি', 'নাতিনীর জবাব' এবং 'নাতবৌ-র জবাব'-এ দুই যুগের নারীর চিন্তা, আদর্শ ও লক্ষ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। নারীর সকল আদর্শ, কল্যাণ কামনা কবিচিত্তকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এই তিন কবিতায় নারীর ত্রিবিধ ভাবের প্রকাশ।

'ঠাকুরমার চিঠি' গৃহকোণে নারী আপনাকে স্থির রেখে পতি, পরিজনের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেবে, এমনভাবে গড়ে তুলবে পুত্রকে যে সে হবে দেশের ও দশের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

> তোরা মাতা, তোরা জায়া, তোরা ভগ্নীরত্ন,
> প্রাণ দিয়া প্রিয়জনে দিস সেবাযত্ন ;
> ... ...
> দেহের সাথে ওরে নারী চাহিস্ মনের ঋদ্ধি
> তবেই মাতা ভগ্নীরূপে নারীজন্মের সিদ্ধি।
>
> (ঠাকুরমার চিঠি)

যুগের ধারার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তীকালে নারীর চিন্তা ও ভাবে পরিবর্তন আসে। নারীপ্রগতি এ দেশের নারীর চিত্তকে নাড়া দেয়। গৃহকোণেই নারীর একমাত্র স্থান—একথা তাঁর মনকে ভরিয়ে রাখতে পারে না।

> বিজ্ঞান কি শিল্প যদি করে আকর্ষণ
> অ-নারী সে নহে যদি সঁপে তার মন।
> ... ...
> আমাদের আত্মা আছে দেহে আছে প্রাণ,
> অমৃতের পুত্রী মোরা আলোক সন্তান।
> আত্মার বিকাশ চাহে নানা দিক দিয়া
> এ যুগের নরনারী, নীতি বিসর্জিয়া।
>
> (নাতিনীর জবাব)

'নাতবৌ-র জবাব' আরেক ধাপ এগিয়ে গেছে। নাতবৌ জানে স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য তাকে আধুনিকা হতে হবে, এতেই তার শান্তি, এতে তার গৃহরক্ষা।

> যবনের রাঁধা ইংরাজের খানা
> স্বামী সঙ্গে খায় সবে ; করিবে কি মানা ?
> ... ...
> আসল কথাটি এই পুরুষে যা চায়
> নারী তাই হতে পারে, তাই হয়ে যায়।
>
> (নাতবৌ-র জবাব)

কোন একটা বিষয়ে কবি-ভাবনা নিরুদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। তাঁর দৃষ্টিপাত সর্বত্র, বিশেষ কিছু চেতনাকে নাড়া দিলে ছন্দোবদ্ধরূপে দেখে শ্রদ্ধায় তদ্‌গত হয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে শোকবিহ্বল বাসন্তী দেবীকে সহানুভূতি জানাতে কত গভীর বাণী উল্লেখ করেছেন।

কার মৃত্যু ? লক্ষ বক্ষে যে পেয়েছে ঠাঁই
সে কি মরে দেহ নাশে ? মৃত্যু তার নাই।

(শোকে আশীর্ব্বাদ)

চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের বাণী আরো গভীরতর।

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

'প্রণতি'তে কামিনী রায় আপন হৃদয়খানি অঞ্জলি দিয়েছেন বিশ্বনাথের চরণে—

এক যিনি অদ্বিতীয়, অখিল বিশ্বের নাথ
সকল মানব সন্তান যার, তারে করি প্রণিপাত,
করি বিনয়ে প্রণিপাত।

(প্রণতি)

যঃ প্রণতো নিমিষ তো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব।
যঃ ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

(ঋগ্বেদ)

ঋগ্বেদের এই শ্লোকটির ছায়ানুসরণ হয়েছে উপরিউক্ত কবিতায়। আবার 'তাঁরে পিতা জানি, তাঁরে প্রভু মানি, চিনিব মানুষ ভাই।' যজুর্বেদের বিখ্যাত শ্লোকটির অনুকরণে রচিত।

পিতা নোঽসি
পিতা নো বোধি
নমস্তেঽস্তু।

৪৫, ৪৬, ৪৭ সংখ্যক কবিতাগুলিতে ছেলেবেলার স্মৃতি-আলোড়ন। বাখরগঞ্জে তাঁর পৈতৃক ভিটে, বালিকা বয়সে ঐ জলময় দেশেই কেটেছে। জীবনের শেষ বেলায় পূর্বপারের স্মৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন, 'গাঙ্গ যে মোরে বোলায়', 'নিশানা', 'বরিশালের মাঝি' নামক কবিতা। মাঝিদের ভাষাতেই কবিতার জন্ম।

'গাঙ্গ যে মোরে বোলায়' কবিতাটির আবেদন হৃদয়স্পর্শী। এক মুসলমান মাঝির নৌকাডুবিতে মৃত্যু হওয়ায় তার বিধবা ছেলেকে জলে যেতে দিত না। একদিন রাত্রে নদীতে বানের শব্দে ছেলের ঘুম ভেঙে যায়। মার কাছে তার করুণ প্রার্থনা—

ঘুম ভাঙলো দুফর রাইতে বুকটা ধড়ফড়ায়
দুই চক্ষু আন্ধার ঠেল্যা গাঙ্গের দিকে চায়,

বাঁশের খুঁটি লড়্যা ওঠে, ব্যাড়ায় ব্যাতের বাঁধন ছোটে,
তোমার কাঁদন কাঁটার মত ফোটে আমার গায়,
এমন কালে বোলায় গাঙ্গু—'আয়রে মানিক আয়।'

মায়ের মন পাবার জন্য বলে—

আমার মনে লয় বাপজান যেন কয়,
"মায়ের দুঃখ ঘুচাবি তো ঘর ছাড়্যা আয়—"
মাগো আবার শোনা যায়—
আয়রে মানিক, দোল থামিয়ে ধলা ঢেউ দোলায়।
গাঙ্গই মোরে বোলায়, নাকি বাপজানই বোলায় ?
মাগো বাপজানই দোলায়।

'বরিশালের মাঝি'তে পূর্ববঙ্গের মাঝির গ্রাম্য ভাষায় সুন্দর উদাহরণ—

বাপের নায়ে ফেরলাম কত দ্যাশ দ্যাশান্তর
ঝড়ে পড়লাম বার সাতেক—বদর বদর।
গৌরবরণ কালা হৈল, ধলা হইল ক্যাশ
একটা আছে বড় পাড়ি সকল পাড়ির শ্যাশ।

'নিশানা'ও নৌকা যাত্রার কবিতা—এতে পল্লী সৌন্দর্য অপরূপ, চিত্রকল্প কবিতাটির অঙ্গ। 'দূরের আহ্বান' (পূর্বাহ্নে, অপরাহ্নে), 'শিমুল', 'হাসনুহানা', 'কাল-বৈশাখীতে পাতার নৃত্য' কবিতাগুলিতে কবির প্রকৃতি-তন্ময়তা। প্রকৃতির রূপরাশি দুই চোখ মেলে দেখা, আর সৌন্দর্য ধ্যানে কবিতা রচন।

'স্নানযাত্রা', 'সেকালের তীর্থ যাত্রী' 'মন্দির প্রতিষ্ঠা' প্রভৃতি কবিতারাজি উদার দৃষ্টি ও অন্তরের মাধুর্যে এক অনির্বাণ দীপ্তি লাভ করেছে।

দীর্ঘকাল ধরে রচনা 'দীপ ও ধূপ' বিভিন্ন বয়সের অভিজ্ঞতা ও বিভিন্নভাবে পরিপূর্ণ। 'সংশয়বাদী', 'প্রত্যয়বাদী', 'ভীরু কবি'; আবার ঘরোয়া চিত্র 'প্রবীণার অভিজ্ঞতা', 'স্বামী ও সন্তান', 'সমবেদনায় পত্নী', 'শঙ্কিতা জননী'তে অজস্র চিন্তায় চিহ্নিত।

শেষের দিকে শেষ যাত্রার ভাবনায় মন বিধুর। 'তাই হোক তবে' তাঁর স্মরণ কবিতা; 'ছাড়িয়া চলিলে ভবে'তে জীবনের বন্ধন মুক্তির কথা; 'মরণের ডাক' একই ভাবনার অপর দিক।

'অবেক্ষণ' উন্মুক্ত দৃষ্টির অবাধ প্রসার, সৃষ্টির অনন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে স্রষ্টার অসীম লীলার উপলব্ধি কবির রচনাকে জ্যোতির্ময় করেছে।

১৩৪০ সালের আশ্বিন মাসে কামিনী রায়ের জীবনাবসান হয়। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কবিতা আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় তাঁর স্বরাট স্বাধীন। মৃত্যুর পরে অঘ্রাণ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ 'রবীন্দ্র পরিচয়', 'স্থবিরা', 'নবীনকর্মী'। 'নবীনকর্মী'তে 'আলোছায়া'র কিশোরী কবির লাজনম্র

মূর্তিই যেন প্রকাশিত। জীবনের বহু সম্মান, খ্যাতি প্রতিপত্তির পরেও বিনীত কণ্ঠে আবেদন—

বিশ্বকর্ম্মা দয়া করে দাও না কিছু কাজ
কর্ম্মশালায় তব ;
বড় কাজে দিলেই হাত পাব দারুণ লাজ
ছোট কাজেই রব।

সনেটের কথা না বললে কামিনী রায়ের কাব্যালোচনা পূর্ণাংগ হয় না। তাঁর কাব্যমাল্যের বহু কবিতা চতুর্দশপন্থী। কাব্যগঠনে হেমচন্দ্রকে তিনি 'মানস পিতা' মনে করলেও রচনায় কিন্তু ছিলেন মধুসূদনপন্থী, সনেট ছিল তাঁর প্রিয় প্রকাশ মাধ্যম। জীবনের গভীর কথা তিনি সনেটে রূপ দিয়েছেন। 'অশোক সঙ্গীত' (১৯১৪) ও 'জীবন পথে'র (১৯৩০) গভীর দুঃখ তিনি সনেটে প্রকাশ করেছেন। 'অশোক সঙ্গীতে'র ৫৮, 'জীবন পথের' ৬৪টি কবিতা, 'দীপ ও ধূপের' ১০টি, এবং 'মাল্য ও নির্মাল্যে'র ৪টি নিয়ে তাঁর সনেটের সংকলন ১৩৬টি। তিনি সনেটের ক্লাসিকাল রীতি অনুসরণ করলেও 'দীপ ও ধূপে'র 'সেবাধর্ম' ও 'সমবেদনায় পত্নী' সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকের সমষ্টি। সনেট বলতে আমাদের অষ্টক-ষটকের বিভাগটাই মনে পড়ে। উপরিউক্ত সনেট দুটি ছাড়া তাঁর আরো তিনটিতে এই বিভাগ নেই—বাকীগুলোতে তিনি সনাতন পন্থী। ২২টি সনেটের অষ্টকে চতুষ্ক বিভাগ আছে এবং ৩১টি সনেটের ষট্‌ক-যুগল ত্রিক বন্ধনে রচিত।

১৩০২ সালের 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত (পৃঃ ৭২-৭৩) 'কালু ও ভুলু' শিশুদের জন্য রচিত একটি আখ্যায়িকাধর্মী কবিতা। 'গুঞ্জন' নিজের শিশুদের ঘিরে সহজ সুখের কবিতাপুঞ্জ। তার সুর আলাদা, ভাব আলাদা। 'কালু ও ভুলু'র মত কামিনী রায়ের কবিতা আর নেই। এ আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত। কবিতাটি পুরোপুরি তুলে দিলাম ;—

যদ আর মধু যবে উঠিতেছে নায়
কালুর ভুলুর সাধ সাথে তারা যায় ;
যদু আর মধু বলে "না-না বসে থাক,
এখনি আসিব ফিরে দূরে যাব নাকো।"
নৌকায় বাড়ায়ে ছিল দুটি দুটি পা,
ইসারা পাইয়া নামে মুখে নাই রা।
তরিখানি বহে যায় দূর কত দূর—
একদৃষ্টে চেয়ে আছে দুইটি কুকুর ;
ইচ্ছা মনে., পিছু পিছু ঝাঁপাইয়া পড়ে
ইশারা পাইয়া থাকে এক পা না নড়ে।
চোখের আড়ালে ক্রমে গেল তরিখানি,
ঘুরে ঘুরে কেঁদে মরে দুটি মূক প্রাণী।

সাদা জলে সোনা ঢেলে রবি অস্ত যায়,
পাখীরা উড়িয়া চলে আপন কুলায়।
ওপারে যদুর কাজ হ'ল বুঝি সারা,
বাড়ী পানে তরিখানি ফিরাইল তারা;
দুটি আনন্দিত প্রাণী দাঁড়াইয়া তীরে
দেখে দুই প্রিয় জন আসিতেছে ফিরে।

১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'মুকুল' পত্রিকায় আরেকটি কবিতা প্রকাশিত হয়, এটিও শিশুদের উদ্দেশেই রচিত। 'সহজ পথ' নামক এই কবিতায় কামিনী নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দীপমান।

মহত্ত্বের শিক্ষা সত্য নিষ্ঠার দীক্ষা নিয়েছেন কবি—

অপরের কাজ ভাল কি না ভাল
বুঝিতে পারি না যবে
না করি নিন্দা না বলি সাবাস,
রসনা মৌন রবে।

ভাল যাহা বুঝি ভাল তা' বলিব
দশে বলে নাই বলে;
মহত্ত্ব শিখিব অবনত শিরে
মহতের পদতলে।

'প্রবাসী'র (১৩৩৭, কার্তিক) পাতা থেকে আরেকটি কবিতা তাঁর জীবন সায়াহ্নে রচিত। এটি কোন পুস্তকে সন্নিবদ্ধ হয়নি। প্রকৃতি প্রেম এবং ভগবদ্ভক্তিতে কবিতা উজ্জ্বল।

তোমার রূপেব জ্যোতি খেলা করে পরাণে আমার,
ওগো চাঁদ এত কাছে উজল এমন!

তোমার ওরূপ মোরে, শিশু করে দিয়েছে আবার,
কাঁদিয়া বাড়াই হাত, ধরিবারে মন।

এখানে রূপ নিষ্ঠা, এই রূপ সচেতনতাই তাঁর মনকে নিয়ে গেছে স্রষ্টার চরণে—

মুখে মোর কথা নাই চলে গেছি শব্দের ওপারে,
অবাক্ বন্দনা মোর আজি উপহার।
বনানী মুখর হল কোকিলের স্বরে—
আমার অন্তরে প্রেম জাগিছে নীরবে।

কাব্য ব্যতীত অন্যান্য রচনা

নাটক

অম্বা

'অম্বা' নাটিকাটি বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালীন ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে রচিত কিন্তু প্রকাশিত হল ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে। 'আলো ও ছায়া' কবিকে প্রচুর খ্যাতি এনে দিয়েছিল। তার দুবছর পরেই 'অম্বা' নাটিকাটি লিখে ২৪ বছর ফেলে রাখা আত্মপ্রচার বিমুখ লেখিকার কুণ্ঠা ও বিনয়ের প্রকাশ। তবে অমৃতলাল বসুকে লেখা একটা চিঠিতে জানা যায়, কামিনী রায়ের ইচ্ছা ছিল তাঁর 'অম্বা' ও 'পৌরাণিকী' অভিনীত হয়। 'অম্বা'র নিবেদনে কিন্তু কামিনী রায় লিখেছেন, "দুই বৎসর হইল কোন তরুণ পাঠক পাণ্ডুলিপি পড়িয়া বলিয়াছিলেন, "আহা! কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে কেন ছাপাইলেন না? তখন ইহার যে সমাদর হইত এখন তাহা হইবে না। It is too antiquated for modern taste." তাঁহার কথায় বুঝিলাম, কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত শব্দবহুল নাটকের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের অধিকার ছিল, এখন নাই।"

যাহোক, পুস্তিকাটির রচনার ইতিহাস একটি সুন্দর, মহৎ অন্তরের পরিচয়বাহী, লেখিকার নিজের লেখা 'অম্বা-চিত্র' থেকেই তার সন্ধান মেলে।

"একদিন—সে আজ চারিমাসের কথা—আমার কনীয়সী সোদরাদ্বয় মহাভারতীয় চিত্রসমূহ আলোচনা করিতেছিলেন। ক্রমে শিখণ্ডীর পালা উপস্থিত হইল। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের সম্মুখে শিখণ্ডীকে পুরুষ নহে, কাপুরুষ নহে, তদপেক্ষাও হীনতর কিছু মনে হয়। সেইদিন, বেচারার প্রতি তাঁহাদের ঘন ঘৃণা-ধারা সম্পাত দেখিয়া আমার বড়ই করুণার সঞ্চার হইল। সহসা শিখণ্ডীর কাপুরুষ মূর্তির পাশে ধিক্কৃতা, বিকৃতকান্তি, নিজ-তেজসা-দহ্যমানা অম্বার মহীয়সী রমণী মূর্তি স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল। তখন মহাভারত নিকটে ছিল না, তাই আমার মানসী ছবি নিজের তুলিকায় আঁকিয়া বালিকাদিগকে দেখাইতে বাসনা জন্মিল।"

"আমার তুলি গদ্যরসে কি পদ্যরসে ডুবাইয়া লইয়াছি, আমার তাহা ভাল ঠাহর হইতেছে না। আমার চক্ষু অম্বার মানসী মূর্ত্তিতেই সংসক্ত রহিতেছে।"—এ কথায় রচনার আঙ্গিক গঠনে লেখিকার ঔদাসীন্য প্রকাশ পেলেও, নাটিকাটির আদ্যোপান্ত পদ্যছন্দে রচিত। পঞ্চমাঙ্কে গঠিত এই কাব্যনাট্যে সেক্সপীরীয় রীতি অনুসৃত। সেক্সপীয়রের নাটক অনুযায়ী এ নাটকেও তৃতীয় অঙ্কে ক্লাইম্যাক্সের চূড়ান্ত। হৃদয়হীন, নিবীর্য, কাপুরুষ শাল্ব কর্তৃক কাশীরাজকে অবমাননা দ্বারা অম্বার প্রেম প্রত্যাখ্যান, শুধু প্রত্যাখ্যানই নয়, ব্রাহ্মণ দূতগণকে বিতাড়নে মানবতা বিরোধী-কঠিন পরুষবাক্য—

এত বড় স্পর্ধা ! মূঢ় তারে
কহিও, ব্রাহ্মণগণ, দাসীপুত্রে মম
দিলে হেন কন্যা, সেও করে প্রত্যাখ্যান
ঘৃণায় ।

যাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান সেই অম্বার এক অতুলনীয় চিত্র পাওয়া যায় ১ম অঙ্কের ১ম দৃশ্যে। অম্বা নারীকুলরত্না। কাশীরাজের সস্নেহ উক্তিতে কন্যার প্রকৃত পরিচয়—

জগদম্বা পূজা করি মোরা
পেয়েছিনু তোরে বৎসে। তুই একাধারে
এলি মোর উমা, রমা আর বীণাপাণি।

বিনম্র বচনে অম্বার অন্তরের দীপ্তি দ্বিগুণ প্রকাশিত।

জানি আমি জনকের বাৎসল্য অসীম,
আপন কিরণ ঢালি তনয়ার মুখে,
কাচখণ্ডে মণিসম করিছে উজ্জ্বল।

অম্বার পাণিপ্রার্থী শাল্বও সেদিন তাঁর গুণমুগ্ধ—

ধন্য অম্বার জনক
ধন্য প্রসবিনী তাঁর, নমি উভয়েরে।
ধন্য হবে সেই জন, বরমাল্যরূপে
জয়মাল্য দিয়া, যারে সসাগরধরা
জিনিবারে পাঠাবেন মহামহীয়সী
অম্বা।

যে দুজনের দৃষ্টিতে অম্বার শোভন মূর্তি প্রকাশিত, তাদের জন্যই অম্বার নারীজীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

পুত্রহীন কাশীরাজের অশেষ গুণবতী প্রিয়তমা কন্যার হৃদয়, তার সুখ অপেক্ষা রাজ্যের চিন্তাই বড় হল। তিন কন্যাকে একজনের হাতে সমর্পণ করে রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষাই কাশীরাজের ধ্যান, জ্ঞান।

বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে গরিমায় অম্বাকে পুত্রাধিক মনে করেন কাশীরাজ। অম্বার পরামর্শ ছাড়া কোন কাজই তাঁর হয় না। অম্বা যে চিন্তনে, মননে, করণে শুভংকরী, এতে তাঁর কোন সংশয় নেই। নির্দ্বিধায় তাই বলতে পারেন,

কাশীর কল্যাণে বৎসে, কুলকীর্তি মম,
রাখিতে উজ্জ্বল, যাহা হইবে বিহিত,
জানি তুমি করিবে তা।

কথাচ্ছলে অম্বা জানলেন, পিতা বীর্যশুল্কা করে তিন কন্যাকে সম্প্রদান করবেন, সুতরাং সর্বজয়ীর গলায় সকলকেই বরমাল্য দিতে হবে।

অম্বার সমস্যা এবং কাহিনীর ট্র্যাজেডির সূচনা এখানেই। যে কথা এতদিন গভীর গোপন ছিল, সেই হৃদয় প্রকাশ হল সখী কীর্তির কাছে। অন্তর বিলিয়ে বসে আছেন সৌভরাজ শাল্বের কাছে, কিন্তু প্রকাশের পথ নেই।

চেয়েছি জানাতে
যতবার, অবান্তর কথার মাঝারে,
শাল্ব নামে শল্য বিন্ধ যেন, ভ্রূকুঞ্চিয়া
সহসা ফিরান মুখ। কেমনে কহিব
আমি ভালবাসি শাল্বে, চাহি পতিরূপে?

বরনারী অম্বার জন্য একদিকে ভীষ্মের পত্র নিয়ে আসে হস্তিনার দূত, অন্য দিকে শাল্বের পত্র। ভীষ্মের বার্তায় যতখানি আনন্দ, শাল্বর পত্রে ততটাই বিরক্তি। বিশেষ করে 'সুধাবে কন্যায় চাহে কিনা চাহে মোরে', কাশীরাজের এ এক অদ্ভুত প্রস্তাব বলে মনে হয়। মন্ত্রী কিন্তু তাঁকে শুভ পরামর্শ দেন—

"গূঢ় অর্থ আছে
এ কথার। মহারাজ ডাকিয়া নির্জ্জনে
শুনুন কন্যার কথা। অনিচ্ছায় তাঁর
বরান্তরে সম্প্রদান হবে অনুচিত।"

রাজ্যের সকল শুভাশুভে যে কন্যার মতামত একান্ত গ্রাহ্য, এ ব্যাপারে বালিকা বলে তাঁর হৃদয় ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু মন্ত্রীর প্রতি কথায় অম্বার প্রতি সম্ভ্রম ও গভীর আস্থা।

"মনস্বিনী তিনি,
এই মন্ত্রগৃহে বহু কূট সমস্যার
দিয়াছেন সুমন্ত্রণা।"

কিন্তু রাজার দৃষ্টি এক চক্ষু হরিণের মত রাজ্যের দিকে নিবন্ধ। কন্যার অন্তর, ভবিষ্যৎ সেখানে তুচ্ছ। অবশ্য কন্যার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার পর তিনি রায় দিলেন,

যদি বিবাহের দিনে নৃপতি সমাজে
শাল্বে তোর মনে হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলি।
যদি সেই দিবসের জয় পরাজয়ে
নাহি বিচলিত হয় ইচ্ছা আজিকার।
প্রকাশ্যে সে কথা, আমি করিয়া প্রচার,
ফিরায়ে আনিয়ে তোরে দিব শাল্ব করে।

দ্বিতীয় অঙ্কে নাটকীয়তার উচ্ছল প্রকাশ, নাটকের গতি দ্রুত। অম্বার চিঠি নিয়ে দূত দেবলের যাত্রা। রাজপথে ছদ্মবেশী শাল্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ। পত্রপাঠে শাল্বের আস্ফালন।

অম্বা সিংহাসন অর্দ্ধে বসিবেন যবে
জগৎ লুটাবে পদতলে উভয়ের।

অপর দূত কাশীরাজের চিঠি নিয়ে আসে শাল্বের প্রার্থনার উত্তরে। সেই চিঠি শাল্বের মনে জ্বালা ধরায়, ক্ষাত্র তেজে অগ্নিসংযোগ করে। এরপর দ্রুত এগিয়ে যায় ঘটনাবলী। ভীষ্ম একা ক্ষত্রিয়কুলকে পরাজিত করে তিন কন্যা নিয়ে ত্বরিৎ-গতিতে রথ চালিয়ে যান। প্রবল শক্তিতে পথ অবরোধ করলে দুই রথীতে যে সংঘর্ষ হয়, তাতে শাল্বকে পরাজিত হয়ে প্রস্থান করতে হয়।

মহামতি ভীষ্ম অম্বার প্রার্থনায় তাঁকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু যে শাল্বের জন্য হস্তিনার মহিষী ও কুলবধূর পূর্ণ গৌরব উপেক্ষা করে অম্বা চলে এলেন, তাকে প্রত্যাখ্যান করে নারীত্বের অবমাননায় অম্বার জীবনে নামল ঘন দুর্যোগ। এরপর ভীষ্মও কাশীরাজের পত্রের উত্তরে জানান, অন্যপূর্বা কন্যা গ্রহণের অযোগ্য। কাশীরাজের পিতৃস্নেহ নিঃশেষ, তিনিও ধিক্কার দেন,

অধন্য জন্ম তব। কাশীরাজকুলে
নিবিড় কালিমা তুমি।

শিরা উপশিরায় অম্বার ক্ষত্রিয়-শোণিত জ্বলে উঠল। তাঁর লক্ষ্য ভীষ্মের ধ্বংস, ক্ষুদ্র শাল্ব নয়। তপস্যা বলে অমেয় শক্তি অর্জন করে ভীষ্মের পতন তাঁর কাম্য।

কঠোর তপস্যায় অসাধ্যসাধন হল। আরাধনা-তৃপ্ত মহাদেব দর্শন দিয়ে তাঁর বাঞ্ছাপূরণের বর দিলেন। পাশুপত অস্ত্র দিলেন ভীষ্ম নিধনের জন্য। মৃত্যুর নিশান হাতে অম্বা স্বীয় অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখেন, নারীহৃদয়ের গভীরে প্রতিহিংসা, ধ্বংস নয়, শান্তির রাজ্য সেখানে। কাজেই পরজন্মে ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হয়ে পুরুষ জন্ম লাভের বর নিয়ে অবাঞ্ছিত দেহ অগ্নিতে আহুতি দিলেন।

কামিনী রায় অম্বার হীনতা দূর করে তাঁকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করে অগ্নি-শুদ্ধ করেছেন। কিন্তু মহাভারতকারের হাতে এক লাঞ্ছিতা, অবমানিতা নারীর অবমান দেখি।

তবে ভীষ্ম বলে তুমি বড় দুরাচার।
পুনঃ না লইব তোরে ধর্ম্মের বিচার॥
এত শুনি হৈল কন্যা পরম দুঃখিত।
সেই কালে অগ্নিকুণ্ড করিত ত্বরিত॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি করিল প্রবেশ।
ভীষ্মের বধের হেতু কামনা বিশেষ।

(মহাভারত, কাশীরাম দাস)

প্রমথনাথ চৌধুরীর কবিতায় অম্বার নারীমূর্তি আরো ধিকৃতা, বিকৃতা।[১]

১। অম্বা, শ্রী প্রমথনাথ চৌধুরী, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১০, পৃঃ ১৩০-১৩২

হস্তিনার পথে যাত্রাকালে অম্বা নিজের প্রেমের কথা জানিয়ে ভীষ্মের কাছে বিদায় প্রার্থনা করছেন।

কহিলা গাঙ্গেয়, শুভে কহ মোরে কোন্ ভাগ্যধরে
বরিয়াছ, যাঁর লাগি তুচ্ছ কর হস্তিনা ঈশ্বরে।
ভাল করে বুঝে দেখ, আপনারে করো না বঞ্চনা ;
জেনো স্থির, তব সাধে নাহি দিব বাধা সুলোচনা।
যেথা চাও, যেতে দিব, কিন্তু একা পথের মাঝারে
পারিবনা ছাড়িতে তোমারে।

পথে নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গেই অম্বার জীবনে দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনার সূচনা। শাল্বের কাছে গেলে তিনি প্রেমের মূল্য তো দিলেনই না, উপরন্তু ভীষ্মের করধৃত বলে তাঁকে যথেচ্ছ অপমানসূচক কথায় লাঞ্ছিত করলেন।

ফিরে এলেন অম্বা হস্তিনার রাজ-অন্তঃপুরে। গাঙ্গেয় তখন স্নানসমাপনান্তে পূজা আয়োজনে ব্যস্ত : অম্বার সেখানে আগমনে তাঁকে ভীষ্মের চিনতে দেরী হল না। সসম্ভ্রমে তাঁকে আসন দিলেন। কিন্তু সেই নারী যখন গদগদ ভাষণে প্রেম নিবেদন করলেন তিনি নির্বাক, নিস্পন্দ।

"কি বুঝিবে, কি জানিবে কারে বলে রমণীহৃদয় ?
বড় দুঃখ তাই মনে, নারী যাহা প্রাণান্তে না কয় ;
জানাতে হইল তাহা আসি আজ পুরুষের দ্বারে
—ভালবাসে অভাগী তোমারে।

অনেক ছলাকলা হৃদয়ের ভাষা প্রকাশের পর ভীষ্ম গম্ভীর কণ্ঠে জানালেন।

"শুনিনি প্রতিজ্ঞা মোর, করিবনা বিবাহ জীবনে ?
সন্ন্যাসীর শূন্যদ্বারে পূরিবে না আশা রাজবালা,
যোগ্য কণ্ঠে দাও গিয়ে মালা।

সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলে, অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা নারী দলিতা ফণিনীর মত ফুঁসে উঠলেন,

আমারো প্রতিজ্ঞা তব ব্রহ্মচর্য্য, বীর্য্যদম্ভ ঢালা
যদি নাহি করি ধূলি, ত্যজিব জীবন। এত বলি'
গরবিনী বেগে গেল চলি।

...নারীর লাঞ্ছনায় ভীষ্মের হৃদয় বিন্দুমাত্র টলল না। প্রশান্ত মুখে তিনি পূজায় বসলেন।

পৌরাণিকী—১৮৯৭

একলব্য

রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীর বিষয় নির্বাচনে ও বর্ণনা ভঙ্গীতে 'একলব্য', 'ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ', 'রামের প্রতি অহল্যা', 'যযাতি ও দেবযানী' পৌরাণিকীর

এই চার অধ্যায় মহনীয় শ্রী ধারণ করেছে। লেখিকা কোথাও পুরাণের আখ্যানকে অতিক্রম করেননি। সত্যকে অবিকৃত রেখে কাহিনী চয়নের গুণে ফুটিয়ে তুলেছেন মানবিকতা, চিত্তের ঔদার্য, সহনশীলতা। নিষাদতনয় একলব্য প্রিয়দর্শন, প্রথম থেকে শেষাবধি চরিত্র-মাহাত্ম্যে অদ্বিতীয়। জামদগ্ন্যের ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ক্ষাত্রতেজ তার কাছে শুধু নিষ্প্রভ নয়, কালিমালিপ্ত।

চৈতন্যদেব প্রচার করেছিলেন, 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ'। একলব্যের উজ্জ্বল মহিমান্বিত মূর্তিখানি এখানে দেখতে পাই; হরিভক্তিপরায়ণ নয়, একলব্য গুরুভক্তি পরায়ণঃ। নিষ্ঠা ও ভক্তিতে কী অসাধ্যসাধন করা যায়—সেই পরীক্ষায় একলব্যকে আজ পর্যন্ত কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি। কর্ণের আগ্রহ, মিথ্যা-উপদেশ ম্লান হয়ে যায়, একলব্যের সত্যের দীপ্ত-প্রভায়।

'নহ তুমি ক্ষত্রিয়কুমার, মিথ্যাকথা,
মিথ্যা আচরণে তাই দাও উপদেশ
বিদেশীরে। নিষাদেরা অনার্য যদ্যপি
তথাপি অসত্য বাক্য ঘৃণা করে তারা।

(১ম অংক, ১ম দৃশ্য, পৃঃ ১৫)

নিষাদ সন্তানের চরিত্রের আকাশস্পর্শী মহিমায়, স্ব-নিষ্ঠ একাগ্রতায় অস্ত্র-সাধনার আশ্চর্য সাফল্যে কুরুকুলের বালকেরা নিতান্ত তুচ্ছ হয়ে পড়ে। ভীম ও অশ্বত্থামার কথাবার্তায় আর্যোচিত কোন সংস্কৃতির সন্ধান মেলে না। সে তুলনায় অর্জুন সংযতবাক্, গুরুর প্রিয়তম শিষ্য, তার অভিমান স্বাভাবিক, যখন সে জানে একলব্যের গুরুও দ্রোণাচার্য। তবে এ অস্ত্রকৌশল শিক্ষা তো তাঁরই দান। চোখে মুখে দুঃখ, অভিমান স্ফুরিত হয়। তথাপি কোন অশালীন, অসংযত কথা, ভীম, অশ্বত্থামার মত অসহিষ্ণুতা দেখা যায় না। কিন্তু দ্রোণ! তাঁর ব্রাহ্মণ্যমহিমা, শস্ত্রনৈপুণ্য, গুরু-গৌরব সব যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল একদিনকার প্রত্যাখ্যাত, নিষ্ঠুরভাবে বিতাড়িত, সমাজের অতিনিম্নমানের অবহেলিত ব্যাধপুত্রের কাছে; সে উপলব্ধি কি তাঁর বোধের সীমায় এসেছিল!

গুরু তিনি, অথচ শিক্ষার্থী বালকের আগ্রহের ঐকান্তিকতা, সবিনয় করুণ আবেদন অনায়াস রূঢ়তায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দূর থেকে শিক্ষাদান পদ্ধতি নিরীক্ষণ—বালকের এ প্রার্থনা পূরণের উদারতাও ব্রাহ্মণ অস্ত্রবিদের ছিল না।

তুমি ইহাদের সাথে ভেবেছ বসিবে
একাসনে? ভাবিয়াছ ভরদ্বাজ সুত
হবেন চণ্ডাল গুরু!

এরপরেও একলব্যের করুণ প্রার্থনা—

আজ্ঞা কর দেব
দূরে দাঁড়াইয়া আমি করি নিরীক্ষণ
কার্য্য তব, দাসরূপে ফিরি পিছে পিছে।

দ্রোণ পথ-কুক্কুরের মত তাকে প্রত্যাখ্যান করেন—

যাও, যাও, গৃহে যাও। পারিনা পুরাতে এবাসনা।

অথচ সূতপুত্র কর্ণকে কেন অস্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন এ এক গূঢ় রহস্য।

এরপরে একলব্যের অসাধ্য-সাধন, শিক্ষাজগতে এক অতুল আদর্শ। গুরুদ্রোণের মূর্তির সামনে ধ্যান ও অস্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ।

শিষ্যদের মুখে অত্যাশ্চর্য শস্ত্র-পারংগমতার কথা শুনে সদলে দ্রোণের আগমন ও তাঁকেই গুরু-বরণের কথা জেনে গুরু-দক্ষিণা দাবি।

ঘৃণ্য কাজকে অনার্যোচিত বলে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা হয়। আর্য-অনার্যের পরিচয় কোথায়—জন্মে না কর্মে!

ভীমের তো সংযমের বালাই নেই। গুরুর জন্য অনায়াসেই দাবি করে 'দাও শির তব জটাজুটময়।' না দ্রোণ অত নিষ্ঠুর নন—তাঁর প্রার্থনা সামান্য—

দিবে যদি

সমূলে কাটিয়া দাও দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি।

(৪র্থ অংক, ৩য় দৃশ্য, পৃঃ ৪১)

একলব্য অম্লানবদনে আঙ্গুল কেটে বলে,

ক্ষুদ্র এ অঙ্গুলি,

নহে কিন্তু ক্ষুদ্র দান, এ দক্ষিণ হাত

বহু তপস্যায় লব্ধ অর্ধ জীবনের

শিক্ষাসহ গুরুদেব, এই লহ তবে।

(৪র্থ অংক, ৩য় দৃশ্য, পৃঃ ৪১)

সমস্ত শক্তিকে সমূলে ছেদন করে সশিষ্য দ্রোণের প্রস্থান। দীর্ঘকাল পরে মাতাপুত্রের মিলনে কথাবার্তায় একলব্যের হৃদয়খানি শতদলের মত বিকশিত। লেখিকার রচনাগুণে তার মানবমহিমা অপূর্ব দীপ্তি লাভ করে চির উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ

পরবর্তী কাহিনী 'ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ'-এ দ্রোণের চরিত্র মহান ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর কাছে শস্ত্র শিক্ষার্থী হয়ে এলে ক্ষমা, সহিষ্ণুতা সকল গুণেরই বিকাশ তাঁর মধ্যে দেখা যায়। তবে এই ছলে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতেও ছাড়েন না।

নহে নিতান্ত কল্পনা

সেই পৌরাণিকী কথা, ব্রহ্মার আননে

ব্রাহ্মণের জন্ম—তার গূঢ় অর্থ আছে।

একলব্যের উপাখ্যানে দেখেছি কী নিষ্ঠুরভাবে তার শিষ্যত্বের প্রার্থনা উপেক্ষা করেছেন, সামান্যতম কৃপাও তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে

কথায় তাঁর ঔদার্যের অভাব নেই। জমদগ্নির প্রতি পুঞ্জিত ঘৃণা, ক্রোধ, জিঘাংসা সবই তাঁর বুকে ছিল অগ্নিগর্ভের মত, যুদ্ধে পরাজয়ের আগে পর্যন্ত। তাই অনায়াসে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলতে পারেন,

আমার যা আছে
অস্ত্রজ্ঞান দিই আমি ব্রাহ্মণের মত,
পাই যদি উপযুক্ত পাত্র।

একলব্যের বেলায় এই মনোভাব কোথায় ছিল! ধৃষ্টদ্যুম্নের শিষ্যরূপে আগমনের উদ্দেশ্যও তিনি জানেন, তবু তাকে প্রত্যাখ্যান করেন না, তাঁর অন্তর আকাশের মতই উদার।

তুমি পিতৃতপস্যার ফলে
জন্মিয়াছ মৃত্যু মম। আজ শিষ্য তুমি,
আমি গুরু। সুক্ষত্রিয় সুব্রাহ্মণ কভু
করেনা কলহ অন্ধ নিয়তির সাথে।

একদিন সভাকক্ষে বাল্যবন্ধু দ্রুপদকৃত অপমান বুকে জ্বালা ধরিয়েছিল অগ্নিশিখার মত, দিনরাত্রি তাঁর অন্তরে প্রদাহ। দারিদ্রের জ্বালায় একদিন পাঞ্চাল রাজ্যে গিয়ে সখা বলে আহ্বান করতেই—যজ্ঞসেন বাল্যস্মৃতি সব অগ্রাহ্য করে ধূলি মলিন ব্রাহ্মণকে উপহাস করেন।

"দরিদ্র এ চীরবাসা
অর্দ্ধাহারে শীর্ণ, ভিক্ষা চাহে,
ভিক্ষা দিব, সখা বলি বাতুলের মত
কেন আপনারে হেন হাস্যাস্পদ করে।"

সেই অপমান দীর্ঘদিনেও ভুলতে পারেন নি দ্রোণ, ভোলা সম্ভব ছিল না। সুযোগ্য শিষ্য অর্জুনের হাতে দ্রুপদের পরাজয়ে সেই জ্বালা মিটেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণের মান ধনে নয়, জ্ঞানে, তাও জানিয়ে দেন কথাচ্ছলে—

হে কল্যাণ, আমি সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ
তখন যে মান ছিল, বাড়ে নাই তাহা
রাজ্যার্দ্ধের যোগে,—আছে সতত সমান।

যৌবনের তেজ চলে যেতে মনের জ্বালা মিটেছে। ধৃষ্টদ্যুম্নের কিশোর আননে বাল্যবন্ধুর প্রতিচ্ছবিতে স্নেহ, মমতা পুনঃ সঞ্চারিত হয়েছে। দ্রোণের মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা নিয়েই ধৃষ্টদ্যুম্নের অস্ত্রবিদ হতে আসা অস্ত্রগুরু দ্রোণের কাছে, তাতেই দ্রুপদের প্রতিহিংসার নিবৃত্তি; জেনেও সস্নেহে বন্ধুপুত্রকে গ্রহণ করেন।

এস, এস বৎস লহ
যাহা আছে, নহে শুধু সংগ্রাম কৌশল।

পূর্ববর্তী আখ্যানে দ্রোণের কলংকিত চেহারাখানি লেখিকার কাহিনী চয়নকৌশলে এখানে অনেকটা বর্ণাঢ্য হয়েছে।

রামের প্রতি অহল্যা

মানবতায় পূর্ণ 'রামের প্রতি অহল্যা'য় চিত্রখানি। করুণাঘন রামচন্দ্র দীর্ঘ-লাঞ্ছিত, অবহেলিত অহল্যাকে পবিত্র নারীর পূর্ণ মর্যাদা দিলেন। পাষাণপ্রায় প্রাণহীন বক্ষে আবার আশা ভাষার সঞ্চার করলেন। প্রেমবর্ষণে বহুকালের জড়ত্বের অবসান ঘটল। এমন পুণ্যস্পর্শে অহল্যার জীবন ধন্য। তাই অহল্যার মনে হয়,

> পর্ব্বত সমান গ্লানি কিছুই সে নয়,
> তব পুণ্যলোক স্পর্শ যে শান্তির সীমা
> সে শান্তি জীবনে মোর দিয়াছে মহিমা
> সমুজ্জ্বল।

আলোকের পুণ্যধারায় যেমন নিবিড় ঘন আঁধার দূরীভূত হয়ে যায়, তেমনি রামের পূতস্পর্শে কলঙ্কমুক্ত অহল্যা পৃথিবীতে একটি অমৃতোপম স্মরণীয় নাম হয়ে থাকবে। এই আদর্শে জগতে পতিতারা আবার পাপপঙ্ক থেকে উঠে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় জীবনের সন্ধান পাবে।

প্রাণহীন ভগ্নদেহে আবার জীবনের আলোর বিকাশ হবে অহল্যা-অধ্যায়ের আগে কে জানত! অহল্যার পূর্ণপ্রাণের নিবেদনে জীবন থেকে বিচ্যুত নারীর করুণ প্রার্থনা—

> নারীর সতীত্ব যায়, মানব ভাষায়
> শোনা ছিল, নারী কভু সতীত্ব যে পায়
> তুমি তো দেখালে প্রভু, সে কারণে রাম,
> চির স্মরণীয় হবে অহল্যার নাম।

জগতের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, দুর্গতদের জন্য কবির করুণার দৃষ্টি যে দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছে, কাহিনীগুলি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

যযাতি ও দেবযানী

'যযাতি ও দেবযানী' উপাখ্যানটি রচনাগুণে, বর্ণনা ভংগীতে অনুপম। লেখিকার হৃদয়ের অনুরাগ-রঞ্জিত যেন কাহিনীটি। কাহিনীতে মহাভারতকারের পূর্ণ অনুসরণ থাকলেও বয়নকৌশলে কামিনী রায় অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। যযাতির কাছে দেবযানীর সারাজীবনের অনুরোধ প্রকাশই মূল বিষয়বস্তু। বলার ভংগীতে কী অপরূপ হয়ে উঠেছে। 'কি বলিতে চাই' যযাতির এই প্রশ্নের উত্তরে দেবযানী বলেন,

> 'সব কথা হায়
> সুদীর্ঘ ক্রন্দন হয়ে বাহিরিতে চায়।'

ক্রোধমত্ত হৃদয় নিয়ে এতকাল উল্কার বেগে ছুটেছেন দেবযানী—কল্যাণ, অকল্যাণের কথা ভাবেননি। ক্রোধবশে প্রিয়তমকেও অভিশাপে জর্জরিত করেছেন। এবার আত্মগ্লানির পালা।

ব্রাহ্মণ্য দর্পিতা,
ক্রোধে চণ্ডালিনী, বক্ষে জ্বালিয়াছে চিতা
নিজ হাতে। ঈর্ষা, ক্ষোভ, ঘৃণা, অভিমান
বিষদিগ্ধ শরে বিঁধি নিজ মর্ম্মস্থান।
ক্ষমাহীন নির্ম্মম সে দুর্ব্বলে লাঞ্ছিতে
দলিয়াছে পদতলে আপন বাঞ্ছিতে
অজ্ঞাত অদৃষ্ট দোষে। আজ সুপ্রকাশ
চক্ষে তার জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস।

অপরিমেয় পিতৃস্নেহে দেবযানীর আত্মসংযম ছিল না। বাল্যসখী শর্মিষ্ঠার সামান্য দোষে আজীবন তার প্রতি অন্যায় ব্যবহার দেবযানীর অসম্বৃত চরিত্রের পরিচয়। সংযত, সংহত দৈত্যরাজকন্যা শর্মিষ্ঠা সব নীরবে মেনে নিয়ে দেবযানীর সেবা করে গেছেন; কোন ত্রুটি রাখেন নি। কিন্তু তার কুমারী হৃদয়ের পূর্ণ প্রেমের পরিচয় যযাতি পেয়েছেন, তিনিও এই বরনারীর প্রেম আপন বক্ষে তুলে নিয়েছেন। দেবযানী ক্ষমা করতে শেখেন নি। কাজেই যযাতি ও শর্মিষ্ঠার গোপন প্রেমের প্রকাশ পেতেই দুঃসহ ক্রোধে আপন প্রিয়জনকেই শাপদগ্ধ করলেন। সুকুমার যৌবদেহে জরাভার চাপিয়ে পিতৃগৃহে প্রস্থান। যযাতি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় জরার বিনিময়ে পুত্রদের যৌবন প্রার্থনা করলেন। দেবযানী পুত্রদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হলেও শর্মিষ্ঠার সুযোগ্য সন্তান পুরু পিতার জরাভার গ্রহণ করতে সম্মত। এবার দেবযানীর অনুশোচনার পালা। পূর্বকৃত বহু অপরাধের স্মৃতি তাকে দগ্ধ করে। যযাতির সঙ্গে কথোপকথনে এই মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করা যায়—

জরাভার দিয়া
তব দেহে; জান না তো লয়েছি বরিয়া
কি ভীষণ আধিব্যাধি; আত্মার ভিতর
দাহিতেছি মর্ম্মে মর্ম্মে।

এই আত্ম-অনুশোচনায় পূর্বজীবনের সকল চিত্র তাঁর চোখে স্পষ্টতর হতে, শর্মিষ্ঠার তুলনায় নিজেকে হেয় মনে হয়। ক্ষমাহীন হৃদয়খানি মরুর শূন্যতা, তার জ্বালা নিয়ে অহর্নিশ দগ্ধ হচ্ছে। এতদিনে তাঁর মনে হয়েছে,

ব্রাহ্মণের রীতি
নিয়ম, সংযম, তার এক পত্নী প্রীতি—
ক্ষত্রিয়ানী দেবযানী সে সবের লোভ

কেন রাখে ? কেন হেন ক্রোধ আর ক্ষোভ
উন্মত্ত করিবে তারে ?

পুরুর আত্মদান দেবযানীকে মুগ্ধ করেছে। সেই সঙ্গে মনে হয় তাঁর পুত্রগণ তাঁর মতই আত্মসুখপরায়ণ। তিনি এতদিনে উপলব্ধি করেছেন,

শর্মিষ্ঠা সুন্দরী, শান্তা, শিল্পকলাবতী,
যত হোক সে গৌরব, প্রেম তার অতি
না থাকিলে, হেন পুত্র জনমে কি তার ?

অনুতাপে, অনুশোচনায় দেবযানীর অন্তরের সমস্ত গ্লানি ধুয়ে মুছে পবিত্র সুন্দর হয়ে ওঠে।

বামাবোধিনী পত্রিকা
আশ্বিন, ১৩০৪

পৌরাণিকী

'আলো ও ছায়া' প্রণেতৃ প্রণীত।

'আলো ও ছায়া'র গ্রন্থকর্ত্রীর কবিত্ব শক্তি বঙ্গসমাজে সুপরিচিত, নাটক রচনায় তাঁহার যে সুন্দর ক্ষমতা আছে তাহার প্রমাণ পৌরাণিকীর অন্তর্গত একলব্য চরিত্র। মহাভারত পাঠকেরা জানেন একলব্য নামক ব্যাধসন্তান দ্রোণের নিকট শস্ত্র শিক্ষার্থী হন। কিন্তু দ্রোণ নীচজাতীয় বলিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, একলব্য অরণ্যমধ্যে মৃন্ময় দ্রোণমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া গুরুভক্তি যোগে এরূপ ধনুর্বিদ্যা লাভ করেন যে, তাঁহার নিকট দ্রোণের প্রিয়তম শিষ্য অর্জ্জুন পর্যন্ত লাঞ্ছিত হন। শিষ্যদিগের আবদারে দ্রোণ গুরুদক্ষিণাস্বরূপ ব্যাধপুত্রের দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ প্রার্থনা করেন এবং সে দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা ছেদন করিয়া দেয়। এই উপাখ্যান অবলম্বনে একলব্য যেরূপে রচিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা নাটকাভিনয়ের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। পৌরাণিকীতে আরও দুইটি সুন্দর কবিতা আছে।

নব্যভারত
মাঘ, ১৩০৪

পৌরাণিকী (কামিনী রায়)

পৌরাণিকী—আলো ও ছায়া প্রণেতৃ প্রণীত।

একলব্য ব্যাধ তনয়। বড় সাধ দ্রোণাচার্য্যের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিবেন। চণ্ডালের সন্তান বলিয়া ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে উপেক্ষা করিলেন। দ্রোণাচার্য্যের এই জাতিবিদ্বেষ রহস্য বুঝা যায় না। গ্রন্থকর্ত্রী মহাভারতকে অতিক্রম করেন নাই। মহাভারত দ্রোণাচার্য্যের চরিত্র রহস্য সম্যক প্রকাশিত করেন নাই। ব্রাহ্মণের সন্তান পেটের দায়ে ক্ষত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। পৈতৃক ব্রাহ্মণগুণ স্বোপার্জ্জিত ক্ষত্রগুণের সম্মিলনে কি রূপ ধারণ করিল, জানিতে ইচ্ছা

হয়। ইচ্ছা মিটেনা ; দ্রোণচরিত্র রহস্যপূর্ণ রহিয়া যায়। দ্রোণ কর্তৃক দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বন আমরা ব্যাখ্যা করিতে পারি। সংখ্যায় হীনতর হইলেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষ প্রকৃতপক্ষে অধিকতর বলশালী ছিল। ভীষ্ম, দ্রোণ দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করিলে কাপুরুষতার দুরপনেয় কলঙ্ক তাঁহাদিগের ললাটে চিরদিনের জন্য লিপ্ত হইত। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও, অবিনীত ও অসদাচারী জানিয়াও দ্রোণ ক্ষাত্রতেজে দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু যিনি সূতপুত্র কর্ণকে ধনুর্বেদ শিখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই, একলব্য চণ্ডাল তনয় বলিয়া তাহাকে কেন উপেক্ষা করিলেন, তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন বুঝা যায় না। গ্রন্থকর্ত্রী দ্রোণ চরিত্রের ঐ রহস্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন নাই। একলব্য নিষ্ঠা ও সাধনায় ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিলে নীচাশয়ের মত দ্রোণাচার্য্য তাহার নিকট যে গুরুদক্ষিণা যাচঞা করিয়া লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও গ্রন্থকর্ত্রী মহাভারতের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ চণ্ডালতনয় অনার্য্য একলব্য আর্য্যব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্যকে আর্য্যগুণে অতিক্রম করিয়াছেন। আর্য্যরচিত মহাভারতই ইহার প্রমাণ—একলব্যের গুরুভক্তি ভীমার্জ্জুনের মোহকরী, সে গুরুভক্তির চিত্র এ সাম্যস্বাধীনতার যুগে দেবচিত্রের ন্যায় গৃহেগৃহে শোভা করে আমাদের কামনা। সে চিত্রখানি চিত্রকরী অদ্ভুত কারুকৌশলে রচনা করিয়াছেন,—

তোমারে বরিয়া গুরু, রচি মূর্ত্তি তব
এই মূর্ত্তি আনিয়াছি তপস্যার বলে

* * * *

শিষ্য, স্পৃশ্য আমি আজি
ভগবন্‌ কর মোরে কর আশীর্ব্বাদ

ভয় ভাবনা সন্দেহ দীর্ঘজীবনে অবশ্যম্ভাবী। কঠোর সাধনায় এ নিত্য সম্ভাবী অন্তরায় হইতে নিষ্কৃতি পান নাই! সেই বিপদের সময়ে একটি আকাশবাণী তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিল।

সেটি প্রকৃত দেবসঙ্গীত।

আছে এ জগতে আছে এ জগতে
গৌরবমণ্ডিত সিদ্ধিস্থান
বাসনা থাকিলে যেতে পথ মিলে

* * * *

হয় দেবধ্যানে ভকতের প্রাণে
দেবের অধিষ্ঠান।

হয় দেবধ্যানে ভকতের প্রাণে দেবের অধিষ্ঠান ; কথাটি অতি পুরাতন উপনিষদের কথা ; কিন্তু কথাটি বড় মিষ্ট বড় মূল্যবান।

শ্রীমতী দীর্ঘজীবিনী হউন।

সিতিমা (গদ্য নাটিকা)—১৯১৬

কামিনী রায়ের সাহিত্য রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য মানবতাবাদ,—মনুষ্যত্বের বিকাশ তাঁর সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'সিতিমা'তেও মানব-চরিত্রের বিশিষ্ট গুণের সমাবেশ দেখিয়েছেন।

ছটি দৃশ্যযুক্ত একাঙ্ক নাটিকা এটি। রাজ অন্তঃপুরের কাহিনী। রাজপুরীর গায়িকা সিতিমা এর নায়িকা, নায়িকা প্রধান নাটিকা 'সিতিমা'। রাজবাড়ীতেই আবাল্য পালিকা, গায়িকারূপেই শিক্ষিতা। এখানকার নৃত্যগীত পটীয়সীগণ মহারাজের জন্য নিবেদিতা। মহারাজের কৃপাকটাক্ষ জুটলে সৌভাগ্যের সূচনা, না হলেও জীবনের ব্যর্থতাতেই ডুবে থাকতে হবে, অন্য কারোর প্রতি আসক্তি প্রদর্শন কোনমতেই গ্রাহ্য নয়।

নায়ক উজ্জ্বল সিংহ মহারাজের স্নেহধন্য পূর্বপক্ষীয় শ্যালক ও দ্বিতীয় সেনাপতি। নায়ক, নায়িকা দুজনেই আদর্শ চরিত্র।

উজ্জ্বল বীর ও সচ্চরিত্র হয়েও মোহ ও ভ্রান্তিবশে চন্দ্রার (নর্তকী) রূপজমোহে বিভ্রান্ত হয়ে বিপদগ্রস্ত হওয়া, কলঙ্কিত হয়ে কারাবন্ধ হওয়া এক দুর্যোগের ইতিহাস ; এ থেকে সিতিমা উদ্ধার করেছিলেন তাকে অসাধারণ সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে। উজ্জ্বলসিংহের কারালাঞ্ছনা নিজে নিয়ে ত্যাগ ও নিষ্কলুষ প্রেমের অসাধারণ নজীর রচনা করেছিলেন। কারামুক্ত উজ্জ্বল রাহুমুক্ত সূর্যের ন্যায় চরিত্র মাধুর্যের গৌরবপ্রকাশ দেখাতে সক্ষম হলেন। মহারাজ বীরভদ্র মহানুভব, গুণীজনকে ন্যায্য মর্যাদা দিতে ছিলেন জাগ্রত দৃষ্টি। উজ্জ্বলসিংহের জন্য বরাবর একটু স্নেহ-কোমল আন্তরিকতা ছিল। এবার উজ্জ্বলসিংহের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে যথার্থ আনন্দিত। সিতিমার আত্মত্যাগে সবাই বিহ্বল। দুর্জন সিংহের চক্রান্ত তাঁর কাছেই সবাই জানতে পারে।

বিয়োগান্তক হলেও লেখিকা অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে নাটিকাটির সমাপ্তি রেখা টেনেছেন। নাটিকার গানগুলি এর গৌরব বাড়িয়েছে। এগুলি সময়োপযোগী ও গভীর অর্থবহ। প্রতিটি গান মর্মস্পর্শী। গানই নাটিকাটির প্রাণ।

শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে গানগুলি কালোপযোগী ও উদ্দীপনাব্যঞ্জক—

জীবনরক্ষা দেশের লাগি
দেশরক্ষায় মরণ মাগি,
লজ্জাহরণ মরণ মাগি—
মৃত্যু অমর কীর্তিময়।

জয় রাজাধিরাজের জয় জন্মভূমির জয়।

(পৃঃ ২)

সিতিমার প্রতিটি গান অতুল্য। সিতিমা প্রকৃত অর্থে শিক্ষিতা। উজ্জ্বল সিংহের মহাবিপদে নিম্নোক্ত গানটি গেয়ে তার প্রাণে আশার সঞ্চার করেন।

লভ জীবন, শুভ জীবন, নব জীবন।
আছে যে করিতে অনেক কাজ
আছে যে ঘুচাতে দারুণ লাজ ;
ছাড়িতে নাহি একটি দিন, প্রহর, দণ্ড, ক্ষণ—
লভ জীবন, শুভ জীবন, নবজীবন।

(পৃঃ ২০)

আরেকটি গান লেখিকার জীবন দর্শনের পরমোপলব্ধি—

আর তো আমার এ জীবনে পাওনা কিছু নাই
বাঁচা গেল বাঁচা গেল গো।
ভিতর বাহির ঘুচল ভেদ, সকল বাঁধন হল ছেদ
সুখের তরে নাইকো খেদ, দুঃখের দাহ নাই,
সাধ মিটেছে ঘুচে গেছে সকল বালাই
বাঁচা গেল বাঁচা গেল গো।

(পৃঃ ৩৯)

শেষ গানটি আরো অর্থপূর্ণ, আরো গভীর—

মোরা মৃত্যু করিনা ভয়
সে নহে শেষ, সে নহে ক্ষয়
মোরা মৃত্যু করি না ভয়।
কেহ আগে যায়, কেহ পাছে
কেহ জীবিতে মৃত কেহ মরিয়া বাঁচে—
মৃত্যু রহস্যময়, মোরা মৃত্যু করি না ভয়।

(পৃঃ ৬১)

গানের ভিতর দিয়েই লেখিকা জীবনের মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন। গানে গানেই নাটিকাটির গৌরব বাড়িয়েছেন।

শ্রাদ্ধিকী

শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত অতি আপন কয়েকজনের স্মরণিকা এই "শ্রাদ্ধিকী" পুস্তিকাখানি। এক হাতে চির-বিচ্ছেদের অশ্রুমোচন, অপর হাতে প্রিয়জনের উদ্দেশে স্মৃতির অঞ্জলি গাঁথা সহজ কর্ম নয়। Elegy বা শোক কাব্য অন্য সাহিত্যের মত বাংলাতেও কিছু আছে। কামিনী রায়ের "জীবন পথে", 'অশোক সঙ্গীত'ও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস দমনের পর আবেগমথিত হৃদয়ে Elegy রচিত হয়। গদ্যে পদ্যে রচিত মানকুমারীর 'প্রিয়প্রসঙ্গ' বা চন্দ্রশেখরের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' Elegy-র স্তরেই পড়ে। কিন্তু 'শ্রাদ্ধিকী' একেবারে ভিন্ন জাতের, ভিন্ন স্বাদের। Elegy রচনায় সময়ের হিসেব নেই,—কালের

্যবধানে মন কিছুটা শান্ত হবার অবকাশ পায়। কিন্তু শ্রাদ্ধবাসরে স্মৃতি ত‍র্পণের জন্য যে রচনা, এই স্বল্প সময়ে অন্তর বেদনামুক্ত হতে পারে না।

প্রিয়জনের বিরহে শোকবিহ্বল হৃদয়ে লেখিকার উপর কয়েকবারই এই স্মৃতি-কথা লেখনের ভার পড়ে। নিয়ত সাহচর্যের ফলে যে জীবন ছিল খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ, চাওয়া-পাওয়ার সীমানার বাইরে বহুদূরে চলে যাওয়ায় তাকেই স্পষ্ট, সুন্দর ও সম্পূর্ণ মনে হয়। সেই জীবনের রেখাঙ্কন করেছেন তিনি। আশ্চর্য শান্ত, সংযত চিত্তে তিনি হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এঁদের উদ্দেশে অর্পণ করেছেন; বাংলা সাহিত্যে "শ্রাদ্ধিকী" তুলনা বিরল গ্রন্থ। সদ্যোগত ব্যক্তির জীবন কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনও অত্যন্ত কঠিন। ভূমিকাতে লেখিকাও সে কথাই বলেছেন, "আমার স্বামীর ঘটনাবহুল জীবনের সম্পূর্ণতর কাহিনী, তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর পরে, চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে লিখিয়া ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই বেদনা-বিমূঢ় অবস্থায় কোনপ্রকারে জীবনের স্থূল কথাগুলি লিপিবদ্ধ হইয়া শ্রাদ্ধবাসরে উপাসনান্তে পাঠ করিবার জন্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে অর্পিত হয়। উহার আরম্ভভাগ আমার ভগিনী সংকলন করেন। পিতৃদেবের চরিতের প্রথম অংশটুকুও তাঁহার রচনা।"

তিনি এ অবস্থাতে লিখতে বসেও অসাধারণ চিত্তসংযম দেখিয়েছেন। কোথাও অসংযত উচ্ছ্বাস নেই, নেই কোন হাহাকার। এই লেখা অতি সহজেই মনের গভীরে প্রবেশ করে। প্রথম দুটি লেখায় লেখিকাকে পাওয়া যায়, কাজেই বিচ্ছেদ-বেদনার গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু শেষের দুটি রচনায় লেখিকাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। জানা না থাকলে এঁদের সঙ্গে সম্পর্কের নৈকট্যও বোঝা যায় না। যে জীবনসঙ্গীকে হারিয়ে আজীবন দুঃখের বেদনাভার বইতে হয়েছে—তাঁর স্মৃতি-তর্পণ করতে গিয়ে কোথাও নিজেকে প্রকাশ করেননি। গভীর শোকের বিন্দুমাত্র আভাস পর্যন্ত নেই। এখন আত্মসংযম শুধু অসাধারণ নয়, অভাবনীয়। এই উপলক্ষ্যে উপনিষদের বিখ্যাত শ্লোকটি মনে পড়ে,—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং—স্বাদ্বত্ত্য
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

দুয়ের মধ্যে এ কটি কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটি ভোগ না করে দর্শন করে। দ্বিধাখণ্ড মানসশক্তির অধিকারিণী মনে হয় লেখিকাকে, অন্ততঃ শেষ রচনাটিতে।

এ বিষয়ে লেখিকার বক্তব্যও স্মরণযোগ্য।

"গত কয়েক বৎসরের মধ্যে লেখিকার জীবনের উপর দিয়া বারবার মৃত্যু ও শোকের ঝটিকা প্লাবন বহিয়া গিয়াছে। শ্রাদ্ধবাসরে শোকাশ্রু মুছিতে মুছিতে বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া পরলোকগত প্রিয়জনের গুণ স্মরণ ও বর্ণনের

ভার একাধিকবার এই অযোগ্য জনের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এই কর্তব্য করিতে গিয়া শোকের বেদনা কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে; মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যের স্মৃতি এক শান্ত-প্রীতির ধারায় সন্তপ্ত চিত্ত সিক্ত করিয়াছে।"

এই স্মৃতি আলেখ্য ক্রমানুসারে গাঁথা হয়নি। সর্ব্বপ্রথমে তিনি সপত্নী কন্যা সরযূর গুণরাজি বর্ণনা করে স্মৃতিমাল্য রচনা করেছেন। এরপর ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ, পিতা চণ্ডীচরণ এবং সর্বশেষে স্বামীর স্মৃতি চিত্রণ। এই রচনা যতই কণ্টকর হোক এর মূল্য কম নয়। লেখিকার মন্তব্য থেকেই আরও উপলব্ধি করা যায়। "মৃত্যু যখন প্রিয়জনকে কাড়িয়া লয়, তখনই জীবন হইতে কতখানি প্রেম, কতখানি আনন্দ হারাইলাম, একবার ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। চরিত্রের যে মহত্ত্ব, যে সৌন্দর্য্য, হৃদয়ের যে প্রীতি ও সহানুভূতি, আত্মত্যাগের কঠোরতার সহিত আত্ম-বিস্মৃতির যে অপূর্ব মধুরতা, অতি নৈকট্যবশতঃ দেখিয়াও দেখি নাই, নিত্য ব্যবহৃত বস্তুর ন্যায় যাহা বড়ই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, মৃত্যুর বিদ্যুতালোকে শোকাশ্রুর ভিতর দিয়া, তাহা আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পায়। এই জন্য বিচ্ছেদ ও শোকের মধ্যেই আমরা প্রিয়জনের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহা-দিগকে ভাল করিয়া চিনিয়া লই। জীবনে তাঁহাদিগকে পদে পদে অবিচার করিয়া, মৃত্যুর পর অনুতাপ, অশ্রুপাত ও গুণ স্মরণ করিয়া কৃত অপরাধের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে চেষ্টা করি।"

'শ্রাদ্ধিকী'র বহির্ভূত আরও স্মৃতিচিত্রণ করেছেন। ১৩৩৭ সালের 'বিচিত্রা'য় মাতা বামাসুন্দরী ও ১৩৩৯ সালের 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে অনুজা যামিনী সেনের জীবনী-চিত্রও কম উল্লেখযোগ্য নয়। সত্যি 'শ্রাদ্ধিকী'তে চরিত্র রেখাঙ্কণ তুলনাহীন। এই সংকীর্ণ রচনায় জীবনের পূর্ণাবয়ব গড়ে ওঠে না। কিন্তু স্কেচ হিসাবে এ অপূর্ব। একেবারে স্পষ্ট প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন লেখিকা।

চণ্ডীচরণ

চণ্ডীচরণ সেনের যেমন সংগ্রামময় কর্মবহুল জীবন তাঁর কথাতেই "শ্রাদ্ধিকী" গ্রন্থের অর্ধেক ব্যয় হয়েছে। আর এতে তাঁদের পরিবারের, বিশেষ করে কামিনী রায়ের কুমারী জীবনের অনেক ঘটনা বিস্তৃতভাবে বিধৃত আছে। অল্প বয়স থেকে জীবনযুদ্ধে চণ্ডীচরণকে সৈনিকের বেশে সংগ্রাম করতে হয়েছে। নীতি ও আদর্শের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে তিনি অগ্রসর হয়েছেন।

জীবনের আদর্শ থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। সরকারী চাকরী করেও রাজরোষকে ভ্রূক্ষেপ করেননি। এর জন্য বহু দুঃখকে মাথায় করে নিতে হয়েছে। উপরে যতই কঠোর দেখাক তাঁর স্নেহ ছিল অন্তঃসলিলা। ১৯০৩ খৃঃ তৃতীয়া কন্যা প্রেমকুসুমের মৃত্যুর ব্যথা নীরবে সহ্য করেছিলেন। কিন্তু ১৯০৬ খৃঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী জ্যেষ্ঠপুত্র যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর আঘাত তাঁকে নিঃশেষ করে

দিয়েছিল। পুত্রের মৃত্যুর ঠিক তিন মাস পরে ১০ই জুন মৃত্যু এসে এই কর্মময় জীবনের অবসান ঘটায়।

যতীন্দ্রমোহন

মাত্র ত্রিশ বছরের স্বল্পায়ু যতীন্দ্রমোহনের। জীবনের পূর্ণ-বিকাশের আগেই সব শেষ। কিন্তু এর মধ্যেই পরার্থপরতার বহু দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিন কন্যার পর পুত্রলাভে পিতামাতার আনন্দ সীমাহীন হয়ে উঠেছিল। দানে, ভোজনে গৃহপ্রাঙ্গণ হয়েছিল উৎসবমুখর। অতিরিক্ত আদর পাওয়াই এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক, পেয়েছেনও। বালক যতীন্দ্রমোহনের ইচ্ছা ও আবদার দিনদিন বাড়তে থাকে। ফলে চণ্ডীচরণের আদর্শ কার্যে পরিণত করার জন্য ক্রমশঃ তিনি কঠোর হয়ে উঠতে লাগলেন। লেখাপড়ায় যতীন্দ্রনাথ পিতার আশানুরূপ ফল কখনোই করতে পারেননি; বি. এ. পাশ করার পর বি. এল. পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারলেন না। এদিকে জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়াতে সংসারের দায়দায়িত্ব তাঁর উপরেই এসে পড়ে। ১৯/২০ বছর বয়সে বেলতলার (৯৮ নং) বাড়ীটি তৈরী করার সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। বাড়ীর প্রতিটি জিনিস নিজে ঘুরে ঘুরে কিনেছেন। স্বাধীনভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে চৌরঙ্গীতে দোকান দিয়েছিলেন। এর পেছনে দিনরাত অমানুষিক খাটুনি গেছে। শরীরে সহ্য হল না। প্রথম-দিকে জ্বরকে গ্রাহ্যই করতেন না। নিয়মিত স্নানাহার, কাজ চলল। শেষ পর্যন্ত শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। ডাক্তারের পরামর্শে ওয়ালটেয়ারে চেঞ্জে গিয়েও কোন ফল হল না। এর পর গেলেন নেপাল। যামিনী সেন তখন সেখানকার ডাক্তার। যামিনী সেন সেবা, যত্ন, ঔষধ কোন কিছু দিয়েই আদরের ভাইকে রাখতে পারলেন না। ১৯০৬ খ্রীঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী জীবনদীপ নিভে গেল। কত ঘটা করে বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। এক বছরও পার হতে পারল না।

সরযূবালা

সরযূবালার চরিত্রচিত্রণে কামিনী রায় লিখেছেন, "সর্বপ্রথমে স্বামীর অনুরোধ ক্রমে প্রিয়তমা কন্যা সরযূর জীবন দূরস্থ ও নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির ন্যায় লিখিয়া দিই।"

সরযূবালার জীবন সরলতা, পবিত্রতা ও পরসেবাব্রতের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর জীবনলীলাতো মাত্র বাইশ বছরের সমষ্টি। জন্ম ১৮৮০ খ্রীঃ ৯ই জানুয়ারী, মৃত্যু ১৯০২ খ্রীঃ ৪ঠা নভেম্বর।

দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলতে ইচ্ছা করে,—

"শুধু দুদিনের খেলা,
ঘুম না ভাঙ্গিতে, আঁখি না মেলিতে
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা।"

মাত্র এগার বছর বয়সে মাকে হারাতে হয়। সেই বয়স থেকে সংসারের দায়িত্ব শুধু নয়, দুটি শিশু ভাই-বোনের গুরুভারও তার উপরেই পড়ে। এগার বছর বয়স থেকে বাইশ বছর পর্যন্ত পরার্থে অম্লান বদনে, স্বেচ্ছায়, বহু কঠিন কাজ করে গেছেন।

১৮৯৭ খ্রীঃ এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করার পরে যখন এফ. এ. পড়ার সংকল্প, তখন সেজ ভাই যোগেনের কঠিন রোগ দেখা দিল। কেদারনাথ অসাধারণ সন্তান-বৎসল ছিলেন। কলকাতায় চিকিৎসকগণের পরামর্শে মধুপুরে পাঠানো স্থির হলে সঙ্গে কে যাবে এই সমস্যা দেখা দিলে যাওয়া এবং একনিষ্ঠ সেবার জন্য সরযূ প্রস্তুত। পিতা পড়ার কথা জিজ্ঞেস করলে সরযূ বললেন, "যোগেনের চেয়ে কি পড়াশুনা বেশী?"

মধুপুরে রোগের বিন্দুমাত্র উপশম না হওয়ায় কলম্বো পাঠাতে প্রস্তুত হলেন কেদারনাথ। এবারও সরযূ সঙ্গে যাওয়া ও ভাইয়ের সমস্ত দায় নেবার আবেদন করলেন। সঙ্গে একজন আত্মীয় ছিলেন অভিভাবক। বিদেশে এই অষ্টাদশী তরুণী যেভাবে সমস্ত অবস্থার সঙ্গে যুঝেছেন, প্রত্যক্ষদর্শী সকলেই মুগ্ধ, বিস্মিত।

প্রতিটি ঘটনায় সরযূর অসাধারণত্বের পরিচয়। বিবাহের কয়েকদিন পরে নব-দম্পতি বিলাত চলে যান। সেখানেও সকলে তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ। বিমলচন্দ্র কেদারনাথকে লিখলেন, "I am proud of my wife!" বিলাতে সরযূর সংস্পর্শে যারা এসেছেন তাঁরাই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। এই বয়সে একজন তরুণীর পক্ষে এ যেন অসাধ্য সাধন।

রোগ নিয়ে দেশে ফিরে এলেন একা। দুরন্ত ক্ষয়রোগ তাঁকে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল। ডাক্তারের পরামর্শ মত দার্জিলিং-এ গিয়ে সাময়িক উন্নতি হলেও আস্তে আস্তে দুর্বল জ্বরে মৃত্যুমুখী হলেন। স্নেহময় পিতার দুঃখের কথা ভেবেই বাঁচবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সব ব্যর্থ করে একটি অমূল্য প্রাণ অকালে চলে গেল।

কেদারনাথ

এই সমস্ত জীবনের কথা লিখতে লেখিকা যেমন অন্তরের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তেমনই তাঁর রচনাও অমৃতবর্ষী হয়েছে।

কেদারনাথের জীবনও সকলের আদর্শ। লেখাপড়ায় খুবই মেধাবী ছিলেন। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে ১০ টাকা বৃত্তি পান। ইতি-মধ্যে বার বছর বয়সে ১৮৬৭ খ্রীঃ সৌদামিনী দেবীর সহিত তাঁর বিয়ে হয়। ১৮৭১ খ্রীঃ এফ. এ পরীক্ষার আগেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পিতা পুত্রের মতিগতি ফেরাতে অক্ষম হয়ে—ভগ্ন মনোরথ হয়ে মারা যান। এরপর আরম্ভ হল দুঃখের ও সংগ্রামের দিন। হিন্দু মতে শ্রাদ্ধ না করায় সমাজচ্যুত হলেন। বিকৃতমস্তিষ্কা

মা ও বালিকা বধূ নিয়ে ঢাকায় গিয়ে সংসার পাতলেন। তখন মাসিক বরাদ্দ ২৮ টাকা। ১৮ টাকা যেত কলেজের মাইনে, বাড়ীভাড়া ও পরিচারিকার বেতন। বাকী ১০ টাকায় তিনজনের খোরাক। এমন দিনও গেছে সেদিন কচি ঘাস শাকের মত রান্না করে খেতে হয়েছে। কিন্তু সেই সময়কার কথাই কেদারনাথ লিখেছেন, "This was the best and happiest period of our life."

এই অবস্থা থেকে ধৈর্য ও অধ্যবসায় বলে ক্রমে তিনি Statutory civilian পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৮৯১ খ্রীঃ জীবন সঙ্গিনীকে হারান। দুই ছেলেকে যখন শিক্ষালাভের জন্য বিলাত পাঠান তখন খুবই অসচ্ছল অবস্থা। কাজেই দুশ্চিন্তা, পরিশ্রম, দারিদ্র্য সবই মাথায় দুর্বহ ভারের মত চেপেছে। অসুস্থতা নিত্য ভুগিয়েছে। এমনও হয়েছে চলৎশক্তিহীন অবস্থায় ভৃত্যরা তাঁকে এজলাসে বসিয়ে দিয়েছে। ১৮৯৮ খ্রীঃ নতুন করে সংসার পাতলেন। পরিবারের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। এই অবস্থাতেও কর্তব্য নিষ্ঠা, সন্তান বাৎসল্য, সেবাপরায়ণতা যা তাঁর মধ্যে দেখা গেছে, অন্যত্র তা দুর্লভ। পুত্র-কন্যার মৃত্যু তাঁর কোমল হৃদয়ে বজ্রের মত বেজেছে।

কর্মক্ষেত্রেও তিনি অতুল্য ছিলেন। কোন কর্তব্যে ত্রুটি ছিলনা। বয়স বাড়ানো ছিল বলে ৫৩ বছর বয়সেই তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। তখনকার প্রার্থনা—"Oh merciful, give me peace and rest, open a new field for me and give me light and strength."

চিরকাল পরের ভাবনাই ভেবেছেন। আত্ম চিন্তার অবকাশ কখনও হয়নি। স্ত্রী-পরিবারের কথা ভাবতে ভাবতেই একদিন দুর্ঘটনায় তাঁর মহৎ জীবনের সমাপ্তি ঘটল।

পুস্তক পরিচয় প্রবাসী, ১৩২০

শ্রাদ্ধিকী

শ্রাদ্ধবাসরে বিবৃত কতিপয় সংক্ষিপ্ত জীবন। শ্রীযুক্তা কামিনী রায় বি. এ. প্রণীত (হাজারিবাগ)। প্রকাশক শ্রী সুধীরচন্দ্র সেন।

এই গ্রন্থে স্বর্গীয় চন্ডীচরণ সেন ও তাঁহার পুত্র স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেন এবং স্বর্গীয় কেদারনাথ রায় ও তাঁহার কন্যা স্বর্গীয়া সরযূবালা ঘোষের জীবনচরিত সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। চন্ডীচরণ ও কেদারনাথের জীবন সংগ্রামে পরিপূর্ণ। জীবনের প্রথম অবস্থায় ইঁহাদিগকে দারিদ্র্যের কশাঘাতে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইতে হইয়াছিল। "দারিদ্র্যদোষ সমুদয় গুণ নষ্ট করে"—ইহা সব সময়ে সত্য নহে, ইঁহাদিগের জীবন এই উক্তির জীবন্ত প্রতিবাদ। ইঁহারা উভয়েই স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন—চন্ডীচরণের মত পুরুষ সংসারে বিরল। ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, রাজনীতি সংস্কার সর্ব্বদিকেই ইঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল; গভর্ণমেন্টের কর্ম্মচারী হইয়াও রাজনীতি বিষয়ে কোন কথা বলিতে সঙ্কুচিত ও ভীত

হইতেন না। যাঁহারা চণ্ডীবাবুর গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন তিনি কি প্রকার নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না—এই পুরুষসিংহের বিস্তৃত জীবনচরিত প্রকাশ করা আবশ্যক।

সরযূবালার জীবন কি প্রকার নিঃস্বার্থ ও মধুময় ছিল, পাঠকগণ এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতেই তাহার পরিচয় পাইবেন। কেদারনাথের জীবনীও অতি সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে। একটুকু বিস্তৃত হইলে ভাল হইত।

গ্রন্থকর্ত্রীর ভাষায় আমরাও বলিতেছি—"জীবনের আদর্শে জীবন গড়িয়া ওঠে। উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ব্বপুরুষগণের পুণ্য-চরিত্র ভবিষ্যদ্বংশের নিজস্ব সম্পত্তি হউক, তাহাদের মহত্ত্বের ভিত্তির উপর ইহাদের সুন্দর সুদৃঢ় জীবন সৌধ উদিত হউক, কেবল ইহাদের মধ্যে নহে, এই চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও কল্যাণকর প্রভাব বিস্তীর্ণ হউক, সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা।

প্রবন্ধ

সুপ্তশক্তির জাগরণ
নব্যভারত, ১৩৩২

১৩৩২ সালে নব্যভারতে প্রকাশিত 'সুপ্তশক্তির জাগরণ' প্রবন্ধটি ১৩২৪ সালে কোন এক সভায় পাঠের জন্য রচিত হয়েছিল। আট বছর পরে লেখিকার মনে হয়, প্রবন্ধটির বিষয়বস্তুর সার্থকতা তখনও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তাই কিছু কিছু পরিবর্তনে সংস্কার সাধনের পর এটা পুনর্মুদ্রণের ছাড়পত্র দিয়েছেন। প্রবন্ধটি সুচিন্তিত, তথ্য ও যুক্তির সঙ্গে লেখিকার জ্ঞানের মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে ঘটনার আকস্মিকতা, তার প্রচণ্ড শক্তির কার্যকারণ নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ঢাকা ও রংপুরের ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবলীলার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, প্রকৃতির এই প্রলয়ংকরী লীলা মুহূর্ত কয়েকের মধ্যে যাত্রাপথের সব কিছু ধ্বংস করে যায়, এ আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। জনসাধারণ একে দৈব রোষ বলে ভীত হলেও, এই উন্মত্তশক্তি প্রকৃতির মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কোন কারণবশত: নিদ্রিত ভীমকায় দৈত্যের মত জেগে সৃষ্টির এক অংশ, যা মুঠির মধ্যে পায়, তাকেও লণ্ডভণ্ড করে দেয়।

লেখিকার মনন বৈচিত্র্য, গভীর চিন্তন, লিপি কৌশল সবই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু প্রকৃতির রহস্য কথাতেই তিনি বক্তব্য শেষ করেন নি—আরো সুকৌশলে তাঁর এই চিন্তাধারাকে মানবজগতে বিস্তার করেছেন। প্রকৃতির রাজ্যে যেমন, নর-রাজ্যেও তেমনি সুপ্ত বা সঞ্চিত শক্তির প্রবল প্রকাশ বারবার মানুষ দেখেছে। লেখিকার রচনাংশ থেকেই মানুষের রাজ্যের কথা বলা যাক।

"অগ্ন্যুৎপাতের মত, ভূমিকম্পের মত, ঘূর্ণিবায়ুর মত প্রবল প্রচণ্ড শক্তি প্রতিহিংসা, বিজয়াভিলাষ, ধনলালসা, ভূমিলালসা, বিজাতিবৈরিতা, পরধর্ম্ম-

বিশ্বেষ ইত্যাদি নানা আকারের এবং নানা প্রকারের মানবীশক্তি এক জাতির মধ্যে প্রকাশ পাইয়া অনেক সুখ দুঃখ এবং সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। সভ্যতার সৃষ্টি অসভ্যতার মৃতদেহ কংকালের উপর। যখন দুই শক্তিতে সংঘর্ষ, তখন একের দুর্বলতা অপর বিকাশের অনুকূল অবস্থা।"

তিনি বলেছেন, রোমের বিলাসিতাই তার পতন ঘটিয়েছিল গথ, আস্ট্রোগথ ও ভ্যান্ডেলদের হাতে। এই বিলাস ব্যসনে মত্ততাই রাজারাজড়াদের রাজ সিংহাসন প্রবল বন্যার মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফরাসী বিপ্লব তার চরম নিদর্শন।

মানুষ অত্যাচার সইতে সইতে এমন স্তরে এসে পেঁছায়, যখন তার অন্তরের রুদ্র দেবতা প্রচণ্ড শক্তিতে জেগে ওঠেন, রাজশক্তি কেন কোন শক্তিরই তখন তাকে দমন করার সাধ্য থাকে না।

লেখিকার মতে জগতে সনাতনত্ব অর্থহীন। সনাতন বলে কোন কিছুকে দাবী করা যায় না। যে বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্ম বিপুল বিক্রমে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, আজ কোথায় তারা? হিন্দুধর্ম যে সনাতনত্বের গৌরব দাবী করে—মহাকালের প্রবাহে তার স্থায়িত্বই বা কতটুকু! রূপের পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য।

লেখিকার এই প্রবন্ধ লেখার সময় আমাদের স্বাজাত্য বোধ স্বাধীনতা স্পৃহা জেগেছে। কিন্তু স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষায় যে একাত্মবোধের প্রয়োজন—সে বোধ তখন জাতির পক্ষে লুপ্ত। জাতিভেদ প্রথা দেশের মূলশক্তি ক্ষয় করছে। তার উপর শিক্ষার অভাব। লেখিকার মতে "স্বরাজ সম্ভব করিতে হইলে দেশের সর্বসাধারণের শিক্ষার এবং সেইসঙ্গে নারীদেরও শিক্ষার আবশ্যক। শিক্ষাই মানুষে মানুষে সমতা বিধান করিতে সমর্থ। মৈত্রী ও স্বাধীনতা ও শিক্ষাবিহীন হইলে দলাদলিও স্বেচ্ছাচারে পরিণত হইবে। শিক্ষার উপরই ধনবৃদ্ধি, আত্ম-সম্ভ্রম ও জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে।"

জাতিভেদ প্রথা ইউরোপ ও আমেরিকায় হয় তো আছে কিন্তু সেখানে উপরের দিকে উঠে যেতে সত্যকার বাধা কারোর নেই। কাজেই চর্মকারের ছেলেরও বিশ্ব-বিশ্রুত বিজ্ঞানী হতে বিপত্তি ঘটে না। আমাদের দেশের চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণের গণ্ডিরেখা ঘোচানো বড়ই কঠিন। লেখিকার আশা একদিন সব বাধা দূর হয়ে প্রকৃত মঙ্গল আসবে।

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দির

প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৭

১৩৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দিরে'র চতুর্থ বার্ষিকী উৎসবে সভানেত্রী কামিনী রায়ের অভিভাষণ এটি। তিনি তাঁর বালিকা বয়সের তুলনায় সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা দেখে উচ্ছ্বসিত। তাঁর ছেলেবেলায় অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় শতাধিক বছর আগে নারীশিক্ষা সীমিত ছিল। প্রগতিশীল

পরিবারের মেয়েরা ছাড়া অন্য কেউ গৃহকোণ ছেড়ে বহির্জগতে বেরোবার ছাড়পত্র পেত না। ১৩৩৩ সালে নারী শিক্ষার ব্যাপকতা সত্ত্বেও কলকাতার বাইরে এমন একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তাঁর চোখে বিস্ময় জাগিয়েছিল। মন্দির শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণের পর শিক্ষা মন্দিরের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন। ভক্তি, নিষ্ঠার নির্মল সংযোগ ঘটলেই হবে প্রকৃত শিক্ষা। বিদ্যাদান ও গ্রহণ বেচাকেনার হিসেব মাত্র নয়। চন্দননগরের স্বনামধন্য হরিহর শেঠ তাঁর জননী কৃষ্ণভাবিনীর স্মৃতি রক্ষার্থে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখান থেকে প্রকৃত শিক্ষালাভ করে ছাত্রীগণ ভবিষ্যৎ জীবনে যোগ্য জননী হয়ে উঠবে এই হয়তো ছিল তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। সার্ধশত বছর আগেকার বিদ্যালয় এখনও সগৌরবে টিকে থেকে প্রমাণ করছে সেই সাধু ব্যক্তির সাধু উদ্দেশ্যকে সেখানকার জনসাধারণ প্রকৃত মূল্য দিয়েছিল।

কামিনী রায় বালিকাগণের গান ও আবৃত্তির মুক্ত প্রশংসা করে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা বললেন—যা চিরদিনই স্মরণীয়। "মননশক্তি সম্পন্ন জীবরূপে মানুষের স্বাভাবিক শক্তিসমূহের অনুশীলন, যথাযথ পরিচালন ও উৎকর্ষসাধন—এক কথায় চিত্ত ও চরিত্র গঠনই শিক্ষা।"

ছাত্রীদের প্রতি তাঁর আশীর্বাণীও সুন্দর। "জ্ঞানের সঙ্গে প্রেম, প্রেমের সঙ্গে কর্ম্ম, কর্ম্মের সঙ্গে উদারতা ও নিরহংকারতা আসুক। এই কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা মন্দিরের নাম প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে।

অর্ধ শতাব্দী পরেও বিদ্যালয়টি সগৌরবে দাঁড়িয়ে নারীশিক্ষা মন্দিরের নাম ও প্রতিষ্ঠা ক্রমেই দৃঢ়মূল করছে।

শ্রীহট্টে শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের অভিভাষণ

প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৮

শ্রীহট্টে আয়োজিত একটি সভায় কামিনী রায়ের অভিভাষণ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছে প্রবাসীর ১৩৩৮ এর পৌষ সংখ্যায়। শ্রীহট্ট চৈতন্যদেবের পূর্ব-পুরুষগণের জন্মভূমি, অদ্বৈতপ্রভুর পৈতৃকনিবাস। অতএব ধর্মের কথাই যে তাঁর মূল ভাষণ হবে, তা অবধার্য। তাই শুরু করলেন ওখানকার লোকদের ধর্মপ্রাণতা ও সঙ্গীত প্রীতি নিয়ে, বললেন স্থানটি ভক্তিসাধনার অনুকূল। রঘুনাথ শিরোমণির জন্ম ক্ষেত্র শ্রীহট্ট, সুতরাং জ্ঞানচর্চারও পীঠস্থান। এই সকল ভক্ত ও জ্ঞানীদের স্মৃতির আলোকে অনুরঞ্জিত পুণ্যভূমিতে তিনি তীর্থদর্শনের ফললাভ করেছেন।

দেশের দুর্দিনে তিনি উপলব্ধি করেছেন, দেশের হিতার্থে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে; ব্যক্তিগত স্বার্থ বা পারিবারিক চিন্তায় নিজেকে আবদ্ধ রাখিলে দেশের মঙ্গলসাধন কোনমতেই সম্ভব নয়।

আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথার অন্তর্ঘাত চিরদিন তাঁর হৃদয়কে ব্যথিত করেছে। ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রাধিকার নিজেদের কুক্ষিগত রেখে সমাজের বড় অংশকেই

পায়ের তলায় অবদমিত রেখেছে। মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত এই অনুন্নত শ্রেণীর শাসন ও শোষণে দেশের অধোগতি ত্বরান্বিত হয়েছে। এদিকে বিলাসজীবনে অভ্যস্ত ধনী ও মধ্যবিত্তের বিদেশী পণ্যের সমাদরে দেশজ শিল্পের ঘটেছে অকাল মৃত্যু। হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ যুগে যুগে সঞ্চিত হয়ে পর্বতপ্রমাণ হয়েছে।

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক অনেক বাধার অপসারণ ঘটায় দেশ হয়েছে কালিমামুক্ত। "জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাবর্জন, ব্রাহ্মণ প্রাধান্য অস্বীকার, নারীর অবরোধ মোচন, নারীর উচ্চশিক্ষার প্রবর্ত্তন ইত্যাদি সামাজিক কল্যাণকর্মে সর্বপ্রথমে অবতীর্ণ হন।" এই সঙ্গে দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ এবং স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশনের জন্মও মানব হিতার্থে। খৃষ্টান মিশনরী-দের দ্বারা দেশের যে উপকার সাধন হয়েছিল—তাও লেখিকা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। "উজ্জ্বলতর জ্ঞানালোকে ও পাশ্চাত্য জাতি সকলের নিকটতর ও বিস্তৃততর সংস্পর্শে অনেক ক্ষতি সত্ত্বেও নৈতিক সাধনায় আমরা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছি। মানুষে মানুষে অবাধ মিলনে জ্ঞান বর্দ্ধিত এবং হৃদয় প্রশস্ত হয়, আত্ম-গরিমা সঙ্কুচিত হইয়া আসে। সকলের ধর্মশাস্ত্র সকলে মনোযোগ ও সম্ভ্রমের সহিত পাঠ করিলে মূলে আশ্চর্য্য ঐক্য অনুভূত হয়। সকল সাধু মহাপুরুষের সাধনা ও লক্ষ্যের মধ্যে আশ্চর্য্য মিলন।"

গান্ধীজীর হাত দিয়ে স্বদেশের যে উন্নতিসাধন, তার মূলে তাঁর আধ্যাত্মিকতা। "আজ এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ রাজনীতির মঞ্চ হইতে অবিদ্বেষ, ক্ষতি-সহিষ্ণুতা, অহিংস অসহযোগ, নিরস্ত্র সংগ্রাম, বিশ্বপ্রীতি সংযুক্ত স্বদেশপ্রেম, ভারতে হিন্দু-মুসলমান মিলিত এক জাতীয়তা প্রচার করিতেছেন, অগণ্য দেশবাসীর তিনি নেতা ও পুরোহিত, সর্ব্বদেশের সাধুজনের নমস্য। তাঁহার প্রচার মুখ্যতঃ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের উন্নতিকল্পে বলিয়াই আপাততঃ মনে হয়, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে দেখিতে পাই অসংখ্য দেশবাসী ও বহু বিদেশী চিত্তের উপর তাঁহার যে আশ্চর্য্য প্রভাব তাহার মূলে রহিয়াছে তাঁহার আধ্যাত্মিকতা। নিরস্ত্র, নিরীহ শীর্ণকায় এই মানুষটির ভিতরে আত্মার প্রভাব ছাড়া আর কোন প্রভাব আছে? কিন্তু এমন অসীম সাহসে দুর্জ্জয় রাজশক্তির প্রতিকূলে দাঁড়াইবার বল তাঁহার কোথা হইতে আসিল? ধর্ম্মবিশ্বাস হইতেই।" সুতরাং বোঝা যায়, ধর্ম সকল শক্তির মূলাধার; এই লেখিকার ধারণা।

সকলকেই স্বার্থচিন্তা থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। অনুন্নত সম্প্রদায়কে যাদের এতকাল হিন্দুসমাজ অস্পৃশ্য, অপাংক্তেয় করে রেখেছে, ব্রাহ্মসমাজ তাদের উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট। কামিনী রায়ের চিন্তাধারা উদার ও মানবধর্মে উজ্জ্বল। তাঁর কথাতেই বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয় পরিস্ফুট। "আমরা কারোর হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব খৃষ্টানত্ব ইত্যাদি বংশক্রমাগত, চিরপোষিত নাম, চিহ্ন বলপূর্ব্বক বর্জ্জন করাইবার বিরোধী, কিন্তু সকল বিভিন্নতা মিলাইয়া লইয়া এক মহামানবত্ব ক্রমে আসিবে এই আশায় আশ্বস্ত। সেদিন কী আসিবেনা?"

সাহিত্য ও সুনীতি
প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৯

কামিনী রায়ের 'সাহিত্য ও সুনীতি' নামক প্রবন্ধটি ১৩৩৯ সালের কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রবন্ধসমূহ সুচিন্তিত, তত্ত্বপ্রধান, কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্যবহুল। যে সমস্যা বর্তমানে প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে চিন্তা তিনি অর্ধশতাব্দী আগে তাঁর প্রবন্ধে প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর রচনা থেকে কিছু অংশ তুলে নিয়ে দেখানো যায়, কতকাল আগে আমাদের বর্তমান সমস্যা কেমন করে তাঁর চিন্তাধারাকে উত্তেজিত করেছিল।

"তরুণীদিগের চালচলন এবং নৃত্য অভিনয়াদি সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে নৃত্যমাত্রই দূষণীয় নয়। স্বাধীনভাবে চলাফেরা স্বাভাবিক এবং আবশ্যক কিন্তু তাঁরা সর্বপ্রযত্নে বিদেশীয় বেশবিন্যাসের এবং নৃত্যাদির নির্লজ্জতা পরিহাস করেন। আপনার শরীরকে সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখুন; উহা সকলের চক্ষের সম্মুখে অর্দ্ধাবৃত ও লোভনীয় করিয়া দেখাইবার যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা পশ্চিমের বর্তমান যুগের নারীদের পাইয়া বসিয়াছে, তাহা তাহাদের দেশেও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না। দেহের সৌন্দর্য্যই নারীর চরম সৌন্দর্য্য নহে।"

সুনীতি এবং দুর্নীতির পথ একই, একই পথে তাদের আসা যাওয়া; লেখিকা মন্তব্য করেছেন সেটা ঘটে দর্শন ও পঠনের মাধ্যমে। কোন দেশের বা কোন যুগের আদর্শ ভাল বা মন্দের চরম নিদর্শন হতে পারে না। কাজেই সুনীতি যা, তা সকল দেশ, জাতি নির্বিশেষেই গ্রহণীয়, দুর্নীতিও তেমনই বর্জনীয়। সিনেমার মারফৎ অশ্লীল, অশোভন অনেক কিছুই দেশের রুচিকে যেমন বিকৃত করছে, তেমনি সাহিত্যের মধ্য দিয়াও অনেক বিকৃতি অন্তরকে কলুষিত করছে। কাজেই যা চির-কালীন আদর্শ তাকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী নারীর আদর্শ হলেও, স্বামীর সেবাদাসী হওয়ার মনোভাব সকল কালেই পরিবর্জনীয়। সাহিত্যে বাস্তবতা নিয়ে যুগে যুগে তর্কবিতর্কের অন্ত নেই, সেখানে লেখিকার বক্তব্য, "যাহা সুন্দর, যাহা আনন্দদায়ক, যাহা মনকে ঊর্ধ্বমুখ করে, তাহাই আর্ট।"

বিদেশ থেকে আনীত কচুরিপানার সর্বনাশা কাণ্ড সকলেরই জানা আছে। প্রবন্ধকার সাবধান করে দিয়েছেন বিদেশী সাহিত্য-সঞ্জাত কোন বিষ যেন আমাদের মনকে বিষাক্ত ও মোহাচ্ছন্ন করে না ফেলে। এভাবেই লেখিকা যুক্তিদ্বারা 'সাহিত্য ও সুনীতি'র বক্তব্য নিপুণভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য করেছেন।

প্রিয়ম্বদা দেবী

জীবনকথা

জীবনের যে কোন প্রাপ্তির চরিতার্থতা পূর্ণ হবার আগেই অসহ শূন্যতার মধ্যে সকল সুখ মিলিয়ে গেছে বারবার। প্রিয়ম্বদার জীবন যেন বিধাতার এক নিষ্ঠুর কৌতুক। একহাতে দিয়েছেন, অন্যহাতে তা কেড়ে নিয়েছেন।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নময়ীর একমাত্র কন্যা প্রিয়ম্বদার জন্ম। প্রসন্নময়ী সেযুগে মহিলা কবি হিসাবে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর পিতৃকুলের গৌরবও যথেষ্ট উল্লেখ্য। স্বনামধন্য দুর্গাদাস চৌধুরী তাঁর পিতা এবং কৃতবিদ্য আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী, কর্ণেল মন্মথ চৌধুরী প্রভৃতি সপ্ত ভ্রাতার তিনি অগ্রজা। দশ বছর বয়সে অত্যন্ত ঘটা করে প্রসন্নময়ীর বিবাহ হয়েছিল। 'পূর্বকথা' নামক গ্রন্থে তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন, "বংশ পরম্পরায় আমাদিগের গৃহের প্রথানুসারে আমারও কুলীনপাত্রে বিবাহ হইয়াছিল। চিরন্তন পদ্ধতি সহসা তুলিয়া দিতে পারেন নাই। বড় তরফে তখন আমিই একমাত্র কন্যা, 'স্বর্ণ দিদির' প্রাপ্যটাও আমার অংশে পড়িয়াছিল।"

"কুলীন পাত্রের কুল ভঙ্গ করিবার নাম 'করণ'।··· যাঁহার কুল নদীগর্ভে নিমগ্ন করা হয় তাঁহার দুঃখিত ও লজ্জিত হইবার কথা তবে ধনলোভী কুলীনগণ তাহা গ্রাহ্য করেন না এবং এই অসামঞ্জস্য বিবাহে ভবিষ্যতে অসুখী হইয়াও থাকেন।" এই কথাতেই তাঁর জীবনের ইংগিত পাওয়া যায়।

প্রিয়ম্বদার জীবন আলোচনায় প্রসন্নময়ীর বিবাহিত জীবনের কথা স্বাভাবিক ভাবেই আসে। কারণ প্রিয়ম্বদার প্রাক্-বিবাহ জীবন এর সঙ্গে জড়িত। জন্মাবধি মাতুলালয়ে থাকায় পিতৃস্নেহ বঞ্চিত এবং পিতৃকুল থেকে বিচ্ছিন্ন।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর 'বঙ্গের মহিলা কবি'তে লিখেছেন, "১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে পাবনা জেলার অন্তর্গত গুনাইগাছা গ্রামে প্রিয়ম্বদার জন্ম হয়।" পরবর্তী প্রায় সকলেই তাঁর অনুসরণে এই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন ; অথচ এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ 'পূর্বকথা'। 'পূর্বকথা'য় প্রসন্নময়ী লিখেছেন, "পিতৃদেব যশোহর বদলী হইয়া যান ও সেইখানে এই তিনজনের এবং প্রিয়রও জন্ম হইয়াছিল।"[১]

আবার নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'দেশ'-এ (সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৩) লিখেছেন, "মাত্র দশ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। স্বামীর নাম কৃষ্ণকুমার বাগচী। বিবাহের দু'বছর বাদে কৃষ্ণকুমার পাগল হয়ে যান। দুঃখের সেই সূচনা, বাকী

১। পূর্বকথা—
তিনজন—প্রমথ, মন্মথ, মৃণালিনী

জীবনে একটির পর একটি শোকের আঘাত এসেছে প্রসন্নময়ীর উপর। দুঃখের আগুনে আমৃত্যু তাঁকে জ্বলতে হয়েছে। স্বামী পাগল হয়ে যাবার কিছুকাল পরে তিনি পিত্রালয়ে চলে এসেছিলেন। পরে আর স্বামীগৃহে ফেরেন নি।"

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নময়ীর বয়স ছিল দশ। দু'বছর বাদে অর্থাৎ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকুমার পাগল হয়েছিলেন। নীরেন্দ্রনাথের কথায় স্বামী পাগল হয়ে যাবার কিছুকাল পরে তিনি পিত্রালয়ে চলে এসেছিলেন। আর স্বামীগৃহে ফেরেন নি। 'কিছুকাল' বলতে কোন নির্দিষ্ট সময় বোঝা যায় না। এদিকে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নময়ীর বিয়ের চার বছর বাদে প্রিয়ম্বদার জন্ম। প্রসন্নময়ীর 'পূর্ব-কথা' থেকে জানা যাচ্ছে প্রিয়ম্বদার জন্ম হয়েছিল যশোরে, গুনাইগাছায় নয়। অতএব প্রিয়ম্বদার জন্ম-বৃত্তান্ত রহস্যাবৃত; নীরেন্দ্রনাথের রচনা অনুসারে কৃষ্ণকুমার পাগল হবার পর। প্রসন্নময়ী স্বামী সম্বন্ধে নীরব। সুতরাং কৃষ্ণকুমার বাগচীর পাগল হয়ে যাওয়ার নির্ভরযোগ্য তথ্য বা সময়ের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। তবে প্রসন্নময়ী যে শ্বশুরালয়ে আরো গিয়েছিলেন, 'পূর্বকথা' থেকেই তা জানা যায়। স্বামী সম্বন্ধে কিছু না বললেও শাশুড়ী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

"প্রিয়র জন্মপরে আর একবার আমি কন্যাসহ শ্বশুরালয় গিয়াছিলাম, সেই শেষ। শ্বশ্রূমাতা তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া নাম রাখিয়াছিলেন, 'গিরিবালা'। জানি না কেন তাঁহার দত্ত 'গিরিবালা' লুপ্ত হইয়া প্রিয়ম্বদা বজায় রহিয়া গেল। যদিও সে গ্রামের লোক তাহাকে ঐ নামেই ডাকিতেন এবং কত স্নেহ-আদরে বিবিধ খেলনা, ফল সর্বদা আনিয়া দিয়া যাইতেন ও ক্ষুদ্র 'গিরি' তাঁহাদিগের ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া সেখান হইতে পুনর্বার মাতামহালয়ে ফিরিয়া আসিতে চাহিত না; তবুও আমরা যথাকালে পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিলাম। এ যাত্রায় আমি পূর্ণমাত্রায় লজ্জাশীলা কুলবধূ ও ছোটখাট গৃহিণী। কেহ কোন ত্রুটি ধরিতে পারিত না; ঠাকুরাণী তখন সর্বসম্মুখেই আমার প্রতি অত্যধিক স্নেহ দেখাইয়া অন্য বধূগণের অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার ও আমার জীবনের উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝাবাত্যা বহিয়া গেল, তিনি ভগ্নহৃদয়ে রোগ-শোকে ভুগিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন, আমিই পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। তাঁহার গিরিবালাকে মৃত্যুকালে তিনি অশেষ প্রকার শুভাশীর্বাদ করিয়া যান। আমাদিগের ভাগ্যক্রমে তাহার একটিও ফলপ্রদ হয় নাই। প্রিয়জন মৃত্যুশোকে জীবনের সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। শুনিয়াছিলাম শ্বশুরকুলে ব্রহ্মশাপ থাকায় কন্যাগণ সকলেই প্রায় নিঃসন্তান বিধবা এবং পুত্র-দিগেরও বংশের উন্নতি নাই। জন্ম, মৃত্যু লইয়া কোনরূপে তাঁহারা জীবিত আছেন মাত্র।"

এই লেখা থেকে মনে হয়, শ্বাশুড়ীর প্রতি প্রসন্নময়ীর সশ্রদ্ধ ভালবাসা ছিল। অত্যন্ত তেজস্বিনী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং দয়াবতী রমণী ছিলেন তাঁর শ্বাশুড়ী।

প্রসন্নময়ী তাঁর নিজের ও শাশুড়ীর জীবনের যে 'ঝঞ্ঝাবাত্যা'র কথা উল্লেখ করেছেন, কৃষ্ণকুমার বাগচীর ভাগ্যবিপর্যয় এর সঙ্গে জড়িত ভাবাটা অযৌক্তিক নয়। শিশু প্রিয়ম্বদাকে নিয়ে প্রসন্নময়ী যে চলে এসেছিলেন, আর কখনও যাননি। ছেলেবেলায় প্রিয়ম্বদার দুরন্তপনার যে বর্ণনা প্রসন্নময়ীর লেখায় পাওয়া যায়—তার সঙ্গে পরবর্তী শান্ত, স্বল্পবাক্ মহিলার মিল পাওয়া দুঃসাধ্য। "কন্যা প্রিয়ম্বদা শৈশবে অত্যন্ত দুরন্ত এবং মাতামহের যথা-অযথা আদরে কাহারো কথা মানিত না। কনসার্ট উপলক্ষ্যে সেদিন সকাল হইতে বন্ধুবান্ধবে বাড়ী পরিপূর্ণ, দুষ্ট ছেলে-মেয়েরা ঐরূপ দিনে আরো বাড়িয়া উঠে ও যত প্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া গৃহের শান্তিভঙ্গ করে. সময় বুঝিয়া প্রিয়ম্বদার উপদ্রবটা সেদিন আরো বাড়িয়া যায় ও কেহ তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ক্রমাগত পিতৃদেবের নিকট অভিযোগ করিতে থাকে, তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন না। তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে না পারিয়া মা বলেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ভাগে পড়ো নাই, কদাপি পিতামাতার অবাধ্য হইবে না।' তৎক্ষণাৎ সেও চট্‌পট জবাব দেয়, 'পিতামাতার অবাধ্য হইতে মানা, বিদ্যাসাগর মহাশয় ত মাতামহ ও মাতামহীর কথা কিছু বলেন নাই'—দুরন্ত ক্ষুদ্র বালিকার মুখে এই উত্তর শ্রবণে সেই সমাগত বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে উচ্চহাস্য পড়িয়া যায় ও গায়ক-বাদকদিগের ভিতর হইতে উঠিয়া মিত্রমহাশয় তাহাকে সুন্দর সুন্দর খেলনা উপহার দিয়া তাহার তীক্ষ্মবুদ্ধির অশেষ সুখ্যাতি করিতে থাকেন।"

প্রিয়ম্বদার মাতামহ দুর্গাদাস চৌধুরী অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। নিজের চেষ্টায় তিনি কৃতবিদ্য হয়েছিলেন। প্রতিভাবলে শৈশবের দুর্দিন কাটিয়ে তিনি হয়েছিলেন সমাজের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর শিক্ষাগুণে পুত্রেরাও হলেন এক একজন দিক্‌পাল। কন্যাকেও উপযুক্ত শিক্ষাদান করেছিলেন। শতাধিক বছরেরও অনেক আগের কথা,—দুর্গাদাসের শিক্ষাপদ্ধতির কথা লিখেছিলেন তাঁর কন্যা—"পিতৃদেব ছুতার মিস্ত্রী দ্বারা বার স্বর ও ছাত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণ খোদিত করিয়া অক্ষর পরিচয় করাইয়াছিলেন। পাঠশালায় যাইবার রীতি ছিল না। বনগ্রামে আমাদিগের রীতিমতন লেখাপড়া আরম্ভ হইল। পিতৃদেব স্বয়ং গুরু ও আমরা শিষ্য।"

এ বাড়ীর ইতিহাস সারস্বত সাধনার ইতিহাস। প্রসন্নময়ী দেবী বালিকা বয়স থেকে কবিতা লেখেন। 'বনলতা' রচয়িত্রী নামে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। দুই ভ্রাতা আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথ চৌধুরী ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে প্রথমে বন্ধুত্ব, পরে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হন। নবযুগ রচনার প্রধান কেন্দ্র ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে নতুন ইতিহাস রচনায় তাঁদেরও যথেষ্ট দান আছে।

এই পরিবেশে প্রিয়ম্বদা মানুষ হন। শিশুকালে যতই দুরন্তপনা করুন, লেখাপড়ায় ছিল তাঁর অখণ্ড মনোযোগ। মেধার সঙ্গে তীক্ষ্মবুদ্ধি যোগ হয়েছিল। কৃষ্ণনগর বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষার প্রথম পাঠের আরম্ভ ও সমাপ্তি।

দুর্গাদাস সে সময় কৃষ্ণনগরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এখান থেকে সর্বোচ্চ পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ১১ বছর বয়সে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানেও সকল পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিলাভ করেন।

বেথুন কলেজেই শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় রৌপ্য পদক লাভ তাঁর কৃতিত্বের পরিচয়। এই বছরেই ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত উকিল তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বহুগুণে গুণান্বিত ছিলেন তারাদাস। প্রসন্নময়ী 'তারাচরিত'-এ তাঁর যে পরিচয় লিপিবন্ধ করেছেন, তা অত্যন্ত শ্রদ্ধার। স্বদেশবাসী ও রাজপুরুষগণ সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। তারাদাস অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। "তারাদাসের দারুণ পীড়ার সংবাদ অচিরাৎ ছত্রিশগড়ের চারিদিকে প্রচার হইয়া গেল। নাগপুরের তৎকালীন কমিশনার ও চিফ কমিশনার সার জন উডবার্নের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা রোগীর দৈনিক অবস্থার সংবাদ প্রত্যহ তারযোগে লইতে লাগিলেন। ...সেই তারাদাসের দেহ কুমারী নদীতীরে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য এবং সেই সরল উদার মুখচ্ছবি জন্মশোধ আর একবার শেষ দর্শন কামনায় সকলে আসিয়া প্রাঙ্গণ ঘিরিয়া ফেলিল। পরিশেষে মহাদেব ঘাটে এত লোক সমাগম হইয়াছিল যে, সে জনতা ভেদ করিয়া শেষ কার্য্য সমাধা করা অতীব কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।"

জনৈক আত্মীয় তারাদাসের স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন, "চক্রধর পৌঁছিলেই বঙ্গীয় লাটের রাজত্ব শেষ হইয়া তোমার স্বামীর রাজত্বে আসিয়া পড়িতে হয়।"[১] এ কথাতেই বোঝা যায় কতখানি প্রভাবশালী ছিলেন তারাদাস।

এমন অসাধারণ লোককে পতিরূপে লাভ করে প্রিয়ম্বদার জীবন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিয়ের পরেই স্বামীর কর্মস্থল রায়পুরে চলে গিয়েছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে একমাত্র পুত্র তারাকুমারের জন্ম হয়। প্রিয়ম্বদার জীবনপাত্র যখন মাধুরীতে পূর্ণ, নিষ্ঠুর বিধাতা সেই সময়েই কঠিন আঘাত দিলেন। পুত্র এক বছর অতিক্রান্ত না হতেই তারাদাসের অকালমৃত্যু ঘটে। দুদিনের খেলাঘর ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ। শিশুপুত্র তারাকুমারকে নিয়ে তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন। 'পূর্বকথা'য় প্রসন্নময়ী যে ব্রহ্মশাপের কথা লিখেছিলেন 'শ্বশুরকুলে ব্রহ্মশাপ থাকায় কন্যাগণ সকলেই প্রায় নিঃসন্তান বিধবা' প্রিয়ম্বদার জীবনেও তা শোচনীয় ভাবে ফলে গেল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তারাকুমার বার বছর পূর্ণ না হতেই মায়ের বক্ষ শূন্য করে চলে গেল।

এই তারাকুমার বেঁচে থাকলে যে অসাধারণ হতে পারত, তা জানা যায়,

১। মানসী, আষাঢ়, ১০২১

হেমচন্দ্র সরকারের লেখা ১৩১৩ সালের 'মুকুলে'র মাঘ মাসের 'তারাকুমার' প্রবন্ধ থেকে।—

…"এই অল্প বয়সে তাহার জীবনে আশ্চর্য প্রতিভার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। বাঁচিয়া থাকিলে সে একজন অসাধারণ লোক হইত বলিয়া আমরা আশা করিতাম। মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র সাড়ে এগার বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু ইহারই মধ্যে সে বাঙ্গলা, ইংরাজী, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, সংস্কৃত অনায়াসে পাঠ করিত। তাহার ভাষা-শিক্ষায় আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। যাহা একবার মাত্র শুনিত, তাহা কখনও ভুলিত না।…

তিন বৎসরের শিশুর হাতে খড়ি হয় না বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় লেখা শেখাইতেন না। বালক বই দেখিয়া নিজেই লিখিতে শিখিয়াছিল। তাহার এমন আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি ছিল যে, বাঙ্গলা কবিতা একবার শুনিলেই মুখস্থ হইয়া যাইত।…

ক্লাশের শিক্ষক লিখিয়া পাঠাইলেন—'বালক অসাধারণ মেধাবী ও বুদ্ধিমান, কিন্তু বড় চঞ্চল; ঠিক হইয়া ক্লাশে বসিতে পারে না"…।

তারাকুমারকে আদর্শ শিক্ষা দেবার জন্য প্রিয়ম্বদা ও তাঁর জননী প্রসন্নময়ী কাশীতে নিয়ে গেলেন। বিদায়কালে সকলেই চোখের জলে ভাসেন। ছেলেকে আকুলভাবে কাঁদতে দেখে প্রিয়ম্বদা বললেন, 'এত কাঁদছিস, চল ফিরে চল।' তারাকুমার তৎক্ষণাৎ আত্মসংযম করল। মা ও মেয়ে শূন্য মনে শূন্য গৃহে ফিরে এলেন। মাত্র চোদ্দ দিন পর ভীষণ কলেরায় আক্রান্ত হয়ে সাত-আট ঘণ্টার মধ্যেই তারাকুমারের মৃত্যু হয়। প্রিয়ম্বদা তাঁর একমাত্র সন্তানকে শেষ সময়ে চোখের দেখাও দেখতে পেলেন না।

রবীন্দ্রনাথের শমীর কথা এখানে মনে হয়। শমীন্দ্রনাথ এবং তারাকুমার; একজন মাতৃহারা, অপরে পিতৃহীন। দুজনেই দূরে গিয়ে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। রবীন্দ্রনাথ শেষ দেখা দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু প্রিয়ম্বদার ভাগ্যে সেটুকুও জোটে নাই।

প্রিয়ম্বদার জীবনে সাংসারিক বন্ধন আর কিছু রইল না। তিনি সাহিত্যকে জীবনের অবলম্বন করলেন। বালিকা বয়সেই সাহিত্য রচনার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, এবার পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল।

স্বামীর মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শোককাব্য 'রেণু' প্রকাশিত হল। এই কাব্যখানি সাহিত্য জগতে আলোড়ন তোলে।

প্রিয়ম্বদা দেবীর জীবনের অপূর্ণতা আরেকদিকের অজস্রতায় পূর্ণ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয় কিশোরী বয়সে তাঁদের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত যাত্রাকালে জাহাজে রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ চৌধুরীর পরিচয় অল্পদিনের মধ্যেই গভীর হৃদ্যতায় পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

"পরিচয়ের গভীরতা দিনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না। একটি সহজ সহৃদয়তার দ্বারা অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি এমন করিয়া আমার চিত্ত অধিকার করিয়া লইলেন যে, পূর্বে তাঁহার সঙ্গে যে চেনাশোনা ছিল না সেই ফাঁকটা এই কয়দিনের মধ্যেই যেন আগাগোড়া ভরিয়া গেল।"[১]

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সেই সৌহার্দ্যের টানেই কৃষ্ণনগরে রবীন্দ্রনাথের আগমন। এরপর আশুতোষ চৌধুরী ও হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভার পরিণয়ে দুই পরিবারের বন্ধন দৃঢ়তর হল। পরে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা (বিবি) চৌধুরী বাড়ীর বধূ হওয়ায় যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। শান্ত, সংযত, মিতবাক্, প্রিয়ভাষিণী প্রিয়ম্বদাকে প্রথমাবিধি রবীন্দ্রনাথ স্নেহ ও প্রীতির চোখে দেখেছেন। ভাগ্যের বিপর্যয়ে প্রিয়ম্বদার জীবনে যখন দুর্যোগের ঝঞ্ঝা নেমে এল, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'আপন থেকে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া'র পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রিয়ম্বদাও সেই উপদেশ শিরোধার্য করে রবীন্দ্রালোকে স্বীয় সাহিত্য-রচনার গতিপথ নির্ধারিত করেছেন। সত্য, সুন্দর ও শিবের উপাসনাই সেই পথের দিক দর্শন।

রবীন্দ্রনাথের সংগে যে তাঁর সহজ সম্পর্ক ছিল, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথকে লিখিত চিঠিতে তা জানা যায়।

"কাল সকালে আপনার nobel prize পাবার খবর পেয়েই আপনাকে তার করেছিলাম আমার বুদ্ধিমান চাকর সেখানি নিয়ে ডাকে যেতে এত দেরী করলে যে তখন আর কাল পৌঁছবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই সে আর গেল না। আপনার এই সম্মানে আমাদের সকলেরি বড় আনন্দ হয়েছে—শুধু নিজের পরিবারের দেশের গৌরব নয় এ যে সমগ্র আসিয়া মহাদেশের গৌরব। বিশ্বের সভায় বঙ্গসাহিত্যের অক্ষুণ্ণ প্রতিষ্ঠা চিরকালের জন্যে।"

জাপানী কবি, চিত্রকর ওকাকুরার সঙ্গে প্রিয়ম্বদার পরিচয় তাঁর জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল; ওকাকুরা এই শান্ত, রজনীগন্ধার মত শুচিশুভ্র মহিলার দর্শনে ও আলাপনে মুগ্ধ হয়ে কয়েকটি রেখার সাহায্যে নিজের ক্যানভাসে ধরে রাখলেন। প্রিয়ম্বদাও ওকাকুরার অনেক কবিতা অনুবাদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যে অমর করে দিলেন।

সে যুগের স্মরণীয় মনীষী অশ্বিনী কুমার দত্তের স্নেহপূর্ণ আন্তরিকতার কথা প্রিয়ম্বদার লেখাতেই জানা যায়। শিষ্টাচার সমাধা করিয়া যখন তাঁহারা সুখাসীন, বন্যার প্রসঙ্গে একেবারে নিমগ্ন, প্রায় সেই অবসরে আমরা সেখানে গেলাম। অশ্বিনীবাবু এতই খুসী হইলেন, এত হাসিলেন, মাকে এতবার প্রণাম করিলেন ও আমাকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য এতই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তিনি চলিয়া যাইবার পর বন্ধুপত্নী সন্দেহ প্রকাশ করিলেন যে, বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বোধ হয়

পাগল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, তুমি আমি অমন পাগল হইতে পারিলে পৃথিবী স্বর্গ হইত।"[১]

অশ্বিনীকুমারের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ মুকুন্দ দাস স্বদেশ প্রেমের প্রেরণায় চারণ গানে দেশের জনচিত্তের জাগরণের ভার নিয়েছিলেন। পরিচয়ের পর থেকেই প্রিয়ম্বদা দেবীকে গভীর শ্রদ্ধায় মাতৃসম্বোধন করতেন। বিপত্নীক মুকুন্দ দাসের চারণ গানে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়ার সময় শিশুকন্যাকে নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েন। তার ভার প্রিয়ম্বদা দেবী নিলে মুকুন্দ দাস নিশ্চিন্ত মনে তাঁর আদর্শ কর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চলমান জীবনে' জানা যায়, "সেই মুকুন্দ দাসেরই মেয়ে এটি। মা নেই, তাই দিদিমণির হাতে দাস মশায় সঁপে দিয়েছেন।"

প্রিয়ম্বদা দেবীর চেহারার বর্ণনায় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "বয়স মনে হল চল্লিশ অনেকদিন পার হয়ে গেছে, কিন্তু কি অপূর্ব রূপ অথচ রূপ লাবণ্যের উপরে কেমন যেন একটা গভীর বেদনার ছায়া।" প্রিয়ম্বদা দেবীর মৃত্যুর পর ১৩৪১ সালের চৈত্র সংখ্যার 'বিচিত্রায়' একটি শোক প্রবন্ধে মমতা মিত্র কবির বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখেছেন, "প্রিয়ম্বদা দেবী সত্যই ছিলেন প্রিয়ভাষিণী। তাঁর সঙ্গে কথা বলা যথার্থ আনন্দের বিষয় ছিল।"

প্রিয়ম্বদা দেবী যে গৃহের পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন, তা যথেষ্ট প্রগতি সম্পন্ন। তারপর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে। ঠাকুরবাড়ির নারীরাও তখন বহু শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়বার কাজে উঠে পড়ে লেগেছেন। স্বর্ণকুমারীর 'সখি সমিতি'তে প্রসন্নময়ীর প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। ছেলেবেলা থেকে প্রিয়ম্বদার এসব অনুষ্ঠানে যাতায়াত ছিল। স্বামী পুত্রের মৃত্যুর পর সাহিত্যচর্চা ছাড়া বাইরের বহু জনকল্যাণের কাজে যোগ দিলেন। কিন্তু লোকের কটাক্ষ থেকে নিষ্কৃতি পাননি।

যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু হাস্যরসিকরূপে বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু তাঁর 'কৌতুককণা'তে 'শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা' নামক প্রবন্ধে একজন মহিলা সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছেন, তাতে হাস্যরসের পরিচয় কোথায়! প্রসন্নময়ী ও প্রিয়ম্বদা মা ও মেয়ে দুজনেই জীবনে বঞ্চিত হয়ে সাহিত্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা প্রগতিশীলা, তাই গৃহকোণে আবদ্ধ না থেকে বাইরের বিবিধ কল্যাণকর কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

১। মানসী ও মর্ম্মবাণী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

(বিগত ৭ই নভেম্বর কলিকাতা আলবার্ট হলে অশ্বিনী কুমার স্মৃতি সভায় পঠিত। এই সভায় প্রিয়ম্বদা দেবীকে সভাপতিত্বের জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি অক্ষমতা জানিয়ে এই স্মৃতিকথা পড়বার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তখন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বাইরে ছিলেন।)

'শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা' নামকরণ করলেও লেখকের আসল লক্ষ্য ছিল প্রসন্নময়ী। প্রসন্নময়ীর বিবাহিত জীবন ও তাঁর পিত্রালয় নিয়েই ব্যঙ্গ।

"প্রিয়ম্বদা আদরের কন্যা। একটি বিবি আসিয়া ছেলেবয়সে প্রিয়ম্বদাকে পড়াইত। একাদশ বর্ষ বয়সে মহাধুমধামে প্রিয়ম্বদার বিবাহ হয়।...

পনের বৎসর বয়সে প্রথম শ্বশুর বাড়িতে পা দেন। পেঁাছিয়াই চারিদিকে দেখিয়াই নাসিকা এবং ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন।'

সারি সারি ধানের মরাই দেখিয়া প্রিয়ম্বদা অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন 'ওরে বাপরে! ঐগুলো কি? মানুষ মারিবার কল নাকি?' লাউশাকের মাচা দেখিয়া বলিতেছেন, 'বাড়ীটা ঘোরতর জঙ্গলময়। এ জঙ্গলে নিশ্চয়ই বাঘ লুকাইয়া আছে।' লাউ দেখিয়া হা হা হাসিয়া 'ওগুলো আবার এক একটা লণ্ঠনের মত ঝোলে কি।' জাঁতায় কড়াই ভাঙ্গা হইতেছে দেখিয়া বলিলেন, 'এ বাড়ীটা বুঝি কলঘর। তবে এঞ্জিনে কল না চালাইয়া হাতে চালায় কেন?'

শাশুড়িকে দেখিয়া ছোট প্রিয়ম্বদা ভাবিলেন, এটা বুঝি রাতদিনের ঝী। শাশুড়ী সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া উঠানে গোবর জল তড়তড়া দেয়, ঠাকুর ঘরের পূজার বাসন মাজে; ছেলেপিলে কোলে করে লক্ষ্মীর আলপনা দেয়, শাশুড়ী চাকরাণী না ত কি? শ্বশুর নগদা মুটে। হাঁটুর উপর কাপড়; গায়ে পিরিহান নাই; চুলে টেড়ি নাই। শ্বশুর সদর হইতে যখন অন্দরে আসে, তখন হাতে একটা খেজুরে গুড়ের নাগরী, অন্যহাতে তিন চারিটা নারিকেল—এইরূপ কোন না কোন জিনিস, প্রায়ই তাহার হাতে থাকে।"

বাইরে পত্রপত্রিকায় এ ধরণের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কেউ কেউ করলেও রবীন্দ্রনাথ প্রিয়ম্বদাকে পুত্রের মৃত্যুর পর সহানুভূতিপূর্ণ চিঠি লিখে আত্মমগ্নতা থেকে বাইরে আসতে উপদেশ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলে প্রিয়ম্বদা দেবীর মানসিক বিকাশের সুযোগ এসেছিল। শুধু সাহিত্যকৃতি নয়, নানা গঠনমূলক কাজেও মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন তিনি। সরলাদেবী, ইন্দিরাদেবীর সঙ্গে প্রায়ই প্রিয়ম্বদাকে বিভিন্ন কর্মে বিভিন্নস্থানে দেখা গেছে। প্রথমোক্ত দুজনের তুলনায় প্রিয়ম্বদা মৃদুভাষিণী ও কোমল ব্যক্তিত্বের হলেও কাজের বেলায় কোন শৈথিল্য ছিল না। বরং কর্ম-জগতের মধ্য দিয়েই জীবনের গভীর শোক দুঃখকে জয় করার শক্তি এসেছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষিকা হিসাবে যোগ দেন। দীর্ঘদিন কাজ করার পর অসুস্থতার জন্য কাজ ছেড়ে বায়ুপরিবর্তনের জন্য রাঁচী, পাটনা, দেওঘর প্রভৃতি স্থানে বহুদিন থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। এসময় সরলাদেবীর প্রতিষ্ঠিত (১৯১০) 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলে'র কর্মাধ্যক্ষা হন। কৃষ্ণভাবিনী দাসের মৃত্যুতে পদটি খালি হয়েছিল। নৈপুণ্যের সঙ্গে এর কাজ তিনি পরিচালনা করেছিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সরলাদেব পঞ্জাব থেকে কলকাতায় ফিরে এলে তাঁর হাতে কর্মভার তুলে দেন। এরপর হিরণ্ময়ী দেবী

প্রতিষ্ঠিত 'বিধবা আশ্রমে'র সম্পাদিকারূপে যোগ দিয়ে এর উন্নতির আপ্রাণ চেষ্টা করেন। 'Greaves Rescue Home' এরও একজন উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। ছাতুবাবুর পেনেটির বাগান বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত 'গোবিন্দ হোমে'র সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। এসকল বাইরের জনকল্যাণকার্যে নিযুক্ত থাকলেও অন্তরের কাজ ছিল সাহিত্য চর্চা। বালিকা বয়স থেকেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভা বিকশিত হয়। ১২৯২ সালে বামাবোধিনীতে 'ফুল' সন্দর্ভ দিয়ে সাহিত্য সরণীতে প্রথম যাত্রা। পরের বছর 'ভারতী'তে কবিতা রচনা করে কাব্যে হাতে খড়ি। তখন তিনি বেথুন স্কুলের ছাত্রী।

স্বামীর মৃত্যুর পর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শোককাব্য 'রেণু' প্রকাশিত হয়। এই কাব্য সাহিত্যে তাঁর নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা আনে। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র সম্পাদক থাকাকালীন ১৩০৫ সালে একমাত্র কার্তিকমাসেই তাঁর পাঁচটি কবিতা ও দুটি গদ্য প্রকাশিত হয়। কবিরূপে প্রিয়ম্বদার এই-ই যথার্থ আত্মপ্রকাশ। এ সময় থেকে বিভিন্ন গদ্য পদ্য প্রকাশিত হতে থাকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। 'মুকুল' পত্রিকা তারাকুমারের খুব প্রিয় ছিল। 'মুকুলে' লেখা দিতে মাকে অনুরোধ করত। তাঁর বালক পুত্রের কথা স্মরণ করেই তিনি দীর্ঘকাল শিশুদের উপযোগী বহু গদ্য, পদ্য 'মুকুলে' লিখেছিলেন।

প্রসন্নময়ী ও প্রিয়ম্বদা দুজনেই সাহিত্য-সাধনায় দুঃখকে জয় করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মা ও মেয়ের চরিত্রগত পার্থক্য সাহিত্যকর্মেও পরিস্ফুট। একজন চড়াস্বরে বিশদভাবে বক্তব্য বিষয় বলেন, সেটা প্রায় অতিকথনের পর্যায় পেঁছায়। অন্যদিকে মৃদুভাষী প্রিয়ম্বদা সামান্য কথায় আভাসে ইঙ্গিতে হৃদয়ের গভীর ভাব প্রকাশ করেন। সবটা প্রকাশ করেন না বলেই এর আবেদন হৃদয়ের গভীরে।

শোক আর স্মৃতির গুরুভারে জীবন মন্থর গতিতে চলে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় "চলমান জীবনে' প্রিয়ম্বদার বাসগৃহ 'তারাবাসে'র কথা লিখেছেন ; "এক অপুত্রক বিধবা আর তাঁর বিধবা কন্যা, অর্থসাচ্ছল্য ও অভিজাত পরিবেশ সত্ত্বেও তা শোকের পুরী।"

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুনমাসে প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধা মাতাকে শোক সাগরে ভাসিয়ে প্রিয়ম্বদা দেবীর জীবনাবসান ঘটে।

বিভিন্ন কাগজে শোকপ্রকাশে বোঝা যায় তাঁর মৃত্যু শুধু দেহরক্ষা নয়, নিঃশব্দ নয়, শ্রদ্ধাভরে তাঁর স্মৃতিচারণা হয়েছে।

নানাকথা

স্বর্গীয়া প্রিয়ম্বদা দেবী বিচিত্রা

চৈত্র, ১৩৪১, পৃঃ ৪২০

বিগত ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৪১ বাংলাদেশের অন্যতমা মহিলা কবি প্রিয়ম্বদা দেবী পরলোক গমন করেছেন। ১৭৭১ সালে প্রিয়ম্বদা দেবী জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬৪ বৎসর হয়েছিল। তাঁর অশীতিপরা বৃদ্ধা জননী 'বনলতা' রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী এখনও জীবিত আছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে সন্তান শোকে তিনি অভিভূত হয়েছেন সন্দেহ নেই। আমরা তাঁকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

১৮৯০ সালে প্রিয়ম্বদা দেবী বি. এ পাশ করেন এবং সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য রৌপ্যপদক লাভ করেন। দুই বৎসর পরে শ্রীযুক্ত তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু ১৮৯৫ সালেই তারাদাসের মৃত্যু ঘটে। নিয়তির নিষ্ঠুর পীড়ন এই অকাল বৈধব্যেই শেষ হয়নি, ১৯০৬ সালে প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁর একমাত্র পুত্র তারাকুমারকে হারাইলেন। স্বামীপুত্র হারানোর নিদারুণ শোক তাঁর চিত্তে বেদনার যে চিরস্থায়ী রেখা অঙ্কিত করে দিয়েছিল তাঁর কাব্যরচনার মধ্যে চিরদিনই সেই বেদনার একটি সুস্পষ্ট সুর শুনতে পাওয়া যেত। পুত্রের মৃত্যুর পর প্রিয়ম্বদা দেবী বহু জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

রেণু, অংশু, পত্রলেখা, অনাথ, ভক্তবাণী প্রভৃতি পুস্তক প্রিয়ম্বদা দেবীর রচিত। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হল তাতে সন্দেহ নাই।

প্রিয়ম্বদা দেবী

ভারতবর্ষ
চৈত্র, ১৩৪১

পরিণত বয়সে কবি প্রিয়ম্বদা দেবী পরলোকগত হইয়াছেন। ৬৩ বৎসর পূর্বে যখন তাঁহার জন্ম হয়, তখন বাঙ্গালায় নূতন পদ্ধতিতে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি পরলোকগত সার আশুতোষ চৌধুরীর ভাগিনেয়ী এবং সাহিত্য সেবার জন্য সুপরিচিত শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীর একমাত্র সন্তান। শ্রীমতী প্রসন্নময়ী পিতার যত্নে শিক্ষালাভ করেন ও তাঁহার কবিতা সংগ্রহ 'বনলতা' যখন প্রকাশিত হয়, তখন বাঙ্গালী মহিলার সেইরূপ রচনা দুর্লভ ছিল।...

প্রিয়ম্বদা দেবী রচিত পুস্তকগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) কবিতা—'রেণু', 'পত্রলেখা', 'অংশু' ; (২) শিশুপাঠ্য—'অনাথ', 'পঞ্চুলাল', 'কথা ও উপকথা' ; (৩) ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়—'ভক্তবাণী'।

তাঁহার রচনায় সংযত ও পবিত্রভাবের বিকাশ সপ্রকাশ, নানা মাসিকপত্রে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত।

শোকে প্রিয়ম্বদার চিত্ত নির্ম্মল ও স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। তিনি আপনাকে নিযুক্ত রাখিবার জন্য...সর্ব্বদাই নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। কয় বৎসর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল এবং তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এতদিনে মৃত্যু তাঁহাকে সকল শোক হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছে।

ব্যর্থ জীবনে মাতাপুত্রীর সম্বন্ধ যেরূপ ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহাতে কন্যার মৃত্যু যে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধা জননী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীর পক্ষে দুঃখিবহ

দুঃখের কারণ তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার এই শোক যে সান্ত্বনার অতীত সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বিচিত্রা
চৈত্র, ১৩৪১-৪২

মহিলা কবি / প্রিয়ম্বদা দেবী—শ্রীমমতা মিত্র

সুপ্রসিদ্ধ মহিলা কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর মৃত্যু হয়েছে। এ খবর আকস্মিক নয়, গত কয়েক বৎসর ধরে তাঁর শরীর খারাপ চলছিল, মৃত্যুর চরম আহ্বানলিপি তাঁর কাছে পৌঁছেছে এটা সকলেই বুঝেছিলেন। প্রথম বসন্তের আবির্ভাবে যখন পত্রে পুষ্পে তরুরাজি বিকশিত হয়ে উঠেছে, দেহমন স্নিগ্ধ করে দক্ষিণা বাতাস বইছে, প্রকৃতিলক্ষ্মী তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে বিশ্বের দ্বারে সমাগত, এমনই এক ফাল্গুনী সন্ধ্যায় সুকুমার অনুভূতিসম্পন্না একটি সুন্দর কবিজীবনের অবসান হোল।

* * * * *

প্রকৃতি—প্রিয়ম্বদা দেবী সত্যিই ছিলেন প্রিয়ভাষিণী। তাঁর সঙ্গে কথা বলা যথার্থ আনন্দের বিষয় ছিল। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই জানেন একথা। পরের দুঃখে সহানুভূতি, দরিদ্রে দয়া প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণের তিনি অধিকারিণী ছিলেন।

* * * * *

পরিণত বয়সে তিনি বিধাতার কোলে ফিরে গেছেন। তাঁর পতিবিয়োগ-বিধুর ও পুত্রশোকাতুর হৃদয় চিরশান্তি লাভ করুক এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা। আমাদের তিনি যা দিয়ে গেলেন তার মর্যাদা আমরা যেন বুঝি। চোখে আর তাঁকে দেখতে পাব না আমরা, আমাদের দৃষ্টি তাঁকে হারাল, কিন্তু তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে রইলেন, আমরা সত্যিই তাঁকে হারাইনি।

কাব্য পরিচয়

রেণু

১২৯২ সালে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় 'ফুল' সন্দর্ভ নিয়ে যে কিশোরীর সাহিত্যজগতে প্রথম আবির্ভাব, ১৩৪১ সালে মৃত্যুতে সেই অবিচ্ছিন্ন সাহিত্য ধারা স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রবন্ধ দিয়ে শুরু করলেও, কবিতাই ছিল প্রিয়ম্বদা দেবীর সাহিত্যের প্রধান প্রকাশ মাধ্যম।

অল্প বয়সে যে কথা উচ্ছাসের ঝোঁকে বলেছিলেন, পরবর্তীকালে সেই নিষ্ঠুর সত্য তাঁর জীবনে ফলে যাবে কে ভেবেছিল!

"নীরব নিশীথে যখন তারা খসিয়া পড়ে, তখন আমার ফুলের কথা মনে পড়ে—আবার যখন মাতৃকোল খালি করিয়া সুন্দর শিশু চলিয়া যায়, তখনও

ফুলকেই ভাবি। শিশুর হাস্য, তারকার স্নিগ্ধ জ্যোতি দুই প্রাণে করিয়া সকালে ফুল ফোটে, বিকালে মরিয়া যায়, কিন্তু পরসেবা কখনও ভোলে না। সকল দিন অন্যের মুখ চাহিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে কখন বা বরষার বারিপাতের ভিতর রহিয়াও ফুটিয়া থাকে। ঐ ফুলের অনুকরণীয় জীবন যদি আদর্শ করিয়া চলিতে পারি, তবে এ কণ্টকিত সংসার পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখনও ফুলকে বড় ভালবাসিতাম—এখনও বাসি। আমি একক ; সে যেন আমার সহোদর সহোদরা স্থানীয়—আমি আর কিছুই চাহিনা, ফুলের মত পবিত্র জীবন লইয়া পরসেবায় এই অস্থায়ী জীবন উৎসর্গ করিয়া দিতে পারি ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"[১]

এই প্রার্থনা শূন্যতার অভিশাপ নিয়ে তাঁর জীবনে যে পূর্ণ হয়েছিল, জীবন পর্যালোচনাতেই তা জানা গেছে ; সাহিত্য রচনা এবং পরসেবাই হয়েছিল তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন। 'ফুল' প্রকাশের পরের বছর 'ভারতী ও বালকে' 'বালিকার রচনা' নামে তাঁর প্রথম কবিতা রচনা। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণনগরে আগমন এবং চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে হৃদ্যতা স্থাপন। 'ভারতী ও বালকে' কবিতা প্রকাশ এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিতি, দুয়ের মধ্যে একটা যোগ থাকতেও পারে। অবশ্য সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা প্রিয়ম্বদার জননী ও মাতুলদের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তি।

সাহিত্যের পথে প্রথম পদক্ষেপ—বয়সেও কাঁচা তারুণ্য—কোথায় পথ চলার আশা, আনন্দ প্রথম কবিতায় উদ্ভাস হয়ে উঠবে, তা নয়, 'চিন্তার তরঙ্গগুলি' বালিকার ভারাক্রান্ত হৃদয় বিষাদময় পরিণতিতে নিয়ে আসে।—

> বালুময় হৃদিতীরে, কত অশ্রু বারি ধীরে
> নীরবে ঝরিয়া পড়ে—আপনি শুকায়ে যায়।[২]

এ বয়সে এই শোকোচ্ছ্বাস কেন? একি সেই শতকের রোমান্টিক বিষাদের রেশ···না ভাবী জীবনের ম্লান ছায়াপাত !

এরপর ঘটনার দ্রুতগতি, সুখের আভাস দিতে না দিতেই জীবনের পথ-পরিক্রমায় দুঃখের আঁধার রাত্রি ঘিরে ধরেছে। বিয়ের মাত্র তিন বছর পরেই স্বামীর মৃত্যুতে দুঃসহ বেদনায় মুক্তির উপায় হিসাবে কাব্যকেই আঁকড়ে ধরতে হয়েছে। এরই ফলশ্রুতি 'রেণু' কাব্য। যে লিরিকের পথ ধরে, কাব্য-সরণীতে প্রথম যাত্রা হয়েছিল, শোক কাব্য রচনাতেও সেই পথেই গতি অব্যাহত রইল।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রিয়ম্বদা দেবী কাব্যরচনায় প্রায় সমকালীন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দু'জনের উপরেই অসীম। এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য।

১। বামাবোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, ১২৯২ (বালিকা সমিতিতে পঠিত)
২। বালিকার রচনা (গান); ভারতী ও বালক, কার্ত্তিক, ১২৯৩

"প্রিয়ম্বদার প্রথম কবিতা ও বলেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কবিতা ১২৯৩ সালের কার্তিক সংখ্যা 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল। কবিতা দুইটির মধ্যে বাহ্য ও আভ্যন্তর সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। বলেন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল চিত্রকর্মের দিকে, তাই তিনি অনতিবিলম্বে গদ্যের পথেই স্বচ্ছন্দতাবোধ করিলেন। প্রিয়ম্বদার রচনা ভাবগভীর লিরিকের সরণী ধরিয়াই রহিল। বলেন্দ্রনাথের মতো প্রিয়ম্বদারও কবিকর্মে নিষ্ঠা ছিল। উভয়েরই রচনার বিশিষ্ট গুণ বাক্‌শুচিতা ও সুগভীর সৌন্দর্যানুভূতি। বলেন্দ্রনাথের প্রতিভা বাস্তব স্বীকারী ও বুদ্ধিনিষ্ঠ; প্রিয়ম্বদার প্রতিভা ভাবপরতন্ত্র ও হৃদয়নিষ্ঠ।"[১]

এই ভাব ও নিষ্ঠার গভীরতা প্রিয়ম্বদা কাব্যের মূল ভিত্তি।

কবির দুঃখময় জীবনের অভিব্যক্তির বিভিন্ন প্রকাশ 'রেণু'র কবিতাগুচ্ছ। "রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কাব্যকর্মের মধ্যে নবীন কবিরা সনেটই বাছিয়া লইয়াছিলেন। ভাবের অস্ফুটতা, বস্তুর ক্ষীণতা চতুর্দশপদীর আঁধারে যেমন গাঢ়তা পায় গীতি-কবিতার অন্য ফর্মে তেমন পায় না।"[২] প্রিয়ম্বদাও 'রেণু'র দুঃখময় ভাবপ্রকাশে সনেটের গাঢ় বন্ধনই বেছে নিয়েছিলেন। নারী জীবনের আকাঙ্ক্ষিত শ্রেষ্ঠ দিনগুলি নিঃশেষে মিলিয়ে গিয়ে যখন রইল শুধু বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস আর শোকের গুঞ্জন, 'রেণু' সেই ভারাক্রান্ত দিনের বিন্দু বিন্দু অশ্রু। হাহাকার নেই, বিলাপ নেই—শুধু ব্যথাভারে অবনত দুখানি চোখের চাওয়াতে কত অব্যক্ত বেদনা, কত অকথিত বাণী। আষাঢ়ের ভারাবনত আকাশের মত হৃদয়ে বেদনার গভীরতায় অতীত সুখস্মৃতিতে ডুবে থাকা আর যন্ত্রণার চেতনা। এই পুঞ্জীভূত বেদনাতেই অসহায় হৃদয়ের করুণ প্রার্থনা দেবতার দ্বারে—

জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণাধারায় এসো। —রবীন্দ্রনাথ

বৈকুন্ঠনাথের চরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে সকল ব্যথা নিবেদনান্তে প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁর হৃদয়ের সকল ভার রেণু রেণু করে প্রকাশ করেছেন। 'রেণু' কাব্যের মূল সুর একটি—

প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ।
প্রেমের বেদনা থাকে
সমস্ত জীবন।[৩]

এই সুরটি কবি নানা ভংগীতে প্রকাশ করেছেন। ব্যথাভরা চোখের দৃষ্টি বারবার পড়েছে প্রকৃতির দিকে—প্রাণ বিহ্বল হয়েছে প্রকৃতির রূপে। 'বর্ষারম্ভে

১। সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৭৭
২। সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ; পৃঃ ৭৮
৩। রবীন্দ্রনাথ, স্ফুলিঙ্গ, ৩৭ নং, সঞ্চয়িতা, পৃঃ ৭৩৭

প্রকৃতির প্রতি', 'শরতে প্রকৃতি' সর্বত্রই সৌন্দর্য-চেতনার স্বাক্ষর। 'মিলন-মহিমা'য় যেন এর পূর্ণ-প্রকাশ।

ঝরিছে কিরণ তব ওহে দীপ্তিমান,
শত লক্ষ ধারে, আমি করিতেছি স্নান
নগ্ন অনাবৃত চিত্তে,……

(মিলন মহিমা)

ভাবের ত্রিবেণী-সংগম হয়েছে 'রেণু'তে, প্রেম, প্রকৃতি ও ভক্তির। ভক্তির পূর্ণ-আত্ম-নিবেদন ভিন্ন ব্যথা ত্রাণের পথ নেই। এই বিষয়েই Tennyson-এর 'In memorium'-এর সঙ্গে 'রেণু' কাব্যের আন্তর সাদৃশ্য দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বন্ধুকে হারিয়ে টেনিসনের গভীর অন্তর্বেদনা ভগবানের পায়ে নিবেদিত হয়েছিল। যে গভীর আত্মবিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথ অসীম ও সসীমের লীলাবন্ধনের কথা বলেছিলেন,

তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে
যতদূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু,
কোথা বিচ্ছেদ নাই ॥[১]

বিশ্বাসের এই গভীরতা থেকে স্খলনেই মানুষের আত্মমুখিতা আর দুঃখের পাথারে আকুলতা। টেনিসন এই অসহায় মুহূর্তে প্রার্থনা জানান ;—

Forgive my grief for one removed
Thy creature, whom I found so fair,
I trust he lives in thee and there
I find him worthier to be loved.

কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস টেনিসনকে শেষ সিদ্ধান্তে পেঁছে দিয়েছিল।

That God, which ever lives and loves ;
One God, one law, one element,
And far-off divine event
To which the whole creation moves.

'রেণু' কাব্যেও বিশ্বাসের এই পরম-নির্ভরতা ;

আপনি দেবতা তুমি অর্ঘ্য উপহারে
গ্রহণ করেছ মোরে, অতি ধীরে ধীরে
হরিয়া সকল তৃষা তারি মূর্ত্তি সনে
হে অসীম, পশিয়াছ আমার জীবনে।

(আবির্ভাব)

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ১৮১

'অন্বেষণে' যে সংশয়ের বেদনা, 'আরাধনা'য় তার থেকে উত্তরণ ঘটছে; বিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হচ্ছে শেষ প্রার্থনায়,—

বিশ্ব অন্তরাল করি রহিবে জাগিয়া
নিষ্ফল জীবন মোর, তোমারি লাগিয়া
হবে পূর্ণ শুভ কাজে, সর্ব্ব মনস্কাম
তোমারি চরণ তলে লভিবে বিরাম ;

(আরাধনা)

তারপরেই 'আবির্ভাবে', 'রহস্যভেদে' নিঃসংশয়িত আত্মসমীক্ষণ—
'হে অসীম পশিয়াছ আমার জীবনে'।

(আবির্ভাব)

অথবা,

বুঝিবারে বাকী নাই
দেবতা পশেছে প্রাণে, এ ক্ষমতা তাই।

(রহস্যভেদ)

প্রিয়ম্বদা শান্ত, সংযত এবং মৃদুবাক্। দুঃসহ ব্যথাতেও তিনি বিলাপ করতে পারেন না। আভাসে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় কবিতাগুচ্ছে হৃদয়ের ভার অঞ্জলির মতই নিবেদন করেন। তাঁর আবেদন পাঠকের প্রাণের প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রবেশ করে, একে উপেক্ষা করার শক্তি কারোর নেই।

'বৃথা আশা', 'কবিতা' গভীর বেদনার অস্ফুট প্রকাশ। 'কাব্য' সংস্কৃত-অভিজ্ঞা কবির কালিদাসের কল্পলোকে রস-সঞ্চয়ের নিদর্শন।

১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র সম্পাদক থাকাকালে ঐ বছরের কার্ত্তিক মাসে প্রিয়ম্বদার পাঁচটি কবিতা ও দুটি গদ্যরচনা প্রকাশিত হয়েছিল। কবি-স্বীকৃতির এর চেয়ে বড় অভিনন্দন আর কি হতে পারে! আর তা এসেছে যুগ-যুগান্তের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকের হাত থেকে। 'চাঞ্চল্য', 'ম্লানিমা', 'প্রত্যাগমন', 'প্রেমকোজাগর' ও 'অজ্ঞাতে' এই পঞ্চমার সবক'টিই 'রেণু'র অন্তর্গত। 'ম্লানিমা'র বক্তব্য সুন্দর।

তখন হৃদয়
শৈবাল জড়িত পদ্মে শুভ্র শোভাময়
সতেজ নির্ম্মল ছিল পুষ্পের মতন।

(ম্লানিমা)

শৈশবের অসম্বৃত ধূলিময় দেহে অন্তরের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ, যৌবনের সুন্দর বেশবাসের ভিতর তা নিঃশেষে লুপ্ত।

হায় শান্তি প্রাণ ছাড়ি এসেছ শরীরে,
শান্তি সেথা হতে যাবে মরণের তীরে!

(চাঞ্চল্যের প্রীতি)

'প্রত্যাগমন' আরো সুন্দর ও বাঙ্ময়। সনেটের ক্ষুদ্র দেহসীমায় হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে প্রদীপ্ত প্রাণের স্মিত বাণী। গভীর দুঃখে ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা বিসর্জনকালে কী অসাধারণ উপলব্ধি! আরাধ্য যে দুঃখকেও আলিঙ্গন করে আছেন। সাধ্য কি একে এড়িয়ে যাওয়া!

আমি দেখিনু চাহিয়া
সব ব্যথা সব দুঃখ মিলিয়া মিশিয়া
এঁকেছে উজ্জ্বল করি তোমারি আনন;
ফেলিতে নারিনু তাই, সজল নয়ন,
তাহারে চাপিয়া ধরি বক্ষের উপরে,
শ্রান্ত পদে সিক্ত দেহে ফিরে এনু ঘরে।

(প্রত্যাগমন)

প্রেম, ভক্তি ও প্রকৃতি 'রেণু'তে মিলে মিশে একাকার। প্রিয় বিচ্ছেদে বিরহ কাতর দৃষ্টি বারবার প্রকৃতির বর্ণশোভায় আকৃষ্ট হয়েছে। বর্ষা, বসন্ত, শরৎ সকল ঋতুতেই তাঁর প্রেম-স্মৃতির তীব্রদাহন। বসন্তের কাছে তাঁর কী সকরুণ বেদন-ভাষণ!

বসন্ত আসিছ ফিরে, সখারে তোমার
কোথায় রাখিয়া এলে? হের চারিধার
এখনো জাগেনি তাই, প্রসূন পল্লব
শুষ্ক পত্র অন্তরালে লুক্কায়িত সব।

(আসন্ন বসন্তে)

মদনসখার অভাবে রিক্ত, নিঃস্ব প্রকৃতিকে কবির নিজের মতই প্রিয়বিরহিত মনে হয়।

আবার অন্যদিকে গ্রীষ্মের প্রখর দাহনের পরে নববর্ষার নতুন আশা ও আনন্দের সঞ্চার। কবির শূন্যপ্রাণেও মিলনের সুর পৌঁছায়। তাঁর মনে হয়, 'মিলনের মেলা আজি বিশ্বের ঘরে ঘরে',

মিলনোৎসুক ব্যাকুল হৃদয় বিশ্বপথে বেরিয়ে পড়তে চায়।

রুদ্ধ গৃহতল ছাড়ি উতলা হৃদয়
বাহিরিয়া বিশ্বপথে নবশোভাময়
বর্ণগন্ধ গীতিপুষ্প করি আহরণ
আনন্দে ছাইতে চায় যুগল চরণ!

(নববর্ষায়)

শরৎ প্রকৃতির বর্ণনায় কবির দৃষ্টি স্নিগ্ধ। 'আজ তুমি স্নেহময়ী মায়ের মতন'। সন্তানের কল্যাণ কামনায় ধরিত্রী যেন স্বয়ং মালক্ষ্মী। তাঁর ভান্ডার পূর্ণ।

অঞ্চল তোমার
পরিপূর্ণ পক্ক শস্যে, ক্ষুধিত ধরার
চিরশান্তি তৃপ্তিভরা ;

(শরতে প্রকৃতি)

প্রকৃতি চেতনা থেকে কবি আবার আত্মভাবনায় ধ্যানস্থ। 'আরাধনা' 'অবিচারে' বেদনার অশ্রু-মোচন। 'চিরস্মৃতি'তে ছোটর দাবীকে অনেক বড় করেছেন।

অবাধ মিলন সুখ মনে নাহি থাকে,
কিন্তু হায় তৃষাতুর প্রিয় নয়নের
প্রথম দর্শন স্মৃতি পূর্ণ করে রাখে
নিগূঢ় আনন্দরসে জীবন যৌবন।

(চিরস্মৃতি)

'জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলেছেন ভিন্নরূপে—

"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে।··· সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়কে ছোট করে, ছোটোকে বড় করিয়া তোলে।"

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' 'রেণু'র অনেক পরে রচিত। সাময়িক পত্রে প্রকাশ ১৩১৮ সালের ভাদ্র থেকে আর পুস্তিকাকারে ১৩১৯ সালে প্রকাশিত।

'চিরস্মৃতি'তে প্রিয়ম্বদা দেবী বলছেন, অবাধ মিলন সুখ অক্লেশে ভোলা যায় কিন্তু প্রিয়ের প্রথম দর্শনের স্মৃতি চিরকালের, তাকে ভোলা যায় না। গ্রহ-নক্ষত্রের সাড়ম্বর বিদায় মনে রেখাপাত করে না। কিন্তু শুকতারার আসন মনের একপ্রান্তে জুড়ে থাকে।

'প্রেমের উন্মেষ', 'প্রেমের অতৃপ্তি', 'প্রেমের স্বরূপ', 'প্রেমের রহস্য' কবিতাবলীতে প্রেমের বিচিত্র ব্যাখ্যা। কিন্তু 'ব্যর্থ চেষ্টা'য় তিনি তাঁর অক্ষমতার কথাই বলেছেন। প্রেম তাঁর কাছে অসীম, অনন্ত। একে সীমার বাঁধনে, সঙ্কীর্ণ রচনায় লিপিবন্ধ করা ব্যর্থ প্রয়াস,—

এ যেন মুকুরতলে ব্রহ্মাণ্ডের ছায়া,
অসীমেরে টেনে আনা সীমার মাঝারে,

(ব্যর্থ চেষ্টা)

'অসহায়' কবিতায় কবির অসহায় হৃদয়ের আর্তি।—

বন্ধ প্রাণ কেঁদে ওঠে বলে ছেড়ে দাও
উড়িয়া পলায়ে যাই আকাশে উধাও।

(অসহায়)

'রেণু' কাব্যের মূল সুর প্রেম। প্রেমের ঊর্ধায়িত আকৃতিই ভক্তি। ভক্তির নৈবেদ্যে ভক্তের সাধনা, দেবতার পায়ে অন্তর-বেদনার অঞ্জলিতে হৃদয়ের ভার-মোচনের চেষ্টা। তবুও প্রেমাস্পদ ঘিরেই চিন্তা-ভাবনা, স্মরণ ও মনন। 'রেণু'

কাব্য এক পূর্ণাঙ্গ স্মরণিকা, 'প্রেমের ঈর্ষা'য় বিরহিণীর প্রিয়কে একান্ত করে পাওয়ার নিভৃত কামনা। 'রেণু'র মত শোকের এমন সংযম, বেদনা ভাষ্যের মৃদু গুঞ্জন বিরল দৃষ্ট। এমন কি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রী-বিয়োগ-ব্যথায় রচিত রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যে শূন্যতার গভীর ক্রন্দন শোনা যায়। তবে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই; একক অনন্য। অসাধারণ শক্তিবলে তাঁর সকল চিন্তা-ভাবনাকে শোকের সাগর থেকে সাধারণের অগম্য এক উর্ধ্বস্তরে তুলেছিলেন। আর পাঁচজনে যখন এক ঘূর্ণাবর্তে পাক খেয়ে মরে, তিনি অসীমের দ্বারে পেঁছে যান।

'রেণু'র কবি রবীন্দ্র-ভাবনাদীপ্ত। শব্দ-চয়নে, ভাবের গভীরতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট দৃষ্ট। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য দীপ্ত আকাশের রবির কিরণের মত সর্বব্যাপী। সাহিত্যিকগণ সকলেই রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায় পুষ্ট। রবীন্দ্রভাবে ভাবিত প্রিয়ম্বদা তাঁর কিরণে আপন অন্তরের নিভৃত কোণও প্রদীপ্ত করেছিলেন। সে কারণেই এমন পূত সংযম, এমন শব্দ-চয়ন আর ভাবের পরিপূর্ণতা।

ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য যথার্থ—

"কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। তাহা থাকিবেই, নহিলে এমন কবিতা হইত না। কিন্তু সে প্রভাব প্রিয়ম্বদার কাব্য-লতিকার আলম্বনী নয়, স্থিতিভূমি।"[১]

সতীশচন্দ্র রায় 'রেণু'র সমালোচনায় কবির সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন, তাই তাঁর বক্তব্য এমন অশ্রুভারাতুর ঃ

" 'রেণু'র মাঝে মাঝে নিশ্বাসে হৃদয় ভারী করিয়া অবশেষে 'বিদায়ের পরে' ব্যথিত গানে সাশ্রুনয়নে বইখানি বন্ধ করিতে হয়। কিন্তু 'রেণু'র আর একটু বিশেষত্ব আছে। প্রথমে যে সুরের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা শেষের সুরটিই 'রেণু' কাব্যে প্রবল। অন্তরের ধন প্রিয়তমকে নানারূপে সম্ভোগই অনেকগুলি কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। কারণ এ সম্ভোগে চাঞ্চল্য নাই—ইহা পবিত্র গম্ভীর—কারণ দেবতা স্বর্গে এবং অসীমে, অতদূরে আকর্ষণ করিতে হইলে মানুষকে খানিকটা ব্যগ্র, শুদ্ধ হইয়া ভক্তির গাম্ভীর্যে পূর্ণ প্রেমের আশ্রয় লইতে হয়—সহজ চঞ্চল খেলাধূলা—হাস্য-প্রমোদের মধ্যে কখন আর প্রেম কৃতার্থ হইতে পারে না। মৃত্যু প্রেমকে গম্ভীর করে। 'স্বপ্নে ও জাগরণে' শীর্ষক চমৎকার কবিতাটি পড়িয়া দেখুন। বাস্তবিক,—

মৃদঙ্গের রব তুমি, গম্ভীর বিশাল,
আমি তারি মাঝখানে মন্দিরার তাল,

—এটি অসীমের সম্মুখে ধ্যানে বসিয়া উপলব্ধি করা যত সহজ, জীবনের হর্ষ,

১। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৭৯

খেলা-চঞ্চলতার মধ্যে তত সহজ নহে। মৃত্যুই এই ধ্যান-পরায়ণ গাম্ভীর্য্য আনিয়া দেয়।"[১]

নিঃস্ব-হৃদয়ের বেদনাভরা পাত্রখানি যখন সাহিত্য-দরবারে উপস্থিত করলেন, অশ্রুধৌত 'রেণু'কে পাঠকবৃন্দ আন্তরিক অভিনন্দনে বরণ করে নিলেন।

এ যেন—

আমার প্রাণের গভীর গোপন মহা আপন
সে কি!

প্রথম কাব্যেই 'রেণু' রচয়িত্রী বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

বিভিন্ন পত্রিকায় 'রেণু'র সমালোচনা পাঠ করলেই এর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আর কোন মত-দ্বৈধতা থাকে না।[২]

পত্রলেখা—(১৯১১)

দীর্ঘ বিরতির পর কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পত্রলেখা', প্রথম কাব্য 'রেণু'র এগার বছর পরে প্রকাশিত। 'রেণু'র উষ্ণ অভিনন্দনের পরও কবিচিত্ত সংযত, আপন ভারে অবনত। তিনি অতিমাত্রায় অন্তর্মুখী, মনে হয় বহির্জগতের প্রবাহ তাঁর হৃদয়ের গভীরে নাড়া দিতে পারে না। 'পত্রলেখা'য় শৃঙ্খলিত হবার আগে ১৩০৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে', 'ভারতী'তে ও অন্যান্য পত্রপত্রিকায় অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে; রসগ্রাহী পাঠকের চিত্তও স্পর্শ করেছে। 'পত্রলেখা'র শেষের দিকের কবিতাগুলি পুত্রহারা জননীর বুকভাঙা ক্রন্দনে ব্যথাদীর্ণ ও অশ্রুসিক্ত। সংসারের প্রিয়তম ও অন্তরতম, পতি-পুত্রের বিচ্ছেদের বেদনায় 'পত্রলেখা' রক্তলেখা হয়ে উঠেছে।

তাঁর কবিভাবনা একই বৃত্তে আবর্তন করলেও 'পত্রলেখা'য় শৈল্পিকসিদ্ধি একটা নির্দিষ্ট পরিণামে পৌঁছেছে। 'রেণু'তে যে সংশয়, বা শিল্পগত ত্রুটি ছিল, সেই বিচ্যুতি থেকে মুক্ত হয়ে 'পত্রলেখা' শিল্পসুষমায় পূর্ণ হয়েছে। 'রেণু'র শূন্যতার দীর্ঘনিশ্বাস, 'পত্রলেখা'র ক্রন্দনের সরবতায় পরিণত। 'পত্রলেখা'র নিবেদনেই তার প্রকাশ।

বিষণ্ণ সায়াহ্নে আজি কাতর হৃদয়ে
লিখিয়াছি পুনরায় এ বক্ষ ভরিয়া
নব চন্দনের লেখা, তোমারে স্মরিয়া।

সনেটের গাঢ় বন্ধনে 'রেণু'র অধিকাংশ কবিতার মন্ময় প্রকাশ। কিন্তু 'পত্রলেখা'য় কবির প্রকাশ ভঙ্গি আরো সংহত, আরো দৃঢ়পিনদ্ধ। চার, ছয়, আট

১। সতীশচন্দ্র রায়, সমালোচনী, ১ম বর্ষ, ১৩০৯
সমালোচনীর পুস্তক সমালোচনা অংশে 'রেণু'র সমালোচনা করেছিলেন। উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটি তিনি 'স্বপ্নে ও জাগরণে'র অংশ বলেছেন, কিন্তু এটি 'তুমি ও আমি' কবিতার অন্তর্ভুক্ত।

২। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

লাইনের এপিগ্রামে কবি তাঁর এক একটা ভাবনাকে মুক্তি দিয়েছেন! ছোট্ট নিটোল মুক্তোর মত এগুলি পরিপূর্ণ। কিন্তু প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যের যে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল, জনসাধারণের কাছে তা মেলেনি। আর তাঁর শতার্ধ বৎসর পূর্তির আগেই প্রিয়ম্বদা দেবীকে প্রায় ভুলতে বসেছে লোকে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ঠিকই বলেছেন, "বাংলা সাহিত্যে প্রিয়ংবদার স্মৃতি ইতিমধ্যে ধূসর হয়েছে।"[১]

কারণ তলিয়ে দেখলে মনে হয়, তাঁর কবিতার ক্ষীণতনু এবং বৈচিত্র্য-হীনতা সাধারণ পাঠকের চোখ, মন আকর্ষণ করেনি। তারা বিস্তৃতি চায়, বিপুলতায় তাদের আস্থা ও আরাম, গভীরে প্রবেশের পথ তারা জানেনা। গভীর তাদের কাছে দুর্বোধ্য, সেই কারণেই অবহেলার। এজন্যই হয়তো প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যের যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। কবি হিসেবে কামিনী রায় যে মর্যাদা পেয়েছেন, প্রিয়ম্বদার ভাগ্যে তা জোটেনি। তাঁর কাব্যে ঘটনার ঘটা নেই, নেই বর্ণবিলাস; ছন্দোমাধুর্য শ্রুতিকে উল্লসিত করে না। সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর কবিতালহরী প্রত্যাশাহীন। কিন্তু কবির সাহিত্য-জীবনে একদিককার নিরুত্তাপ মনোভাব অন্যদিকে পূর্ণ হয়েছিল বিধাতার আশীর্বাদের মত। প্রতিটি কাব্য রবীন্দ্রনাথের প্রশংসায় ধন্য হয়েছে। 'পত্রলেখা'র ঘটনায় প্রশংসার চেয়েও বেশী আরো কিছু পেয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ নিজের ভেবে ভুল করে প্রিয়ম্বদা দেবীর পাঁচটি কবিতা তাঁর 'লেখন' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। প্রিয়ম্বদা না ধরিয়ে দিলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই তার স্থান হত। উক্ত কবিতা ক'টি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। ভুল ধরা পড়লে রবীন্দ্রনাথ ঐ কবিতা-পঞ্চক সম্বন্ধে আত্মপ্রশংসাচ্ছলে প্রিয়ম্বদাদেবীকে প্রশংসাধারায় অভিষিক্ত করেছিলেন। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের নিজের সম্বন্ধে এই প্রশংসাবাদ কিছুটা বিভ্রান্তি ঘটায়। এটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। পরে অবশ্য বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বিস্তৃতভাবে তুলে দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে।

"কবিতা কয়টি যে আমারই সেও আমি স্বীকার করে নিলেম। প'ড়ে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হল—মনে হল ভালই লিখেছি। বিস্মরণ শক্তির প্রবলতাবশত কবিতা থেকে নিজের মন যখন দূরে সরে যায়, তখন সেই কবিতাকে অপর সাধারণ পাঠকের মতোই নিরাসক্তভাবে আমি প্রশংসা এবং নিন্দাও করে থাকি। নিজের পুরোনো লেখা নিয়ে বিস্ময়বোধ করতে বা স্বীকার করতে আমার সংকোচ হয় না, কেননা—তার সম্পর্কে আমার অহমিকার ধার ক্ষয়ে যায়। পড়ে দেখলাম—

তোমারে ভুলিতে মোর হল না যে মতি
এ জগতে কারো তাহে নাই কোন ক্ষতি।

আমি তাহে দীন নহি, তুমি নহ ঋণী,
দেবতার অংশ তাও পাইবেন তিনি।

নিজের লেখা জেনেও আমাকে স্বীকার করতে হল যে, ছোটর মধ্যে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ ভরে উঠেছে। পেটুকচিত্ত পাঠকের পেট ভরাবার জন্যে একে পঁচিশ-ত্রিশ লাইন পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা যেতে পারত, এমন কি, একে বড় আকারে লেখাই এর চেয়ে হত সহজ। কিন্তু লোভে পড়ে একে বাড়াতে গেলেই একে কমানো হত। তাই নিজের অলুব্ধ কবিবুদ্ধির প্রশংসাই করলেম। তারপরে আর একটা কবিতা—

ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকা কালো মেঘ,
ভিজে ভিজে এলোমেলো বায়ু বহে বেগে,
আমারো পরাণ তাই অন্ধকারময়
অবসন্ন, আশাহীন, শ্রান্ত অতিশয়।
কিছুই নাহিত হায় এ বুকের কাছে,
যা কিছু আকাশে আর বাতাসেতে আছে।

আবার বললাম শাবাশ। হৃদয়ের ভিতরকার শূন্যতা বাইরের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে হাহাকার করে উঠছে, এ কথাটা এত সহজে এমন সম্পূর্ণ করে বাংলা সাহিত্যে আর কে বলেছে! ওর উপরে আর একটি কথাও যোগ করবার জো নেই। ক্ষীণদৃষ্টি পাঠক এতটুকু ছোট কবিতার সৌন্দর্য দেখতে পারে না জেনেও আমি যে নিজের লেখনীকে সংযত করে দিলাম এজন্য নিজেকে মনে মনে বলতে হল ধন্য। তারপর আর একটি কবিতা—

আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন,
শ্রাবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভুবন;
ওকি এতটুকু নামে সোহাগের ভরে
ডাকিলে আমারে তুমি? পূর্ণ নাম ধরে
আজি ডাকিবার দিন, এ হেন সময়
সরম সোহাগ হাসি কৌতুকের নয়।
আঁধার অম্বর পৃথ্বী পথ চিহ্নহীন;
এর চিরজীবনের পরিচয় দিন।

'মানসী' লেখবার যুগে, সে আজকের কথা নয়, এই ভাবেরই দু-একটি কবিতা লিখেছিলেম বলে মনে পড়ে। কিন্তু কোন্ অণিমাসিদ্ধি দ্বারা ভাবটি তবু আকারেই সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

আর একটি ছোট কবিতা—

প্রভু তুমি দিয়েছ যে ভার
যদি তাহা মাথা হতে

এই জীবনের পথে
নামাইয়া রাখি বারবার
জেনো তা বিদ্রোহ নয়,
ক্ষীণ শ্রান্ত এ হৃদয়,
বলহীন পরাণ আমার।

লেখাটি একেবারেই নিরাভরণ বলেই এর ভিতরকার বেদনা যেন বৃষ্টিক্লান্ত জুঁই ফুলটির মত ফুটে উঠেছে।"

প্রিয়ম্বদা দেবীর সকল অভাব, লেখার সার্থকতা আশাতীত সৌভাগ্যে পূর্ণ হয়েছে। সূর্যতপার মত প্রিয়ম্বদা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অতন্দ্র দৃষ্টি রবীন্দ্রমুখী করেই রেখেছিলেন। ইষ্ট দেবতার বরাভয় প্রাপ্তি হয়েছে তাঁর।

কোন কোন সমালোচকের মতে প্রিয়ম্বদার কবিতা যে খুবই উচ্চমানের, সে বিষয়ে ক্যোন সন্দেহ নেই, না হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা নিজের বলে ভুল করতেন না। কিন্তু তাঁর নিজত্ব কিছু ছিল না—তাই রবীন্দ্রনাথ অন্যের বলে বুঝতে পারেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রবৃত্তের সকলেই রবীন্দ্র উপাসক, সকলেই সিদ্ধি প্রার্থনা করেছিলেন। আকাশের চন্দ্রের মত প্রিয়ম্বদাও সূর্যের আলোতে স্নিগ্ধ জ্যোতি হয়েছিলেন। এতে তাঁর গৌরব ক্ষুণ্ণ হবার কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ যে কথা জীবনের দেবতার উদ্দেশে বলেছিলেন, প্রিয়ম্বদার কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে, শব্দগুচ্ছে সেই কথার প্রতিধ্বনি,—"তুমি যা বলাও আমি বলি তাই।" প্রিয়ম্বদার কবিতাগুচ্ছ থেকে এর অজস্র প্রমাণ পাওয়া যাবে।

পাখিগুলি দিকে দিকে চলে যায়।
শুকনো পাতায় ঢাকা বসন্তের মৃতকায়,
প্রাণ করে হায় হায় হায়রে।
ফুরাইল সকলই
প্রভাতের মৃদু হাসি, ফুলের রূপরাশি, ফিরিবে কি আর।

(প্রকৃতি, রবীন্দ্রনাথ)

বসন্তের সবস্মৃতি চলে উড়াইয়া,
ধরণীর চারিদিকে দেয় ছড়াইয়া
কত গন্ধ কত পুষ্পদল;
কত বিহগের গান
মধুপের মধুতান
পরশ শীতল।

(পত্রলেখা, প্রিয়ম্বদা)

প্রিয়ম্বদার প্রায় সকল কবিতাতেই রবীন্দ্র প্রভাব পরিব্যাপ্ত। শুধু কথার হের ফের।—

রবীন্দ্রনাথের—

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়, প্রিয়ম্বদার 'সাধ' কবিতায়

আমি যে তোমারে চাই শুধুই তোমারে
বিরহে মিলনে মোর আলোকে আঁধারে,
আবাসে, প্রবাসে, পথে, শয়নে, স্বপনে—

আবার প্রিয়ম্বদার 'আশাহীন' কবিতার পংক্তিদ্বয়

হে কল্যাণী, ডালাখানি জ্বালা দীপে ভরে,
আঁধার সোপান শ্রেণী সমুজ্জ্বল করে ;

রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র 'কল্যাণী'কে স্মরণ করিয়ে দেয়—

হে কল্যাণী, নিত্য আছ
আপন গৃহকাজে,

প্রভাত আসে তোমার দ্বারে
পূজার সাজি ভরি,
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির
বরণডালা ধরি।

এ ধরণের মিল পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে—
পত্রলেখার 'অবকাশে'র

আজি করিব না আমি মান অভিমান,
হিসাবের খাতা খুলে আদান প্রদান—

ভাবধারা, রবীন্দ্রনাথের

কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে
মন মোর নহে রাজি—

থেকে দূরবর্তী নয়।

রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্যে' ভগবানের চরণে যে নিঃশেষে আত্মনিবেদন, সেই আকুতি ফুটে উঠেছে প্রিয়ম্বদার গভীর দুঃখের বাণীময় 'পত্রলেখা'র পাতায় পাতায়।

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন,

তাঁরি হস্তস্পর্শরূপে করি অনুভব
মস্তকে তুলিয়া লই দুঃখের গৌরব।

প্রিয়ম্বদা অন্যভাবে বলেন,—

তোমাপানে লক্ষ্যরাখি শান্ত নম্র হিয়া
বিরহ অতৃপ্তি দুঃখ চলেছি বহিয়া—
দূর তীর্থযাত্রীসম মহাশ্রান্তি ভার
চলেছি বহিয়া যেন আনন্দ অপার।

'সুমঙ্গলে'র শেষ দু লাইন জানা না থাকলে রবীন্দ্রনাথের বলে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়—

উচ্ছ্বসিত সমীরণ সম্পূর্ণ স্বাধীন
প্রাণে প্রেমে গন্ধে গানে পূর্ণ চিরদিন।

'চৈতালি', 'নৈবেদ্য', 'কথা ও কাহিনী'তে রবীন্দ্রনাথ অতীতচারী হয়েছেন। নানা বর্ণনায়, ভঙ্গিমায় অতীত গৌরবের কথা প্রকাশ করেছেন। 'পত্রলেখা'র 'গৌরব' কবিতাতেও বিগত দিনের গৌরব কাহিনীর স্মরণ। এছাড়া নম্রনত হৃদয়ে পরম পিতাকে সম্বোধনেও একই ধরণের মিল—

রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্যে'র অঞ্জলি—
তুমি সর্বশ্রেয়, একি শুধু শূন্য কথা ?

'পত্রলেখা'য়—

সর্বাশ্রয়, রাত্রে যবে এ ভুবন
ঘুমায় আরামে, আমি নিঃশব্দে তখন
আসি নাথ তব কাছে…

অন্যান্য সম্বোধন—হে জীবনস্বামী, হে হৃদয়রাজ, নাথ, হে রাজন, বিশ্বনাথ প্রভৃতি উপমা দিয়ে দেখানো যায় প্রিয়ম্বদা আপন অন্তরখানি রবীন্দ্র ভাবধারায় প্রদীপ্ত করে নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বিষয় বৈচিত্র্য, ভাবের অজস্রপ্রবাহ, ছন্দের বিবিধ বিলাস—গীতি-কাব্যের অনন্তধারা—এই বহুধা রূপলীলার তরঙ্গ থেকে প্রিয়ম্বদা রচনার উপাদান সংগ্রহ করে নিলে সাহিত্যে একটি অক্ষয় আসনের অধিকারী হতেন।

দুঃখের পীড়ন থেকে সম্পূর্ণ আত্মোদ্ধার করতে কোনদিনই সক্ষম হননি প্রিয়ম্বদা। তাই তাঁর চেহারায় যেমন শান্ত-বিষণ্ণতা ছিল, তেমনি তাঁর কাব্যেও এক করুণ বিষাদ বর্ষার মেঘের মত সর্বত্র জুড়ে ছিল।

'পূর্ণতা' কবিতা যেন তাঁর নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি। বাসর সুখের মধুর স্বপ্ন মিলিয়ে যাবার আগেই, 'পরিধানে দুকূল বসন' বিবর্ণ হবার সময় না হতেই

বর্ণলেশহীন শুভ্র বস্ত্রখানি তার
শূন্য তনুদেহ শুধু ঘেরিয়া যতনে,
সম্বৃত করিয়া তারে রাখে এ জীবনে!

(পূর্ণতা)

এর চেয়েও মর্মান্তিক দুঃখ তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছিল, তা কি তিনি জানতেন! স্বামীর মৃত্যুর পর, 'sweet my child I live for thee', প্রাণের একথা প্রাণে চেপে পুত্রকে বক্ষে চেপেছিলেন, অন্তরের কান্না গোপন রেখেছিলেন অন্তরের নিভৃত কোণে,—

আমার অনন্তব্যথা ছাড়া পেতে চায়
অর্থহীন অর্থভরা অজস্র ভাষায়।
তবুও যখনি কিছু বলিবারে যাই
অশ্রুজলে কোন কথা খুঁজিয়া না পাই।

(বিপন্ন)

পুত্র বিয়োগের পর দীনা জননীর আর্তক্রন্দন বাধা মানে না। দুর্নিবার অশ্রু এবার সহস্রধারায় নেমে এল।

আর রুধিব না রে অশ্রু আমার,
অবাধে নামিয়া আয়, সুপবিত্র ধার
বিধাতার পাদধৌত মন্দাকিনী সম।

পুত্রহারা জননীর করুণ বিলাপে 'পত্রলেখা'র শেষাংশ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। সমস্ত অন্তর জুড়ে প্রয়াত পুত্রের আসন। করুণাময়ের কাছে কোন নিবেদন নেই, প্রকৃতির সুন্দর মুখচ্ছবি আর কাব্যের পাতায় দেখা যায় না—কেবল একটি চঞ্চল বালকের স্মৃতি ও ছবি।

শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই'র কুসুম চরণের অকাল বিয়োগে সকল শিশুর মধ্যে চরণের মুখচ্ছবি দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু প্রিয়ম্বদার হৃদয় জুড়ে তারই হারানিধি—

এত শিশু মুখ, এত স্নেহের বচন
এ রুদ্ধ হৃদয়দ্বার করে না মোচন,
সেথায় পশে না আর কোন হাসি গান
কোনো আলো, কোন ছায়া, সকলি নির্বাণ।

'রেণু'র কবির চেয়ে 'পত্রলেখা'র কবি আরো দুঃখী, আরো বেদনার্ত। পতিকে হারিয়ে পুত্রই ছিল শোকতপ্ত হৃদয়ের সান্ত্বনা, কিন্তু 'পত্রলেখা'র জীবন পাত্রখানি ভেঙে চুরে গেছে—

পুত্রহারা জননীর করুণ বিলাপ—

নিবেছে সকল আলো বিশ্ব অন্ধকার
নিস্তব্ধ উদাস, শুধু অন্তরে আমার

(নবজীবন)

দুঃখের নিবিড়তার কাব্যখানি অকৃত্রিম। এই আন্তরিকতার জোরেই এর দাবী চিরকালের।

এখানে জ্যোতির্ময়ী দেবীর কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য।

"হঠাৎ একদিন আমারো সংসার জীবনে 'ভাসান' (বিসর্জন) এসে পড়ল।

গৃহধর্ম, বধূধর্ম, সংসারধর্ম এমনকি কাজকর্ম সমাজ জীবনযাত্রা সবেরই ভাসান হয়ে গেল এক নিমেষে। সে এক আপনাকে খুঁজে ফেরা আপনাকে হারিয়ে ফেলা দিন।

…সেদিন খুঁজি বাংলা যত কবির কাব্য। রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ', বড়াল কবির 'এষা'। সঙ্গে সঙ্গে মানকুমারী গিরীন্দ্রমোহিনীরা জমেন। কিন্তু প্রিয়ম্বদা দেবীর মতো এই নারীরা মনকে ঘনিষ্ঠ সাহচর্য দিলেন না।…

'রেণু' সনেট সঞ্চয়ন। আঘাতের প্রথম সময়ে রাগ মনে হয়, বেদনায় আর্ত অথচ শান্ত, অত্যন্ত সংযত। এমন সংযত গভীর গম্ভীর ভাষায় শোকের প্রকাশ তাঁর পূর্ববর্তিনী মহিলা কবিকে দেখিনি।…

তারপর 'পত্রলেখা' বেরিয়েছে। তাও এলো হাতে। এ কবিতাগুলি আকারে ৪/৬/৮ লাইনের বেশী নয়।

ঘনসন্নিবিষ্ট আতুর চিন্তা বেদনার বিধুর বিরহ মূর্তি যেন লাইনগুলি।…

এই নারীর কবিতা যেন নিস্তব্ধ রাত্রে নীরবে ঝরা গোপন অশ্রু। কারুর জানা নেই। কেউ জেগে নেই। তাঁর চোখের জল কখন পড়ে কেউ জানে না। যা কবিতা হয়ে ফুটে।[১]…

অংশু (১৩৩৪)

প্রিয়ম্বদা দেবীর জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ কাব্য 'অংশু'। 'পত্রলেখা' ও 'অংশু'র প্রকাশের ব্যবধানও দীর্ঘকালের। কবি স্বয়ং এর কারণ সম্বন্ধে জবাবদিহি করেছেন, "আমার এই কবিতাগুলি প্রায় পনের বৎসর পূর্বের রচনা। সমস্তই 'ভারতী' ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার আবশ্যকতা আমি তেমন বোধ করি নাই বলিয়াই এতদিন তাহা করা হয় নাই—বন্ধুদিগের অনুরোধ রক্ষা করিলাম।" এ কাব্য তিনি তাঁর স্মরণের, মননের চিরসঙ্গী যিনি, তাকেই উৎসর্গ করেছিলেন,

আমার মনের দেখা,
আঁখির আলোক লেখা,
দিনু তারে, যে আমার মানসের সাথী।

'বর্ষশেষ', 'নববর্ষ', 'কালবৈশাখী' কবিতারাজি প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে 'অংশু'র উদ্বোধন। কবি যেন এতদিনে দুঃখে আত্মলীনতা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। নিজেও তা উপলব্ধি করেছেন, 'বিজয়ী'তে তার স্পষ্ট উল্লেখ—

আজিকে হৃদয় পুন এসেছে ফিরিয়া বক্ষে মম
সগৌরবে, বিশ্বজয়ী অশ্বমেধ তুরঙ্গম সম—
(বিজয়ী)

১। জ্যোতির্ময়ী দেবী, 'মহিলা কবি প্রিয়ম্বদাদেবী', রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৮

দীর্ঘদিন বন্ধ্যাত্বের পর তাঁর জীবনে আনন্দধারার বর্ষণ হয়েছে। হৃদয়ের সকল দ্বার খুলে গিয়ে অনন্ত আকাশে তার প্রকাশ,—

যে পেয়েছে আত্মবিজয়ের মহানন্দ
অমৃতের আস্বাদন, নিম্মুক্ত সে, কোন বাধাবন্ধ
নাহি রহে কোথাও,⋯⋯।

(বিজয়ী)

অন্তর্মুখী যারা, তারা এমনিতেই দুঃখবাদী। প্রিয়ম্বদা একে অন্তর্মুখী, তার উপর সব হারানোর ব্যথায় জীবন তাঁর দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ এক আনন্দের প্লাবনে সব-বাধাবন্ধ দূর হয়ে গেল। কবি এক চেতনার আলোকে স্নান করে উঠলেন।

আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।

রবীন্দ্রনাথের এই বাণী যেন কবি চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে প্রদীপ্ত প্রাণ গভীর আনন্দে তাই বলতে পেরেছে—

স্পর্শ আসে বিশ্বদেবতার,
নিশিদিন যেথা অনিবার
মানবের দুঃখ ব্যথা সুখ আশা আকুলতা
সহজে খুঁজিয়া পায় স্নেহ অধিকার
সমদৃপ্তি ব্যাপ্ত মমতার।

(অবাধ)

বর্ষণক্লান্ত হয়েছে কবির মনের আকাশ, অঝোর-ঝরণ হয়েছে স্তব্ধ। কবির মনে হয় বিদ্যুতের মত প্রেম তাঁর জীবনে ক্ষণপ্রভা দান করে জীবনকে গভীর অন্ধকারময় করেছে। প্রেম কবির কাছে অতি দুর্লভ সম্পদ। প্রেম যেন

শুক্তি মাঝে মুক্তার মতন
দরিদ্রের আশাতীত ধন।

(প্রেম)

এই প্রেম যার ভাগ্যে জোটে, কবির মতে 'মর্ত্ত্য' জন্ম সার্থক তাহার'। সময়ের ক্লান্তি রেখা শোকের তীব্রতাকে কমিয়ে আনে। কবি আপন হৃদয়ের গভীর গহন থেকে দৃষ্টিকে বিস্তার করেছেন প্রকৃতির শ্যাম-শোভায়। বৃক্ষ-পত্ররাজি, আকাশ সাগরের মহান ঔদার্য তাঁর অন্তরে প্রশান্তি আনে। আর তাঁর কাব্যে বসন্ত ঋতুর মত পুষ্প-সম্ভার। কত অজস্র ফুল স্তবকে স্তবকে, বর্ণে, গন্ধে বিকশিত। পাঁচটি সনেটে সমুদ্রের বহুরূপ দর্শন ও বর্ণন অপরূপ। কখনও সমুদ্র দুর্বার অশান্ত প্রেমিক, আবার সেই সমুদ্র সৃষ্টির অনন্ত আধার। সমুদ্রের অজাগর গর্জনে তিনি সাম্যমন্ত্র শুনেছেন, জগবন্ধুর মন্দিরে পতিত আত্মার উদ্ধার

যেন তাঁর মানস নয়নে প্রকাশিত। প্রকৃতির শ্যামশোভা তাঁর দৃষ্টি স্নিগ্ধ করে মনকে ভক্তিরসে প্লাবিত করেছে। বহু কবিতায় তাঁর অন্তরের গভীর নিবেদনের সুন্দর প্রকাশ। প্রকৃতিতে তাঁর বিশ্বরূপের দর্শন হয়েছে।

তব অনন্ত শয়ন মাধব—
সাগরে কখনো নয়,
ধরণীর বুকে জড়ায়ে ধরিয়া
রয়েছ ভুবন ময়।
শ্যামল তোমার দেহের কান্তি
তাই চারিদিকে রাজে,
পল্লব দলে তৃণ শাস্বলে
ধান্য-লহরী-মাঝে! (শ্যামসুন্দর)

নিস্তব্ধ রজনীতে ধ্যানমগ্না মহাশ্বেতার প্রতীক্ষার ছবিতে আপন প্রতিকৃতি-বিম্বিত দেখতে পান কবি। তাঁর এই প্রকৃতি দর্শনে প্রিয়জনের শত স্মৃতি বিজড়িত। ফুলের শুভ্র জ্যোতিতে পুত্রের বিমল হাসি দেখতে পান কিংবা চন্দ্রালোক যেমন পরম সোহাগে ধরিত্রীকে জড়িয়ে ধরে তেমনি স্পর্শ কামনা করেন তাঁর প্রিয়ের।

প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের মধ্যে 'উৎকণ্ঠিতা', 'কলহান্তরিতা', 'বিরহিণী', 'অভিসারিকা' বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার এই চিত্রাবলী তাঁর চোখে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। রাধার বিরহ বর্ণনায় কবির অতলান্ত বিরহ আবার যেন নতুন করে হৃদয়কে ব্যাকুল করে তোলে। 'প্রোষিত ভর্তৃকা'য় তাঁর কণ্ঠ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে।—

নিদ্রা নাই নিদ্রা নাই নয়নে আমার
হে প্রবাসী তোমা লাগি, হায় অচেনার
বেদনা জনমে পরিচিত গৃহদ্বারে,
বাতায়ন আশঙ্কায় কাঁপে বারে বারে,—

তাঁর মন এ সময় বারবার অতীতচারী হয়েছে। প্রাচীন কাব্যের বিভিন্ন ছবি আবার তিনি নতুন রঙে রসে চিত্রিত করে তুলেছেন। কর্ণ, অর্জুন, ভীষ্মের পরাক্রম-শক্তির অনন্যতা তাঁর চিন্তাকে আলোড়িত করেছে—কাব্য রচনায় করেছে মগ্ন। তাঁর চিন্তাধারা প্রকৃতির মতই সুন্দর, শ্যামল—প্রকৃতি বর্ণনায় তাঁর দৃষ্টি বিরামহীন, চিন্তা সক্রিয়, আবার এর মধ্যেই আপন হৃদয়ের শূন্যতা, হাহাকার স্পন্দিত। 'প্রবাসে', 'চিঠি কই' কবিতা দুটি অতিমাত্রায় বাস্তব। তিনি বরাবর এই স্থূলতাকে এড়িয়ে গেছেন। এখানেই ব্যতিক্রম।

এসেছি আমরা ছেড়ে কলিকাতা
ধূঁয়ার বাস্তু বাড়ী,
যেথায় ধরণীর নাই শ্যামাঞ্চল
নীলিমার নীল শাড়ী,··· (প্রবাসে)

এবং

> চিঠি আসে, চিঠি আসে, উঠে আর পড়ে
> হিয়ার শোণিত, দৃষ্টি কেন ছুটি নেয় ?
> নিশ্বাস পড়ে না, হায় কেন ক্লান্তি ভরে
> নিতে গিয়ে ব্যগ্র হাত সব ফেলে দেয় ?

(চিঠি কই)

'স্বপ্নশিশু' কবিতাটি হারানো পুত্রের স্মরণে, মননে অতুলনীয়। তাঁর কবিতার পরিচ্ছন্নতা ও সুষমা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে, কিন্তু কবিতার ক্ষুদ্রত্ব ও বাক্‌-দৈন্যের মত এর স্থায়িত্ব অতি সময়ের। বক্তব্য বিশেষ কিছু নেই বলে চিন্তাকে নাড়া দেয় না। তাঁর চিন্তা ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে সীমিত, প্রকৃতির সীমার মধ্যেই তিনি ব্যথার শান্তি খুঁজেছেন। কল্পনাকে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ, সান্নিধ্য পেয়েও তাঁর চিন্তা সহস্রধারা হয়নি। মানব-জীবন সঙ্গম থেকে আপনাকে সংবৃত করে রেখেছিলেন। নানা হিতকর প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েও জীবনস্রোতে আপন অন্তরকে মেশাতে পারেন নি। সমস্ত কাব্য জুড়ে তাই একাকিত্বের বেদনা। 'অংশু'তে প্রকৃতি বারবার দেখা দিয়েছে, প্রকৃতিতেই ব্যথার শান্তি খুঁজেছেন। ভারতের অতীত সংস্কৃত অভিজ্ঞা কবির মনে স্থান করে নিয়েছে, কিন্তু তথ্য ও তত্ত্বে বেশিক্ষণ মনোনিবেশ তাঁর পক্ষে যেন অসম্ভব। আবার আপনাতে ফিরে এসেছেন, আত্ম-ভাবনার মৃদু গুঞ্জনে মগ্ন হয়ে গেছেন। 'অংশু'র প্রথমাংশে যে 'আত্ম-বিজয়ের মহানন্দে'র কথা সরবে উচ্চারিত—শেষের দিকে তার চিহ্ন কোথায়! সেই ব্যথাভরে নমিত মৃদুভাষ কবির কথাগুলি স্বগতোক্তির মত—

> তোমারি চিন্তার মাঝে বেঁচে আছি আমি,
> তোমারি ভাবনাভারে মরিব এবার।
> চন্দ্র যথা সূর্য্য করে জীয়ে দীর্ঘ স্বামী
> তারি দীপ্তালোকে মরে প্রভাতে আবার।

(সুখমৃত্যু)

এটাই 'অংশু'র মূল কথা, শেষ কথাও এই।

সমালোচনী
পুস্তক সমালোচনা
১৩০৯

রেণু—প্রিয়ম্বদা দেবী—শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে 'রেণু' কাব্যকণাটি রাখিয়া দিলাম। 'রেণু' কতগুলি সনেটের সমষ্টি; অবশ্য অন্য ছন্দের কবিতাও দু'চারটি আছে। মনে হয়, যেন বাঁশী একটি মাত্র গান জানে—তাহাই সে নানা সুরে বাজাইতেছে।

যাহা হৃদয়ের নিতান্ত কাছে ছিল, যাহা একমাত্র সম্বল ছিল, তাহা এক হিসাবে হারাইয়া গিয়াছে—এমন জিনিষটির আকর্ষণ কি প্রবল। তাহারি জন্যে বিরহিণীর আর সোয়াস্তি নাই—তাহাকে চিরকাল জাগিয়া থাকিতে হইতেছে। যেন দেব-মন্দিরের দেবতা নাই, তাই প্রদীপটিকে আরো ধৈর্য্যে, আরো প্রাণপণে আপনাকে জ্বালাইয়া রাখিতে হইতেছে। সেই প্রেম-দীপখানির দিকে চাহিয়া তপস্বিনী জাগিতেছেন, আর মানুষের যাহা সাধ্য অর্থাৎ 'we look before and after', সেইরূপে কখন আগে কখন পাছে চাহিয়া দিন কাটাইতেছেন, যখনি দৃষ্টি অস্থির হয়, শূন্য হইয়া বহির্জগতের উপর ঘুরিয়া বেড়ায়; তখনি বুক ফাটিয়া একটা নিশ্বাস বাহির হয়—'আসন্ন বসন্তে' বনের ফুলগুলি সব ফুটিয়া উঠিলে হৃদয় কাঁদিয়া ওঠে—"বসন্ত আসিয়াছে—কিন্তু তোমার সখা আজি কোথায়? কিন্তু যখনি আবার দৃষ্টি নিশ্চল হয়, প্রেমদীপ উজ্জ্বল শিখা ধরিয়া দাঁড়ায়, তখনি

"ঝরিছে কিরণ……
শত লক্ষ ধারে আমি করিতেছি স্নান
নগ্ন অনাবৃত চিত্তে উন্মুখ অধরে।
… … … …
…জাগি ওঠে মনে
সীমাহীন নভস্তল, চন্দ্র সূর্য সনে
অযুত নক্ষত্রলোক, বসন্ত শরতে
জীবনের মহাযাত্রা অন্তহীন পথে।"

—ইহা শুধু একটা 'নিশ্চয় পাইব' বলিয়া বিশ্বাসের ঘোষণা নহে; ইহাতে আবেগের পরিপূর্ণ গৌরব রহিয়াছে—তাই 'রেণু'কে এত আদর করিতেছি। কিন্তু এ সুর বহুক্ষণ মানুষের কণ্ঠে থাকে না, এক একবার জাগিয়াই মানুষকে কৃতার্থ করিয়া দেয়। তাই 'রেণু'র মাঝে মাঝে নিশ্বাসে হৃদয় ভারী করিয়া অবশেষে 'বিদায়ের পরে' ব্যথিত গানে সাশ্রুনয়নে বইখানি বন্ধ করিতে হয়। কিন্তু 'রেণু'র আর একটু বিশেষত্ব আছে। প্রথমে যে সুরের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা শেষের সুরটিই 'রেণু' কাব্যে প্রবল। অন্তরের ধন প্রিয়তমকে নানারূপে সম্ভোগই অনেকগুলি কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। কারণ এ সম্ভোগে চাঞ্চল্য নাই—ইহা পবিত্র গম্ভীর—কারণ দেবতা স্বর্গে এবং অসীমে, অতদূরে আকর্ষণ করিতে হইলে মানুষকে খানিকটা ব্যগ্র, শুদ্ধ হইয়া ভক্তির গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ প্রেমের আশ্রয় লইতে হয়—সহজ চঞ্চল খেলাধূলা হাস্য প্রমোদের মধ্যে কখনও আর প্রেম কৃতার্থ হইতে পারে না। মৃত্যু প্রেমকে গম্ভীর করে। 'স্বপ্নে ও জাগরণে' শীর্ষক চমৎকার কবিতাটি পড়িয়া দেখুন। বাস্তবিক—

"তুমি মৃদঙ্গের রব গম্ভীর বিশাল
আমি তার মাঝখানে মন্দিরার তাল।"

টি অসীমের সম্মুখে ধ্যানে বসিয়া উপলব্ধি করা যত সহজ, জীবনের হর্ষ-

খেলা-চঞ্চলতার মধ্যে করা তত সহজ নহে। মৃত্যুই এই ধ্যান-পরায়ণ গাম্ভীর্য্য আনিয়া দেয়।

আমরা ঠিক 'রেণু'র মোটামুটি ভাবটি বলিলাম। দুঃখিত আছি যে, যথেষ্ট-রকম উদ্ধৃত করিয়া হাতে হাতে আমাদের প্রতি কথায় প্রমাণ দিতে পারিলাম না। সে পরিশ্রমটুকু পাঠক পাঠিকার ভাগে রহিল।

কিন্তু আমাদের এইরূপে মোটামুটি বিশ্লেষণের মধ্যে এতটুকুও নিহিত নাই যে, বইখানি আদ্যোপান্ত সুসংযত এবং অখণ্ডগ্রথিত? যে, ইহার আন্তরিকতা ও আবেগে 'রেণু' শক্তিশালী? এবং পরিশেষে—যে কাব্যটি নূতন উপমা-অলংকারে, আপনার একটি স্বতন্ত্র ভাবরাজ্যে এবং নির্দ্দোষ ছন্দের সম্পদে নিতান্তই গৌরবান্বিত? তাহা না হইলে আমাদের মনে একটা কিছুই ছাপ পড়িত না—বিশ্লেষণও করিতাম না।

'রেণু' ব্যাপক প্রতিভার চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত অসংখ্য ভাব-ফুলের আকাশভরা গন্ধরেণু নহে—একটিমাত্র ভাবের বাগানে একজাতীয় মাত্র ফুলের রেণু; আপনার মধ্যে আপনি এত সম্পূর্ণ যে, প্রথমটা ভাবিয়া পাই না—এ কবির আর কোনদিকে বিকাশের সম্ভাবনা আছে কিনা—কিন্তু আর একটু অনুধাবন করিলে একটি রন্ধ্র পাওয়া যায়। বাস্তবিক দুঃখে অভিভূত করিয়া ভাঙিয়া দেয়, আনন্দে অভিভূত করিয়া সবল করে। 'রেণু'র কবি বিশ্বাসের বলে যেন শেষোক্ত-রূপেই অভিভূত। তাই ছাড়া 'রেণু'তে যে প্রকৃতির ছবিগুলি দেখিলাম, কিংবা অন্য দু-একটি ভাবের আলোচনা দেখিলাম—তাহাতে প্রিয়তমের বিচ্ছেদ-মিলনের ছায়া-লোকপাত থাকিলেও সেগুলির মধ্যে যেন কবির একটু স্বতন্ত্র আনন্দ আছে—সেগুলি যেন ঐ সর্ব্বগ্রাসী ভাবটির ছায়া ছাড়াইয়া একটু এদিকে ওদিকে কাঁপিতেছে। এই পথে রেণুর কবির একটু বিকাশের সম্ভাবনা যেন আছে বলিয়া বোধ হয়। কবি যত মুক্ত হন, ততই তাঁহার মঙ্গল। একটা ভাল এবং প্রিয় ভাবের দ্বারাও চির-অধিকৃত থাকাটা মানুষের পক্ষে গৌরবের নহে।

'রেণু'র ভাষা রবীন্দ্রবাবুর শব্দে অনেকটা পুষ্ট। সনেট্‌গুলির যতিও অনেকটা রবীন্দ্রনাথের যতির মতই। শব্দ ও ছন্দ যাহাই হোক—পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, 'রেণু'র একটি স্বতন্ত্র ভাবরাজ্য আছে, যাহা আধুনিক অনেক কাব্যেই দুর্লভ।

চম্পা ও পাটল

প্রিয়ম্বদা দেবীর শেষ কাব্যখানি 'চম্পা ও পাটল' তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ এই দুঃখী স্নেহভাজনীয়া কবির কাব্যের ভূমিকা পরমযত্নে লিখে দিয়েছিলেন। অল্পকথায় তিনি প্রিয়ম্বদার কাব্যের পূর্ণায়ত সমালোচনা করেছেন। "প্রিয়ম্বদার কবিতার প্রধান বিশেষত্ব রচনার সহজ ধারায় অলঙ্কার শাস্ত্রে যাকে বলে প্রসাদগুণ। স্বচ্ছ তার ভাষা, সরল তার ভাবের সংবেদন। সে যেন ফুলের মতো, বাইরে থেকে যার পাপড়িতে রং ফলানো হয়নি, আপন রং যে নিজের অগোচরেই সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আর সেই ফুলটি যূথী মালতী জাতের,

পেলব তার চিক্কণতা, সে চোখ ভোলায় না প্রগল্‌ভ প্রাসধনে, মনের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য সুগন্ধের প্রেরণায়। প্রিয়ম্বদার অধিকার ছিল যে সংস্কৃত বিদ্যায় সেই বিদ্যা আপন আভিজাত্য ঘোষণাচ্ছলে বাংলাভাষার মর্যাদা কোথাও অতিক্রম করে নি; তাকে একটি উজ্জ্বল শুচিতা দিয়েছে, তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে অনায়াসে—গঙ্গা যেমন বাংলার বক্ষে এসে মিলেছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। বিশ্বপ্রকৃতির সংস্রবে প্রিয়ম্বদার স্পর্শ সচেতন মন যে আনন্দ পেয়েছিল কাব্যে সে প্রতিফলিত হয়েছিল, জলের উপরে যেন আলোর বিচ্ছুরণ. আর জীবনে যত সে পেয়েছে দুঃসহ বিচ্ছেদ বেদনা কাব্যে তার একান্ত আবেগ দেখা দিয়েছে নারীর অবারণীয় অশ্রুধারার মতো।”

‘চম্পা ও পাটল’ দুটি খণ্ডে একটি পূর্ণ কাব্য। ফুল ‘চম্পা’র প্রাণ। কত বর্ণ, কত গন্ধ-যুক্ত পুষ্পের ছড়াছড়ি এই কাব্যে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাহ ধরণীকে ব্যথা-ক্লিষ্ট করে তোলার একটা চিত্র ফুটে উঠেছে ‘ভ্রষ্টলগ্নে’। স্বল্পবাক্‌ কবি যেন শেষ কাব্যে বিভিন্ন কবিতায় শব্দের চিত্রমালার আয়োজন করেছেন। ‘পরিণাম’ রসহীন গ্রীষ্মের কল্পমূর্তি,—

কামিনীর দেহে এলো যৌবনের জোয়ার, কল্পনার সুন্দর প্রকাশ,—
সুদূর সে আকাশের আলোর পরশে
কামিনী শিহরি উঠে জাগিল হরষে
কি সৌরভে ভরে গেল মন।

ঋতু আবর্তনে প্রকৃতির পুষ্পসজ্জার পট পরিবর্তন কবির দৃষ্টি এড়ায়নি, বর্ণনাতেও বাদ পড়েনি। শীতের হিমেল স্পর্শে,

কামিনী সে অভিমানে চলে গেছে কোনখানে
কাঞ্চন প্রবাসী তার আগে।
মাধবী মালতী বেলা চলে গেছে ভেঙে খেলা,
উদাসিনী হয়েছে পারুল.
ফোটে না তাম্বুল রাগ দাড়িম্বের ফুল।

জীবনের প্রেম কথনেও ফুলের ছড়াছড়ি, যেন একটি ফুল বাসর। কবির অন্তরই হয়ে উঠেছে পুষ্পের বর্ণগন্ধময়। এর মধ্যেই আবার জমে ওঠা ব্যথা হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে আঘাত করে। তাঁর ইচ্ছে করে অশ্রুর প্লাবনে সব ভাসিয়ে দিতে। প্রকৃতির অম্লান শোভা আনন্দে ভরে দিতে পারে না তাঁর চিত্ত। তাই বলেন,

আনমনে চেয়ে থাকি, দিন চলে যায়,
আলোর সাগর তীরে, কালো রেখা পড়ে কিনারায়।

ঋতুর রূপাভিসারে বর্ণ, শোভার অন্ত নেই। ‘সূর্যাস্ত’-এ রং-এর বাহার।

পাকুড়ের সাজের বাহার
সবুজ পাতার বোঝা, সোনা দিয়ে ধোয়া

ছবির পর ছবি দিয়ে চম্পার অঙ্গাভরণ করেছেন।

সারাদিন শুধু চেয়ে আছি,
মেটেনা পিপাসা তবু আঁখির আমার,...

এই দেখা, এই পাওয়া তিনি চেয়েছেন, পেয়েছেন, কবিতার ছন্দে তাকে চির অমর করেছেন। জীবনের প্রান্তে এসেও এই রূপ দর্শনের বিরাম নেই।

কোন্ দরদীর ছোঁয়া
বুকের বীণার তারে তার
বাজাইছে রাগিণী বাহার,
গমক মূর্ছনা আর মীড়ে।

সৌন্দর্যধ্যানে 'চম্পা'র অবয়ব গঠন হলেও 'পাটলে' আবার কান্না উদ্বেল হয়ে উঠেছে। জীবনের শেষ বেলায় শারীরিক অসুস্থতাও তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। 'পাটলে'র প্রথম কয়েকটি কবিতা 'ইডেন হস্‌পিতাল'এ লেখা। মরণের উপকূলে এসে সারাজীবনের হিসাব মনে আলোড়ন তোলে, তাঁর অভিযোগ বেদনায় করুণ,—

আমি যদি কাঁদিতাম, হে বিধাতা!
পৃথ্বী তব ভেসে যেত জলে;
বহ্নিসম দীর্ঘশ্বাসে, দীপ্ত দাবানলে
নীলিমার কূলে কূলে শ্যামলিমা ছাই হত জ্বলে।

বিধাতার প্রতি অভিমান অন্যত্র আরো উচ্ছ্বসিত—

দেওয়া ধন কেড়ে নেওয়া, সে ত রীতি নয়,
বড় নিন্দা সে যে—
তবুও দিইনি অভিশাপ,
হাসিয়া উদাস নেত্রে বলেছি শুধু যে
—হায় মনস্তাপ!
যার আছে এত ধন, সেও কেন এমন কৃপণ?
আমরা দরিদ্র, দিতে এর চেয়ে করি প্রাণপণ।

হাসপাতালে বসে নতুন এক উপলব্ধি তাঁর চেতনাকে নাড়া দিয়েছে। এখানে এসে জীবনের প্রবাহ দেখেছেন, অনেকের স্পর্শে মন ভরে উঠেছে।

হীনতম যার কাজ সেও কাছে বসে আজ.
কয় সুখ দুঃখ
নয়নের শুধু নয়, পরাণের পরিচয়,
ভরি দেয় বুক।

শুধু মানব নয়, মূক প্রকৃতি, চঞ্চল পাখী সকলের কাছে হৃদয়ের ছোঁয়া পাওয়া যায়। গৃহে বৃদ্ধা মাতার প্রতীক্ষায় প্রহর গোনা মনে পড়ে। হঠাৎ আলোর

ঝলকানির মত বহুদূর অর্থাৎ জীবনের ওপার থেকে হারানো শিশুর কলকণ্ঠ রোগ-তপ্ত জীবন অমৃতে ভরে দেয়। ঘুরে ঘুরে মনে পড়ে বালকপুত্রের মুখ; তার তনুদেহের স্পর্শভাবনা জীবনের শেষবেলা রাঙিয়ে তোলে।

তরুণ তনুর পরশ তোমার
তৃষিত এবুক মাগে;
মুখখানি তব হেরিতে আবার
বার বার সাধ জাগে!

ঘুরে ফিরে পুরোণো স্মৃতির আলোড়ন হয়। চূর্ণিত তুষারের মত শুভ্র কেশদাম বয়সের জীর্ণতা প্রকাশ করলেও মন কিন্তু তরুণদিনের ভাবনাতেই মগ্ন। সেকথা বলেন,

আমিও তেমনি আছি অন্তরের চির তরুণিমা
প্রতীক্ষিয়া, স্পর্শে যার সকল ম্লানিমা
দূর হবে একেবারে ছাড়ি দেহ মন,
ইন্দ্রাণীর তনুদেহে অনন্ত যৌবন।

নানাস্থানে যান স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। 'পাটনা'য় লেখা 'পাতিয়া'তে তনুদেহের কথাই তিনি বলেন। পাটনায় রেডিয়াম হাসপাতালে যেতে হয় দেহের রোগশান্তির জন্য। রোগজর্জর শরীরেও দেহের প্রশস্তি—

এই দেহখানি
এরে আমি সমাদর মানি
বিধাতা গড়েছে এরে বহু স্নেহে কত না যতনে।

জীবনের অন্তরালে দৃষ্টি, মন পূর্বজীবনের ছবির দিকে আবদ্ধ। সারা জীবনের সঞ্চিত ব্যথা ছাড়া পেয়েছে অবরুদ্ধ স্রোতের মতন। যে দুঃখের কথা অতি মৃদুকণ্ঠে, প্রায় আভাসে চার, ছয়, আট লাইনে প্রকাশ করতেন, এখন তিনি সঙ্কোচমুক্ত, সে কথা বলায় তিনি অনেকটা বাক্‌মুখর।

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মহাকবি কালিদাসের স্মরণে যে শ্রদ্ধা নিবেদন, তার মধ্যে কবির নিজের কথাও প্রস্ফুট দেখা যায়।

কেবলি যে মনে আসে কত ভালবেসেছিলে ধরা,
তবু কেঁদেছিল প্রাণ মিলনের কামনায় ভরা,
প্রবাসী যক্ষের মত চিরজ্যোৎস্না অলকার লাগি
আজি কামনার স্বর্গে, ধরার অতীত অনুরাগী
একেবারে এল কি বিস্মৃতি ?…

মনে মনে কবি শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। যাবার আগে সকলের জন্য রেখে যাচ্ছেন শেষ প্রণাম।

তোমরা আমারে যারা বেসেছিলে ভালো,
মনের আঁধার কোণে জেবলেছিলে আলো,
মরণে বরণ করি আমি—

এবং

তোমাদের অন্তরের আনন্দ উৎসবে
আমারে করনি আমন্ত্রণ,
অকস্মাৎ করেছ লন্ঠন
নির্দয়াল দস্যুসম আমার সুনাম···
বিমুখ সে মুখ চেয়ে করিগো প্রণাম।

হিংসা, দ্বেষ, অভিমানশূন্য স্নিগ্ধ অন্তরের শেষ পরিচয়; কথাগুলি রবীন্দ্র নাথের গান খানি স্মরণে আনে,

যে কেহ মোরে দিয়েছ দুখ
দিয়েছ তারি পরিচয়
সবারে আমি নমি।

'পাটলে' কবি অন্তরের দ্বারমুক্ত করেছেন। এতদিনকার বাক্‌কুণ্ঠতা দূর হয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। জীবনপ্রীতি এখানে যেন গোধূলির অস্তরাগে নতুনরূপে প্রকাশিত।

'পাটলে'র শেষ কথায় যেন শেষ বিদায়ের বাণী—

স্বর্গসুখ পাই যেন, ধরণীর প্রীতি না হারাই,
দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখি প্রাণ হতে প্রিয় তোমরাই।

অপ্রকাশিত রচনা—

(কবিতাবলী)

চারটি কাব্য প্রকাশের পরও অসংখ্য কবিতা বহু পত্রপত্রিকায় এখনও ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, যা একত্রিত করে একাধিক কাব্য সংকলিত হতে পারে। ১২৯৩ সালের প্রথম প্রকাশিত কবিতা থেকে আরম্ভ করে ১৩৩০ সাল পর্যন্ত একমাত্র 'ভারতী'র কবিতাবলী এখনও কারোর সযত্নপ্রয়াসে একটি কাব্য গঠন করতে পারে। বিভিন্নকালের রচিত কবিতা 'রেণু', 'পত্রলেখা', 'অংশু' 'চম্পা ও পাটলে' স্থান পেয়েছে। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ১৩২০ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'র চৈত্রে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র' নামক কবিতাটি। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর এই কবি প্রশস্তি। ভক্তিপূর্ণ এই গীতি নিবেদন।

কবীন্দ্র রবীন্দ্র তুমি আকাশ সম্রাট,
একাকারে ইন্দ্র আর রবি
আলোছায়া বৃষ্টিধারা ইন্দ্রধনু খেলা
ইচ্ছামত রচিতেছ সবি।

সপ্ত বরণের তব তুলিকা পরশে
বিশ্ব হয় চিত্তপটে আঁকা
নেত্রে যার ছায়া ভাসে চিত্তে তারি আলো
তাই নিয়ে চিরদিন থাকা।

১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসের 'ভারতী'র 'স্বপ্নশিশু' 'অংশু'র অংগীভূত হয়েছে কিন্তু প্রিয়ের স্মরণে ভাদ্রমাসে লেখা 'নবজন্ম' কোন কাব্যে স্থান পায়নি। বছরের পর বছর বেদনার্ত হৃদয়ে বিরহী ক্রৌঞ্চীর মত একই বেদনাগীতি গেয়ে গেছেন।

কত অশ্রু শিশিরের অজস্র পতনে
গোধূলির স্বর্ণরাগ নিবে অযতনে,
অন্ধ-করা অন্ধকার চৌদিকে ঘনায়,
কত ধীরে কত বেদনায়।

('ভারতী', আষাঢ় ১৩২৩)

জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তাঁর হৃদয় বেদনা-বিধুর। এক চিন্তাতেই মন ভারাক্রান্ত। ১৩২৩ সালের 'ভারতী'র উপরিউক্ত ভাবধারা থেকে ১৩৩৮ সালের 'বঙ্গলক্ষ্মী'র আষাঢ় মাসের 'সারাদিন' কবিতার মূলগত পার্থক্য বিশেষ নেই।

বসিয়া ঘরের কোণে, একেলা আঁধার সনে,
এই কথা বার বার শুধু মনে আসে,
আমরা ধরার প্রাণী, ঘরের সীমানা মানি
সে ঘর আঁধার হলে আঁখি জলে ভাসে।

('বঙ্গলক্ষ্মী', আষাঢ়, ১৩৩৮)

১৩১৩ এর শ্রাবণের 'ভারতী'তে 'একা' কবিতাটি 'পত্রলেখা'তে প্রকাশিত। 'নিরুত্তর', 'আমার বেদনা' একই ভাবের, একই আকারের। কবিতা দুটি 'ভারতী' ছাড়া আর কোথাও স্থান পায়নি। 'ভারতী'তে এরকম বড় কবিতা আরো আছে।

'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠা থেকে অনেক কবিতা 'পত্রলেখা'য় স্থান পেলেও বাকীও আছে কিছু সংখ্যক।

প্রিয়ম্বদা দেবীর লেখার সময়সীমার মধ্যে প্রায় সকল পত্রিকাতেই তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত। প্রবাসী, বিচিত্রা, ভারতবর্ষ, মানসী, মানসী ও মর্মবাণী, বঙ্গলক্ষ্মী, বঙ্গবাণী, পরিচারিকা প্রভৃতি তৎকালীন সব নামী পত্রিকাতে প্রকাশিত তাঁর বহু কবিতা এখনও গ্রন্থনের অপেক্ষায় আছে। এসব কবিতা 'পত্রলেখা'র কবিতারাজির মত ক্ষীণতনু নয়, এর বক্তব্যও জোরালো। অনূদিত কবিতাগুলিও উল্লেখযোগ্য। ১৩২৩ সালের 'প্রবাসী'তে কার্ত্তিক সংখ্যায় জাপানী চিত্রকর, কবি ওকাকুরার তিনটি কবিতা 'কল্পতরু', 'কামনা' ও 'অন্তিম ইচ্ছা' প্রিয়ম্বদা দেবী অনুবাদ করেছিলেন। ১৩৩১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে ওকাকুরার কবিতার অনুবাদ 'আবেদন' এবং ১৩২৪ এর ফাল্গুনের পাতায় আছে 'অচিন পাখী'।

রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের কবিতা অবলম্বনে লিখেছেন, 'ঝড়ের রাত'। এটি

আছে ১৩১৫ সালের আশ্বিনের 'মুকুলে'। আর্থার সাইমন্সের কবিতার অনুবাদ 'কাশ-আন্দোলনে' আছে ১৩২০ সালের কার্ত্তিক মাসের 'ভারতী'তে। যে সব কবিতায় আপন অন্তরের ব্যথাভরা প্রতিচ্ছবি দেখেছেন সেই কবিতা অনুবাদেই তিনি সক্রিয় হয়েছেন বেশি। 'কাশ-আন্দোলনে'র একটি স্তবকেই তার প্রমাণ মিলবে।

কাশের চামর কহে শ্রান্ত মরমরে,
হায় ব্যর্থ জীবনের বিফল স্বপন
লুপ্ত শান্তি, স্মৃতি যার পড়েছিল ঝরে
এ বুকে ফিরিতে সেকি করেছি রোদন!

'মানসী ও মর্মবাণী'তে দেখা যায় সকল মাসেই তাঁর কবি চেতনাকে নাড়া দিয়েছে প্রকৃতি। ফাল্গুনে বসন্তের ফুলরাজি, এত রূপ, এত শোভা তাঁর দৃষ্টিকে আনন্দ-বিস্ময়ে তন্দ্রাহারা করে, তবুও তাঁর হৃদয়ের গুরুভার সরেনা। মনে হয়,

নাই মিল অন্তরে বাহিরে,
গান থেমে আসে ধীরে ধীরে।
বসন্তে ফাল্গুনী আর লেখেনা লেখনী,
ফুরাল রতন ভার অন্ধকার খনি।

চৈত্রে চিত্রা নক্ষত্রের উদ্দেশে কবিতা রচনা—

তুমি মোর সুন্দর স্বপন,
বিরহী হিয়ার কামনা সঙ্গোপন।

ঝরে পড়া তাঁর কাব্যে একটি সংকেত বিশেষ। পাতা ঝরা, ফুল ঝরে যাওয়া বিভিন্ন কবিতায় স্থান পেয়েছে। তাঁর জীবনের প্রচ্ছন্ন বেদনার গোপন আভাস যেন এতে পাওয়া যায়।

'পাতাঝরা'য়

পাতা যে ঝরিছে রাশি রাশি
রক্ত পীত ধূসর পাটল,
মহীরুহ পাদপের দল…

('মানসী ও মর্মবাণী', চৈত্র, ১৩৩২)

১৩৩৬ এর 'মানসী ও মর্মবাণী'তে 'বলরাম চূড়া'য় পুষ্পঝরা দেখা যায়,—

সারাদিন পুষ্পবৃষ্টি করিছে পবন,
যেই ফুল বলরাম ধরেছেন শিরে,
দিবসে ধরার বুকে আতপ্ত জীবন
স্নিগ্ধ হয় নিশার শিশিরে।

'অংশু'র

'কামিনী ঝরিয়া গেছে যামিনী বিদায়ে'

সবই জীবন থেকে খসে পড়ার বর্ণনা।

ঋতুচক্রের আবর্তনে শ্যামলা ধরণীর রূপ বিলাসের দিকে কবি প্রিয়ম্বদার ক্লান্তিহীন দৃষ্টি। মাসে মাসে বিমুগ্ধ মনের উপহার দিয়েছেন বিভিন্ন পত্রিকায়। যে কবিতারাজি ছড়িয়ে আছে প্রাচীন পত্রিকার জীর্ণ পাতায়—তাতে বিস্ময়ের তন্ময়তা আর মর্মবেদনা অঙ্গাঙ্গীযুক্ত।

'রেণু', 'পত্রলেখা', 'অংশু' এবং 'চম্পা ও পাটলে' প্রিয়ম্বদার সরল, সংক্ষিপ্ত কবিতার সঙ্গেই পাঠকের পরিচয়। কিন্তু 'ভারতী', 'বিচিত্রা', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'পরিচারিকা', 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় কত বড় বড় কবিতা বহু কথার ভারে স্থির হয়ে আছে।

'ভারতবর্ষে'র নারীমঙ্গল ও শিশুমঙ্গলের বক্তব্য সুন্দর ও নতুন। অবশ্য শিশু-মঙ্গলে সেই পুষ্পবর্ষণ।

ধরণীর পুষ্পবন সকলি উজাড়
তোদের জোগাতে, যাদু, পূজা-উপচার।

'শিশুমঙ্গলে' শিশুর কাকলির তুলনা দিতে পাখীর মিষ্ট কলতানের উপমা কম নয়।

১৩২৭-এর পৌষের 'পরিচারিকা'র 'জীবনের বেলা' কবিতায়—

জীবনের বেলা বলি অঙ্কিত ললাটের মত আজ
দুঃখ সুখের জোয়ার ভাঁটায় কত কেটে গেছে খাঁজ।

জীবন-বেলার কথা বলতে একটা ক্লান্ত সুর স্বতই ধ্বনিত হয়েছে। পরতে পরতে যে দুঃখ জমা রয়েছে, ফাঁক পেলেই তার প্রকাশ হয়েছে। এই সুরের প্রতিধ্বনি শোনা যায় ১৩৩০-এর 'ভারতী'র জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যার যথাক্রমে 'পঞ্চাশৎ' ও 'বিরাগ' কবিতায়। এই কবিতাগুলিতে মর্মবেদনা অধিকতর প্রস্ফুট।

পঞ্চাশ বছর গেল চলে,
কোন্ পথে গেল তারা যায় নাই বলে!
শুধু নিয়ে গেছে অনেক আমার
সুখের দুখের সাথী, স্বপ্ন সুকুমার!

(পঞ্চাশৎ)

কিংবা

দিনতরী হল খেয়া পার,
সন্ধ্যা আসে ধীরে ধীরে অস্ত সাগরের তীরে,
মুদ্রিত কমল ফুল, মৃদু তনু ভার;

(বিরাগ)

১৩৩২ এর 'প্রবাসী'র ফাল্গুন সংখ্যায় 'এই চিঠিখানি' এবং 'পথচেয়ে' কবিতা দুটি যেন কবির নিঃস্ব হৃদয়ের অশ্রু-ভাষ্য।

এই চিঠিখানি,
লিখেছিনু যবে বাণী
আছিল প্রচুর।
গত সেদিনের কত কথা এ মনের উজল মধুর
হাসি দিয়ে মাত্রা দেয়া আলো দিয়ে লেখা,
ঝলমলে রূপ আর নাহি যায় দেখা,
হাতে হাতে মুছে গিয়ে ঝরা মরা কালী,
সাদা কাগজের বুক চেয়ে আছে খালি
ছায়ার মতন,
ফাঁকা বুক ভরে রাখা স্মৃতি পুরাতন।

(এই চিঠিখানি)

'পথ চেয়ে' কবিতায় আরো শূন্যতা—

পথ চেয়ে বসে আছি,
শুধু আশা লয়ে বাঁচি,
কবে যে গিয়েছ তুমি চ'লে,
এ অদূর পথ চেয়ে আরবার যাবে গেয়ে,
চোখে চেয়ে যাবে কথা বলে,
পড়িবে তোমার আলো বুকের আঁচলে।

প্রিয়ম্বদা দেবীর সারাজীবনের কাব্য সাধনার মূল সুর ছিল এই অশ্রু-সজল করুণ মর্মবাণী। তবে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত এরই মাঝে আনন্দের সুর ধ্বনিত। অন্যতর চেতনায় প্রদীপ্ত প্রাণের মর্মকথার মূল্য অপরিসীম। ১৩৩৫ এর 'বিশ্ববাণী'তে কয়েকটি কবিতায় মেঘভাঙ্গা রোদে সব ঝলমলিয়ে উঠেছে।

'অন্তদৃষ্টি'তে—

তোমার সুন্দর স্মৃতি অন্তরের দৃষ্টি শক্তি মম,
তাই মোর চিত্ত মাঝে বিশ্বশোভা এত নিরুপম!

(বিশ্ববাণী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫)

'উত্তরাধিকারে'

যে সঙ্গীত নিশিদিন অবিরাম ধারে
প্লাবন করিছে ধরা, পূর্ণ মগ্ন করি
বিশ্বলোক, যে সঙ্গীত কবিচিত্ত ভরি
উদ্বেলিয়া বারম্বার তরঙ্গের মত
কাব্যে গানে ছন্দে তালে ভাষায় নিয়ত
আপনারে করিছে প্রকাশ মহানন্দে
যুগে যুগে দেশে দেশে,—সে ছন্দে

বাঁধ এ মর্মের তরী ; সন্তানে তোমার
দাও তবে আনন্দের রাজ্যে অধিকার।
(বিশ্ববাণী, পৌষ ১৩৩৫)

এ কবিতাগুলি জীবনের এক মহান্ উপলব্ধিতে ভাস্বর।

'মুকুল' পত্রিকা সম্বন্ধে বক্তব্য কিছুটা স্বতন্ত্রের দাবী রাখে। এটি সে যুগের বিখ্যাত শিশুপত্রিকা। এই পত্রিকাটি কবি পুত্র তারাকুমারের প্রিয় ছিল। তার আগ্রহে প্রিয়ম্বদা দেবী 'মুকুলে' লেখা দিতেন। পরে পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তার কচিমুখের মায়ায় বহু রচনায় 'মুকুল'কে সমৃদ্ধ করেছেন। ১৩০৯ সালের বৈশাখ মাসের 'মুকুলে'র 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতাটি ৩০/৪০ বৎসর আগে 'প্রার্থনা' নামে স্কুল পাঠ্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ ছিল।

জীবন আমার কর আলোকের মত
সুন্দর নির্মল
যেথায় যখন রব সেস্থান নিয়ত
করিব উজ্জ্বল।

সে যুগের স্কুলজীবনে কবিতাটি প্রায় সকলের পাঠ্য ও মুখস্থ ছিল। শিশু-মনের উপযোগী বিভিন্ন কবিতা রচনায় উপদেশাত্মক হলেও মিষ্টিমধুর কথা শিশুবৃন্দকে শুনিয়েছেন।

যা কিছু হেথায় উজল সুন্দর
ছোট বড় যত প্রাণী
যাহা কিছু জ্ঞান-বিস্ময় আকর
বিভুর করুণা জানি।
(মুকুল, ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩০৯)

ভগবানের প্রেমকৃপার কথায় কবি বলছেন, পৃথিবীব সর্বত্র 'তাঁহারি করুণা ছবি'। ১৩০৯, ১৩১০ বঙ্গাব্দের মুকুলের প্রতিটি কবিতায় প্রকৃতির অতুলন সৌন্দর্যভাণ্ডার ও পরমপিতার প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। 'প্রশ্ন' ও 'জিজ্ঞাসা' কবিতার বিষয়বস্তু ও মনোভাব প্রায় একই ধরনের।

'জিজ্ঞাসা'য় তিনি বলছেন,

শুধালেম আমি ছোট পাখীটিরে
কে তারে শিখাল গান ?
করিল আকাশ অপার সমীরে
উড়িতে শকতি দান ?
সে কহিল গাহি, মোদের ঈশ্বর
দিলেন মোদের পাখা,
শিখালেন নীড় বাঁধিতে সুন্দর,
গাহিতে অমিয়-মাখা।
(মুকুল, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩০৯)

'প্রশ্ন' কবিতায় একই কথা ভিন্নভাবে বলা—

ওরে ছোটপাখী, স্বর্ণ পক্ষধর
কে শিখাল গান এমন সুন্দর
এমন অমিয় সুধার ধারা ?
তিনি আমাদের দিলেন এস্বর
যিনি আমাদের পিতা।
আমাদের পিতা স্বর্গের দেবতা
এ ধরার সবি তাঁর প্রেমের বারতা।

(মুকুল, শ্রাবণ, ১৩০৯)

'অনন্ত অভয়' এক সুরেরই গীতি। ছোট ছোট কচি মনে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সৃজনের প্রকৃত রীতি।

কতগান ওঠে নিত্য বনে উপবনে,
তটিনীর কলকলে বসন্ত পবনে,
পল্লবের মরমরে, বিহঙ্গের গানে,
বরষার সকরুণ বারবার তানে ;
কত ধ্বনি, প্রতিধ্বনি, চরাচরময়
শুনাতেছে তব প্রেম, তোমার অভয়।

(মুকুল, চৈত্র, ১৩১০)

'কি দিব' (মুকুল, কার্তিক ১৩০৯), 'ভালবাসা যদি থাকে ঘরে' (মুকুল, পৌষ ১৩০৯), সন্ধ্যাবন্দনা (মুকুল, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩০৯) প্রভৃতি কবিতাগুলিতে কবি যেন সুধাময় বাণী সৃজন করেছেন। 'কে ভালবাসে' (মুকুল, কার্ত্তিক, ১৩০৯) কবিতায় এক কাহিনী গেঁথে তুলেছেন কবি।

১৩১৫ বঙ্গাব্দের মুকুলের বিভিন্ন কবিতায় কবির বিনম্র হৃদয়ের নতি, বিশ্বপিতার চরণে যেন অঞ্জলি হয়ে ঝরে পড়ছে। 'নববর্ষের গান' (মুকুল, বৈশাখ, ১৩১৫), প্রকৃতির উৎসব' (ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫) 'মহাভুবন' (মুকুল, আষাঢ়, ১৩১৫) সব একতারার একসুরের আরতিগীতি।

এ ধরণের কবিতা 'মুকুলে'র ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় মাসে মাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এগুলো নতুন করে প্রকাশের প্রয়োজন।

কাব্য ব্যতীত অন্যান্য রচনা

(গল্প ও কাহিনী)

শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য অনেক গল্প দিয়ে মুকুলে'র অঙ্গশ্রী বর্ধন করেছেন। এই রচনা ধারাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে। পশুপাখী বিষয়ক কিছু। এই লেখাগুলির দ্বারা তাঁর অসাধারণ জীবপ্রীতির কথা জানতে পারা যায়।

বিদেশী গ্রন্থ থেকে জীবজন্তু বিষয়ে বহু চিত্তাকর্ষক চিত্র রচিত হয়েছে। এগুলি ভাষান্তরিত। কখনও ভাষানুবাদ, কখনও বা ভাবানুবাদ। কিছু কিছু কাহিনী স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা থেকে রচিত। 'সন্দেশে'র গল্পগুলি সবই স্মৃতিজ। 'মুকুলে' আছে বিদেশী গল্পের ছায়া সঞ্চয়।

রূপকথার গল্পের ভান্ডার তাঁর বহু বিস্তৃত। ১৩০৫ এর মুকুলের 'কাহিনী' নামক গল্পটি রাজকন্যা ও ব্যাঙ রাজকুমারের কাহিনী। ১৩১১ বঙ্গাব্দের 'মুকুলে' বৈশাখ ও আষাঢ় মাসে আছে দুদেশের দুটি রূপ কথা। একটি কাফ্রিদের রূপকথা, অন্যটি জাপানীদের। মামুলি গল্প এদুটো নয়, একটু স্বতন্ত্র ধরণের।

কাফ্রি রূপকথা দুভাই ও তাদের স্নেহের বোনের গল্প। দাদাদের অনুপস্থিতিতে যাদুকরী তমালির চেষ্টায় তার পুত্র হাতীর সঙ্গে সোনার বিয়ে হয়ে গেল। মানুষের বেশে বিয়ে করে, পরে হাতীর রূপ ধারণ করে। দুই দাদা অনেক খোঁজ করে বোনকে দুঃখের হাত থেকে উদ্ধার করে।

জাপানী রূপকথায় কয়েকটি পৈশাচিক বিড়ালের কাহিনী।

থেকো সবে সাবধানে
শীকারি না জানে।

এক অসমসাহসী বিদেশী যুবক গানটি শুনে গ্রামে খোঁজ নিয়ে শিকারী নামক কুকুরের সন্ধান পায়। তার সাহায্যে এই প্রাণীদের ধ্বংসসাধন হয়।

'দুটি নক্ষত্রের কথা' (মুকুল, কার্ত্তিক, ১৩১৫), 'অক্ষয় ভান্ড' (ঐ, পৌষ, ১৩১৫) 'বসন্তের 'কাহিনী (মুকুল, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩১৬) সবই রূপকথা ধরণের গল্প। 'কাহিনী' (মুকুল, ফাল্গুন ১৩০৫) এবং 'অদ্ভুতবাক্স' (শ্রাবণ, ১৩৩২) এইসঙ্গে উল্লেখ্য।

দেবরাজ্ঞী জুনো সুন্দরী ক্যালিষ্টোকে কিছুতেই সইতে পারতেন না। একদিন সুযোগ পেয়ে তাকে ভালুকে পরিণত করলেন। পুত্র মাকাসও ছিলেন মায়ের মতই অপরূপ সুন্দর। একদিন শিকারকালে মা, পুত্র মখোমুখি হলে দেবরাজ জুপিটার তাদের উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত করলেন।

'অক্ষয় ভান্ড' গল্পটি যেন Noah's Ark ও মধুদাদার দইয়ের পাত্রের মিলিত রূপ।

'বসন্তের কাহিনী' গল্পটিও সুন্দর। মর্ত্যদেবী সিরিনের একমাত্র কন্যা প্রসারপিন—রূপে, গুণে অতুলনীয়। পাতালের প্লুটো এই অনিন্দ্যসুন্দরী প্রসারপিনকে সুযোগ পেয়ে চুরি করে নিয়ে গেলেন। অনেক কষ্টে জুপিটারের কৃপায় পাওয়া গেলেও ছ'মাসের বেশী রাখা যায় না। এই ছ মাস পৃথিবীতে বসন্তকাল।

১৩১৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের 'মুকুলে'র গল্পগুলি ভিন্ন স্বাদের। গ্রীস ও রোমের পুরাণ থেকে বহু কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে এখানে। গ্রীস ও রোমের

বিভিন্ন দেবদেবীর উপাখ্যানে প্রধান হয়ে উঠেছে অ্যাপোলো, ডায়েনা, ভেনাস, কিউপিড, মার্কারি, প্লুটো ও প্যানের কথা।

জাতকের কাহিনী শুনিয়েছেন 'ভদ্রশীল জাতকে' (মুকুল, ভাদ্র, ১৩১৫), 'উতঙ্কের গুরুদক্ষিণা'য় (মুকুল, ভাদ্র, ১৩০৭) পুরাণের কথা শিশুদের উপহার দিয়েছেন।

প্রিয়ম্বদা দেবীর পোষ্য বেশ কয়েকটি পশুপাখী ছিল। এদের কাহিনী যেমন সরস করে ছোটদের জন্য রচনা করেছেন, বিদেশের অনেক রসালো গল্পও তেমনি এদের জন্য সংগ্রহ করেছেন।

Andrew Lang এর Animal Story Bcok থেকে সংগৃহীত গল্পরাজি 'টুবলু' (মুকুল, বৈশাখ, ১৩১৩), 'শাহ' (মুকুল, শ্রাবণ, ১৩১৬), এবং আলফাঁস দোদের গল্প 'ধবলীর বীরত্ব'[১] (মুকুল, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭) শিশুদের চিত্তরঞ্জনে তুলনাহীন।

ছোট্ট ইঁদুর টুবলুর সর্দার হয়ে ওঠার কাহিনী যেমন আনন্দদায়ক, ধবলীর নিজের ক্ষুদ্রগণ্ডী থেকে বেরিয়ে মৃত্যু ডেকে আনাও তেমনি কষ্টের। শাহ একটি বাঘের গল্প। মানুষের কাছে প্রতিপালিত হয়ে হিংস্র স্বভাবটি ভুলে সকলের প্রিয় হয়েছিল, তার মনোরম বিবরণ। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র ও আশ্বিনের 'মুকুলে' 'কুকুরের মহত্ত্ব' গল্পটি মনকে স্পর্শ করে। দুটি গল্প আছে এতে, বিশেষ করে কার্নো নামক কুকুরের গল্পটি তুলনাহীন।

'আমার ময়ূর' (সন্দেশ, শ্রাবণ, ১৩২০), 'কালা ও হায়দার' (সন্দেশ, অগ্রহায়ণ ১৩২৩), 'পোষা হরিণীর গল্প' (সন্দেশ, ফাল্গুন ১৩২৪) গল্পগুলি গৃহপালিত জীবজন্তুদের আচার আচরণ দেখে লেখা। 'আমার ময়ূর' গল্পে ময়ূরের দুরন্তপনার কথা বলতে যেন অন্তরের স্নেহ গলে পড়ছে। শিশুকালের কুৎসিত চেহারা কিরূপে অপরূপ রূপলাবণ্যে ভরে গেল তার বিশদ বিবরণ। খাঁচার পাখীকে কেমন করে ছেড়ে দিয়েছিল, বেড়াতে গিয়ে এক জার্মানের হাতে পড়ে মৃত্যু ডেকে আনল বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকা।

'প্রতিদিন যখন গরম জল দিয়ে ধুইয়ে ওষুধ বেঁধে দিতাম কোন আপত্তি করত না। এত যে তার দুষ্টামি সব যেন কোথায় চলে গেল। এমন নরম হয়ে থাকত দেখলে বড় কষ্ট হত—যদি বলতাম তোর পা দেখি—অমনি কাৎ হয়ে শুয়ে পা দেখাত। যখন ময়ূরটা মরে গেল তখন মনে মনে বল্লাম আর পাখী পুষব না।"

লেখিকার রচনা গুণে পোষা হরিণী, কালা ও হায়দার নামে ঘোড়া দুটির গল্প সবই অতি সুন্দর, মনোরম এবং শিশু চিত্তহারী।

হায়দার নামে দুর্দান্ত ঘোড়াটি কেমন করে বশ মেনে সুযোগ্য হয়ে উঠল সেই গল্প। আর কালার তো তুলনাই নেই। প্রতিটি অংশ উপভোগ্য।

'পিনোশিয়ো' অবলম্বনে 'পঞ্চুলাল' নামে কাঠের পুতুলের গল্প বইটি বালক, বালিকাদের সুখপাঠ্য। তখনকার দিনের রীতি অনুযায়ী নীতি উপদেশ প্রিয়ম্বদা দেবীর গল্পেও থাকত ; 'পঞ্চুলালে'র উপসংহারে সেইভাবেই শেষ হয়েছে।

ঘরে ঘরে পঞ্চুলাল জন্মে আর বাড়ে,
তাহাদের দুষ্টামি যদি কভু ছাড়ে
এ কাহিনী লেখা হল, সেই ভরসায়—
হরি হরি বল সবে, পালা হ'ল সায়।

'কথা ও উপকথা' এবং 'অনাথ' নামে আরো দুটি শিশুপাঠ্য বই আছে। 'কথা ও উপকথা'র গল্পগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'অনাথ' বইটি ইংরেজী বইয়ের ছায়া অবলম্বনে লেখা বলে অনুমিত হয়। শার্লট ব্রণ্টি ও তার ভাইবোনদের ছেলেবেলাকার কোন ঘটনার ছায়াপাত এতে আছে মনে হয়।

কবিরূপেই প্রিয়ম্বদার পরিচিতি হলেও গদ্যসাহিত্যেও তাঁর অবদান কম নয়। ছোটদের জন্য যেমন বিভিন্ন কাহিনী, গল্প সঞ্চয় করেছেন, বড়দের জন্য রচনার আয়োজনও বিপুল এবং বিস্তৃত। এই রচনাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে। ছোট ছোট নিবন্ধাকারে রম্যরচনা—লেখিকা এতে বিশেষ আবেগকে মুক্তি দিয়েছেন। ভাষার স্বাচ্ছন্দ্যে, বিষয়ের বৈচিত্র্যে এগুলি তুলনাহীন। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র সঙ্গে এদের তুলনা চলে। এ হেন কবিতার এক একটি স্তবক।

১৩১২ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'র পৌষ ও চৈত্র সংখ্যার 'কণিকা' এরকম বিচিত্র ভাবনার খণ্ডমুহূর্ত। এগুলি ছোট ফুলের মত আপনাতে পরিপূর্ণ।

"বিষ্ণু যখন অখণ্ড দেবতা তখন বৈকুণ্ঠে তাঁর অমর জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবী, আবার, তিনি যখন অখণ্ড মানব রামচন্দ্র, তখন তাঁর একমাত্র প্রণয়িনী জানকী, কেবল তিনি যখন কৃষ্ণ অবতারে কতক মানুষ, কতক দেবতা তখনি তাঁর সত্যভামা, রুক্মিণী ছেড়ে আরো অনেকগুলির আবশ্যক হয়েছিল।"

(ভারতী, পৌষ ১৩১২)

একেবারে ভিন্নচিন্তার রূপায়ণ আরেকটি—

"যেদিন লিখবার ঝোঁক চাপে সেদিন অকস্মাৎ একেবারে এত ছন্দ, এত কথা, এত ভাব মনের মধ্যে এসে পড়ে যে অস্থির হয়ে উঠতে হয়। একসঙ্গে কোকিল, পাপিয়া, চাতক, কলহংস সবগুলি ছুটে এসে পড়ে। কতক যদি বা বলা হয় তো অনেক পড়ে থাকে—একলা একটুখানি মানুষের মন পেরে উঠবে কেন? এত বড় পৃথিবী এমন বিশাল তাতেও পর্যায়ক্রমে ঋতুগুলি দেখা দেয়; একে একে কোকিল, দয়েল, চাতক, কলহংস গান গাইবার অবসর পায়।"

১৩২৪ এর 'ভারতী'র 'কণিকা'র বৈচিত্র্যেও চিত্তাকর্ষক এবং গভীর চিন্তা প্রসূত।

"এক একরকম দুঃখ আছে বৈরাগ্যের মত, সন্ধ্যায় গেরুয়া আলোর মত শ্রান্ত। তার মধ্যে কোন আগ্রহ কি চেষ্টা নাই। কিরণের দীপ্তি নিবু নিবু করতে করতে একেবারে নিবে আসে, প্রখর তাপ দূর হয়ে চারিদিক ছায়ার জালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, চারিদিক নিঃশব্দ নির্জন হয়।

*　　*　　*　　*　　*

"কিন্তু আর একরকম দুঃখ আছে যা, রাত্রিশেষ প্রভাত সূর্যের মত একেবারে প্রদীপ্ত অগ্নিবর্ণ। তার তপ্তস্পর্শে সব জড়তা দূর হয়ে যায়—তপনের সহস্র রশ্মির মতই অজস্র আলোকের তীর তার বুকে গিয়ে বেঁধে, শ্রান্তি, শান্তি, স্বপ্ন, সুপ্তি সমস্তই সমাপন করে।

*　　*　　*　　*　　*

"দুঃখের মত নির্বাক কিছু আছে কি? চোখের জলেও তার প্রকাশ হয় না, দুঃখ যখন বড়ই গভীর আর মর্মন্তুদ হয়, তখন আহা-উহু, গেলাম, মলাম বলতে পারা দূরে থাক, তার অসহ্য যন্ত্রণা হ্রাস করে এক ফোঁটা চোখের জলও যে ঝরে পড়ে না।"

লেখিকার দুঃখ তাপে ভরা জীবনের অভিজ্ঞতাই এখানে বাঙময় হয়ে উঠেছে।

'কণিকা' ভিন্ন ভিন্ন ভাবনার মালা গাঁথা। আরেক জায়গায় পাই, "স্বাধীনতা অবিবেকী নয়, অবিমৃষ্যকারিতার স্থান তার মধ্যে হয় না। স্বাধীন মনোবৃত্তি উদ্দাম নয়, সাবধান এবং সতর্ক। স্বাধীনতার গতি উল্কার মত কক্ষ ভ্রষ্ট নয়, সে গতি গ্রহতারকার নিয়মিত সঞ্চরণ, অক্ষৌহিণী নক্ষত্র সবাই মুক্তপথে চলেছে।"

(ভারতী, শ্রাবণ ১৩২৪)

মনের নিরন্তর চিন্তারাশি যেন কায়া ধারণ করেছে প্রিয়ম্বদার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধগুলিতে। 'বিচার বিবেচন' ও খণ্ড খণ্ড কথা দিয়ে ঐক্যসাধন।

"জীবনে সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো বড় কঠিন ব্যাপার। সত্যি, সুখ, দুঃখ, স্নেহ বড় তীব্র, বড়ই তীক্ষ্ণ, একেবারে মর্মন্তুদ শেল বিঁধেই আছে, বেদনায় সমস্ত জীবন জর্জর হয়ে যাচ্ছে, তবু এ শেল তুলে নেবার কেউ নেই, এ ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেবার মত ঔষধ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

(ভারতী, আষাঢ় ১৩২৪)

মানুষের মনে অসংখ্য চিন্তা বুদবুদের মত জন্ম নেয়, আবার মিলিয়ে যায়। যা শুভ, তাকে কথায় গেঁথে রাখলে তা পাঁচজনের পক্ষে মঙ্গল। প্রিয়ম্বদার এই ছোট ছোট নিবন্ধগুলি এমনি নানাচিন্তার ফসল।

"পাপ পুণ্য কি? আমার মনে হয় অপরকে দুঃখ দেওয়াই পাপ—যা আমরা জেনে শুনে করি, ইচ্ছে করে ফন্দি করে অপরের মন্দ হবে জেনেও করি, সেইটে বেশী অন্যায়। মানুষ দ্বিধায় পড়ে যেটা করে, কতকটা না বোঝবার দরুণ, কতকটা অহঙ্কার বশত ভ্রান্ত হয়ে, তার শাস্তিও হওয়া দরকার। কিন্তু সে শাস্তি যেন একেবারে প্রাণমারা বিধান না হয়ে বসে।"

(ভারতী, আষাঢ় ১৩২৪)

প্রিয়ম্বদার কবিতারাজি কান্নায় ভেজা—অন্তরমথিত অশ্রু যেন বিন্দু বিন্দু অশ্রুর আকারে শব্দ দিয়ে ঝরে পড়েছে, সারাজীবনের কবিতার রচনাতেই তাঁর অশ্রু নিবেদন। প্রকৃতিতে তন্ময়তা তাঁর কবিতাতেও আছে কিন্তু এই নিবন্ধ গুলিতে আছে সঞ্জীবনীসুধা সংগ্রহের প্রয়াস।

"কি সুন্দর সোনার আলোয় ঝলমল করা এই সকালবেলা। খোলা জানালা দিয়ে দেখছি নীল আকাশের এই গলানো সোনার ধারা দূরে নিমগাছের হাল্কা হলুদ পাতাগুলির স্তবকের উপর গড়িয়ে ঝরছে। দেখি আর ভাবি এই সোনার আলোয় হৃদয় আমার ভরে নিতে হবে। সত্যের প্রকাশে মিথ্যার মরণে সব অন্ধকার চির দিনের মত অন্তর্ধান হয়ে যাবে।"

(ভারতী, আশ্বিন ১৩২৪)

সমসাময়িক একটা কবিতার উদ্ধৃতিতে পার্থক্য স্পষ্ট হবে—

আমার বেদনা আর ধরিল না বুকে,
সে যে ছেয়ে গেল দূর আকাশের মুখে,
তীব্র দাবদাহে
পাণ্ডুর করিয়া দিল ঘন নীলিমায়,
রৌদ্রের প্রবাহে
অরণ্যের সঙ্গোপন স্নিগ্ধ তন্দ্রিমায়
দগ্ধ করি জ্বালাইল পলাশ, শিমুল
স্ফুলিঙ্গের গুচ্ছে বাঁধা অশোকের ফুল।

(ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৩)

১৩২৩ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখে রচিত 'পর্য্যায়' বেদ পঠন ও মননের সুন্দর নিদর্শন। আমাদের জীবন-পরিক্রমায় বেদের প্রতিফলন তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

"এই চারি বেদের আচার-বিধি আমাদের জীবনের কালভেদেও দেখতে পাই। শৈশবে আমরা সামবেদী, তখন গানের উপরই থাকি, ছন্দের উদ্বেলিত গতিতে আমরা চলি, উদাত্ত, অনুদাত্তের উদার পাদক্ষেপে তরঙ্গ গতিতে অগ্রসর হই, উত্থান-পতনের উপদ্রবে বারম্বার প্রবুদ্ধ হতে থাকি। যৌবনে আমরা ঋকদ্রষ্টা ঋষি, তাই বলে মুনি নই। কতই দেখি আর কতই দেখার আশায় উৎফুল্ল। নবীন চেতনার জাগরণে আমাদের নয়নমনে নূতন দৃষ্টি খুলে যায়, দেখি আর দেখাই। এ ঋক্ রচনায় নরনারী উভয়েরি সমান অধিকার। কি আনন্দেরি জাগরণ। আকাশ, ধরণী, আলোক আর ছায়া, পত্র-পুষ্প তৃণ-বল্লরী সবাই আপনাদের বুক অবারিত করে দিয়ে ভাল করে দেখে নেবার জন্যে, আমাদের কেবলি ডাকে। তখন আমাদের চোখে যে অঞ্জন আনন্দরেখা টেনে দেয়, তার উপকরণ পোড়ান ঘৃতের কালি নয়, সোনা গলান তরল আলো! সে দৃষ্টিতে অদৃষ্ট দেবী এসে পরশমণি বুলিয়ে দিয়ে যান; তাই যেখানেই তাকে ছোঁয়াই সেইখানেই সোনার স্বপন জেগে ওঠে। তারপর প্রৌঢ়ে আসে যজুর পালা;

নিবেদন আর আবেদন মন্ত্রপাঠ, আর তন্ত্র উদ্ভাবন—যখন প্রায় শেষ হয়ে এলো, তখনি আমরা 'দাও'-এর বুলি আরম্ভ করি। যৌবন তার ভরা ভাণ্ডার হতে কেবলই দান করে সে পূর্ণ ; তেজে-দীপ্তিতে, কামনা আর বাসনায় পরিপূর্ণ ; অবারিত তার দান-প্রবৃত্তি, তখন আর সঞ্চয় করবার কথা মনেই আসে না। প্রবীণ হয়ে হিসাবের খাতা খুলি, ব্যয়ের বিধানে মনোনিবেশ হয়, আয়ের কথা মনে আসে। তখনি দেবতার কাছে প্রার্থনার পর্য্যায় আরম্ভ হয়। আমি তোমায় বলে দিয়েছি, তুমি আমায় ধন দাও। 'ভার্য্যাং মনোরমাং' হতে কি-ই বা আমরা না চেয়ে থাকি ? তারপর শেষকালে জরার জড়তায় যখন আমরা স্থবির হতে চলেছি তখনই অথর্বের সাধনা করি।"

(ভারতী, আষাঢ় ১৩২৩)

'বসন্তের কথা' (ভারতী, চৈত্র ১৩২১), 'খোলা জানালায়' (ভারতী, শ্রাবণ ১৩২৩) মনের ভাল-লাগা ক্ষণের দুটি আলেখ্য-বর্ণন। 'শব্দ চিত্র' (ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩২২) 'ভরাবাদরে' (বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৯), 'আহ্নিকী' (বঙ্গলক্ষ্মী, আশ্বিন ১৩৩৯) এ জাতীয় তিনটি নিবন্ধ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সারাবিশ্ব যখন রক্ত নেশায় মাতাল, তখন অন্যদিকে আর্তের ক্রন্দন মহা-আকাশ ছেয়ে ফেলেছে সেই সময়কার 'যুদ্ধ-প্রসঙ্গে'। খ্রীষ্টানদের লোভ ও রক্তলোলুপতা তাঁর চিত্তকে নাড়া দিয়েছে।

"খ্রীষ্টান ধর্ম্ম বিশেষ করে ক্ষমারই ধর্ম্ম ; এক গালে চড় খেয়ে বিনা আপত্তিতে অন্য গাল পেতে দিবার বিধান এঁদের ধর্ম্মগুরু করেছেন ; তাছাড়া সর্বস্বত্যাগী হওয়াই খ্রীষ্টান জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য।...

"এই যে পাশ্চাত্য শৌর্যে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীর প্রায় সমস্তই অধিকার করেছেন, তারাই আবার ধর্ম্মের অস্ত্রে সমস্ত জাতিকে আয়ত্ত করবেন এ বিশ্বাস তাদের খুব দৃঢ়। যদিও এদের ধর্ম্ম দারিদ্র্য, সন্ন্যাস, উদারতা ও ত্যাগের ধর্ম্ম তবুও ইউরোপীয় ভাবগতিকের সঙ্গে এ সাধনার কেমন যেন খাপ খায় না। যেটা দান করা হয়, তার মধ্যেও আদায়ের একটা ভাব আছে।......

"যুদ্ধপ্রিয় ইউরোপ দেখবে যুদ্ধ কি ভয়ানক, ভাইয়ের বুকে ভাইয়ের ছুরি বসান কি কুৎসিত, কি অস্বাভাবিক, তেমনি আমাদের দেখতে হবে কর্ম্মহীন অসাড় জীবন কি অসার, জড়তা কি পরিমাণ স্বার্থপরতা, মানুষের স্বাধীন চিত্তবৃত্তি অকর্ম্মণ্য হয়ে থাকলে কত পাপেরই সৃষ্টি করে, যুগান্ত ধর্ম্ম ভিন্ন তার বিনাশ নাই।"

(ভারতী, বৈশাখ ১৩২৬)

মৃত্যু প্রিয়ম্বদা দেবীর সর্বস্ব নিয়েছে, মৃত্যু তাঁর কাছে বিভীষিকা। মৃত্যুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলেরই জানা আছে কিন্তু যতক্ষণ না নিজের জীবনে মৃত্যুর করাল ছায়া পড়ে ততক্ষণ তার ভয়াবহতা কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। প্রিয়ম্বদা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে মৃত্যুর ভয়াবহ রূপ প্রকাশ করেছেন 'স্মরণ' নামক রচনায়।

"বজ্রবেদনা বহন করে মৃত্যু যখন করাল-মূর্তিতে আমাদের সম্মুখীন হয়, সুখের সংসার ভেঙে-চুরে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, আশার নিত্য-নবীন সৌন্দর্য অন্ধকারে বিলীন হয়, তখনি বুঝি মৃত্যু কি ভয়ানক।……

"একান্ত নিঃসঙ্গ হবার শোকের মধ্যে এই যে প্রেরণা, বেদনাহতের এই যে স্বাতন্ত্র্য, অন্ধকারের মধ্যে অজ্ঞাতবাসের কামনা, এরমধ্যে বড় একটি মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত থাকে, আমরা সে কথা বুঝতে পারিনে।

(ভারতী, কার্তিক ১৩২৪)

মেটারলিঙ্কের 'নীলপাখী'র (Blue bird) গল্পের প্রসঙ্গ টেনে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন; "যাঁরা চলে গিয়েছেন, তাঁরা আমাদের এই শ্রদ্ধার, স্মরণের মধ্যে চিরদিন অমৃত।"

'সাহিত্য' পত্রিকা সেইযুগে রবীন্দ্রনাথের লেখার সমালোচনার জন্য সর্বদা উদ্যত বাহু ছিল। অন্যায়ভাবে আঘাতে আঘাতে রবীন্দ্রনাথকে জর্জরিত করেছে। 'ভারতী'র লেখককুলও তাদের কঠোর ভাষণ থেকে অব্যাহতি পাননি।

প্রিয়ম্বদা দেবীর উক্ত লেখার সমালোচনায় 'সাহিত্যে'র মন্তব্য, "প্রিয়ম্বদা দেবীর 'স্মরণ' গদ্য প্রহেলিকা। ইহাতে 'বেদনাহত' আছে, 'মৃত্যুশ্রী' আছে, মেটারলিঙ্ক আছে, কেবল নিস্‌জে নাই। তাহা হইলেই 'সময়োচিত' হইত।

(সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩২৪)

এছাড়া প্রিয়ম্বদা দেবীর ১৩২৪-এর 'ভারতী'র ভাদ্র ও কার্ত্তিক মাসের কবিতা যথাক্রমে 'পূজা' ও 'এবারের আগমনী'র বিরুদ্ধে সমালোচনা—"শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী 'পূজা' কবিতায় বলিয়াছেন—

"দুঃখ এ যে চির মৌন
কোথায় ভাষা তার।"

(সাহিত্য, আশ্বিন ১৩২৪)

এ ধরনের উক্তিকে শোভন বলা চলে না কোনমতেই। গভীর দুঃখ-প্রকাশের ভাষা যে নেই—তা হয়তো 'সাহিত্যে'র জানা ছিল না।

'ভারতবর্ষের বীর রমণী' ও 'স্ত্রী সেনা' অন্য স্বাদের ও ভিন্নজাতীয় রচনা।

সমরু বেগম, মহারাষ্ট্র বীর রমণী ও ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-র বীরত্ব কাহিনী 'ভারতবর্ষের বীর রমণী'র বিষয়বস্তু। 'স্ত্রী সেনা'র কাহিনী বেশ হৃদয়গ্রাহী।

"এই সকল যুদ্ধদৃশ্যে তাঁহারা নিয়তই পুরুষদিগকে পরাজয় করিয়া জয় গৌরবে গর্বিত। পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের বিশাল বক্ষে অকুতোভয়ে নিষ্ঠুর সাহসের সহিত অসি কিংবা বল্লম প্রথিত করিয়া দিতে উদ্যত এবং পরাভূত পুরুষগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন।'

"পেনথেসিনিয়ার হস্তে গ্রীসীয় অনেক শ্রেষ্ঠ বীর নিহত হন; পরিশেষে আর্কিনিসের সহিত যুদ্ধে রাজ্ঞী প্রাণ হারান। যুদ্ধের পরে আর্কিনিস তাঁহার অনুপম-রূপলাবণ্য এবং তরুণ বয়স দেখিয়া অত্যন্ত কাতরভাবে বালকের ন্যায়

রোদন করায় কোন অভদ্র গ্রীকযুবা তাহাকে উপহাস করে। এই কারণে তিনি তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন।"

(ভারতী, চৈত্র ১৩১৭)

স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা-তর্পণ প্রিয়ম্বদা দেবীর কয়েকটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'র পৌষ সংখ্যায় 'কুমারী নাইটিঙ্গেল' এক অসাধারণ কর্মপ্রাণা সাধিকার জীবনালেখ্য। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ৪ঠা আগষ্ট ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মৃত্যুর কয়েকমাস পর এই স্মৃতিচারণে তাঁর আজীবন কর্মসাধনার সংক্ষিপ্ত বর্ণন।

১৮৪০ শকাব্দের কার্ত্তিক মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'ভারত মহিলা ও রাজা রামমোহন রায়' নামে প্রবন্ধটি রামমোহন রায়ের স্মৃতি সভায় পঠিত হয়েছিল।

"তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা, চরিত্রবল, হৃদয়ের ঔদার্য, বিশ্বপ্রাণতা, মানব-মৈত্রী কতদিকে যে কাজ করেছিল, সেসব বিষয়ে আমার চেয়ে জ্ঞানী ও গুণী অন্য সকলে জানবেন; তাঁর সহৃদয়তা ও করুণায় আমাদের বঙ্গনারীগণের জীবনে যে নবযুগের সৃষ্টি হয়েছে, আমি শুধু সেই কথাটাই জানাব।"

১৮৪০ শকাব্দের চৈত্রে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত লর্ড বিশপের শ্রাদ্ধ-বাসরে' নামক প্রবন্ধটি স্মৃতিসভায় পাঠ করেন। কয়েকটি রেখাদ্বারা লর্ড বিশপের যে চিত্রটি রচনা করলেন, তা মানবতা ধর্মে উজ্জ্বল। দেশ, ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁর যে সহমর্মিতা ও মমত্ববোধ তা প্রায় দুর্লভ।

অশ্বিনী কুমার দত্ত সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতি-সভায় পাঠের জন্য ১৩৩৬-এর ৭ই নভেম্বর শ্রদ্ধাপ্লুত যে রচনা পাঠিয়েছিলেন. তাতে এক অসাধারণ পুরুষের পরিচয় আছে।

"বিরোধ-বাধা-বিক্ষুব্ধ বরিশালের সম্মুখে অশ্বিনীকুমার এই পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার মন্ত্রৌষধি গুণে বিরোধস্থলে সাম্য মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তিনি কর্মী হইয়াও যোগী ছিলেন; বিষয়ী হইয়াও ভক্ত ছিলেন। লোকগুরু, জননায়ক, পতিতের সহায়, পাপীর উদ্ধার কর্ত্তা, দেশসেবক, স্বদেশপ্রেমিক অনেক কিছুই ছিলেন; আশ্চর্য ছিল তাঁহার কার্যতৎপরতা ও সংগঠনীশক্তি। একাধারে এতগুণ ক্বচিৎ দেখা যায়।"

(মানসী ও মর্মবাণী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬)

কৃষ্ণভাবিনীর স্মৃতিসভায় এই অসাধারণ মহিলার জীবনকথা আলোচনায় এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। কৃষ্ণভাবিনীর সারাজীবন যেন এক কঠোর পরীক্ষা। বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বামী ও একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়েন। এরপর সরলা দেবী প্রতিষ্ঠিত ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের ভারপ্রাপ্ত হয়ে বহু শিশুর মাতৃসমা হন। "তিনি হৃদয়ে বল পাইলেন, এক সন্তানকে শিক্ষা

দিতে পারেন নাই, জগতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার দ্বারা সেই ক্ষোভ দূর করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন।"

(প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯)

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণভাবিনীর মৃত্যুর পর প্রিয়ম্বদা ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সম্পাদিকা হন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি পূর্ব থেকেই যুক্ত ছিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সরলাদেবী এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। সরলা দেবীর এই সুচিন্তিত ইংরেজী ভাষণটির অনুবাদ করেন প্রিয়ম্বদা দেবী। এটি ১৩১৭ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'র চৈত্রমাসে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩২৩ বঙ্গাব্দের 'সুপ্রভাতে'র অগ্রহায়ণে প্রকাশিত 'ঘরের কথা' ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলে পঠিত হয়েছিল। নারীদের কি করা উচিত এবং শিক্ষা কি রকম হওয়া উচিত তাই ছিল এর বিষয়বস্তু। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সম্পাদিকারূপে প্রিয়ম্বদা 'মানসী ও মর্মবাণী'র সম্পাদকের কাছে একটা পত্র পাঠিয়েছিলেন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাব নিয়ে।

ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রিয়ম্বদা দেবী যে সচেতন ছিলেন, তা তাঁর বিবিধ প্রবন্ধ থেকেই জানা যায়। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সম্পাদিকার নিবেদন'। এখানে সম্পাদিকার মূল বক্তব্য—স্ত্রীশিক্ষা পুরুষের চেষ্টা ও আনুকূল্যেই হয়েছে সত্য কিন্তু তবুও কিছু অভাব থেকেই যায়। তার ভার মেয়েদেরই নিতে হবে। তাই স্ত্রীশিক্ষা ও শিশু শিক্ষা নারীর হাতেই গড়ে ওঠা উচিত। এই দায় নিয়েছে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল। প্রিয়ম্বদা দেবী ইংরেজী, সংস্কৃত ভাষা অনুবাদে যে নিপুণ ছিলেন, তাঁর রচনাবলীতে তার অজস্র প্রমাণ আছে। মাতুল কুমুদনাথ চৌধুরী কৃত ইংরেজী ভাষায় লিখিত শিকার কাহিনীর বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এখানে প্রমথ চৌধুরীর সরস মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"সকালে সাহেব ডেকে বললেন, 'পবিত্র, একবার প্রিয়র কাছে দেখো তো, 'ঝিলে জঙ্গলে শিকার' কপির কতদূর। 'সে কপি তার কাছে কেন?' আমি বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম। 'সে তো সেজ সাহেবের কাছে না?' 'আরে সে তো সাহেব', হেসে বললেন ন' সাহেব, 'সে তো বাংলা লেখে না। প্রিয় করছে অনুবাদ।"[১]

অনুবাদ প্রিয়ম্বদার অজস্র আছে। সব দিয়ে একটি অখণ্ড রচনা সম্ভার করা যেতে পারে। বিষয় বৈচিত্র্যে, রচনা কৌশলে প্রতিটি হৃদয়গ্রাহী।

Hudson লিখিত The Naturalist in La plata and Idle Rambles in

Patagonia নামক প্রবন্ধটি লেখিকা 'লা-প্লাটার প্রাণীতত্ত্ববিৎ' এই নামে অনুবাদ করেছেন।

(ভারতী, আষাঢ় ১৩০৫)

বিষয় নির্বাচনে ও ভাষার স্বাচ্ছন্দ্যে এই অনুবাদগুলি সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে। কয়েকটি আশ্চর্য প্রাণীর বিবরণ আছে এতে। এদের মধ্যে পিউমার স্থান উল্লেখ-যোগ্য। নিষ্ঠুরতা ও অকারণ প্রাণীহত্যা পিউমার চরিত্র বৈশিষ্ট্য। অথচ মানুষের প্রতি দুর্বলতা ও সহানুভূতি ব্যাখ্যাতীত। বহুক্ষেত্রে অসহায় মানুষকে অন্য হিংস্র প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করে মানুষের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসার যে পরিচয় দিয়েছে তা অতুলনীয়।

স্কাংক নামে এক ক্ষুদ্রকায় জন্তু পাম্পা প্রান্তরে বাস করে। পিউমার মত দুর্দান্ত প্রাণী পর্যন্ত তাকে ভয় করে। শত্রু কাছে এলে একপ্রকার তীব্র বিষাক্ত পূতিগন্ধময় জলীয় পদার্থ আক্রমণকারীর সর্বাঙ্গে নিক্ষেপ করে। এর এমনই দাহিকা শক্তি যে শরীরের যেখানে পড়ে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বালা ধরিয়ে দেয়। আর চোখে পড়লে চোখ অন্ধ হয়ে যায়।

দক্ষিণ আমেরিকার আর একটি অদ্ভুত প্রাণী, আকারে অনেকটা উটের মত। চাঞ্চল্যে, চলনে হরিণের গতি। থাকে দলবদ্ধভাবে, কিন্তু মৃত্যুর সময় হলে দলছাড়া হয়ে দুর্গম, নির্জনে চলে যায় এবং সেখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে।

রুপিকোলা বা পার্বতীয় কুক্কুট একক নৃত্য পছন্দ করে। নাচতে নাচতে ক্রমশ উন্মাদমতা বেড়ে যায়। ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়লে আরেকটি এসে তার স্থান অধিকার করে।

একটি নদীতীরে লেখক উপস্থিত হলে সন্ধ্যার পূর্বমুহূর্তে একরকম জলচর পাখীর ঐকতান শুরু হল। ক্রমে লক্ষকণ্ঠের অবিশ্রাম, গম্ভীর, সুসংযত সঙ্গীত আকাশ বাতাস ভরে তুলল, আবার ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল।

প্রতিটি প্রাণীর বিবরণই চমকপ্রদ। বিভিন্ন লেখা থেকে লেখিকার বিশ্ব-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ ও কৌতূহল লক্ষ্যণীয়। ১৩২১ সালের 'ভারতী'তে আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের সংখ্যায় 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ' এবং Louis De Rosemount রচনার অনুবাদ 'দেশান্তরিত ফরাসী' (ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩) দুটিই সরস এবং চিত্তাকর্ষক। 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ' কাহিনীর সমাপ্তিতে করুণ সুরের মূর্ছনা মনকে বিহ্বল করে তোলে। 'দেশান্তরিত ফরাসী'তে রবিনসন ক্রুশো বইটির ছায়াপাত দেখা যায়।

গুরুগম্ভীর, সুচিন্তিত বিষয়ের অনুবাদ কয়েকটি আছে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। ১৮৩২ শকাব্দ থেকে পরপর কয়েক বছর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্ম-মূলক এবং মননশীল এই প্রবন্ধগুলি প্রিয়ম্বদার রচনা নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। ১৮৩৩ শকাব্দে 'গীতাবাণী' গীতার কিছু কিছু প্রশ্নোত্তর; ১৮৩৩ শকাব্দে 'সাধুবাক্য' বাইবেলের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন লেখকের রচনা থেকে অনূদিত হয়েছে। ১৮৩৪ শকাব্দের তত্ত্ববোধিনীতে সারা বছর ধরে প্রকাশিত 'ভক্তবাণী' বাইবেলের

বিভিন্ন অংশের অনুবাদ। ১৮৩৫ শকাব্দে Prof. G. L. Dickinson-এর অনুবাদ Euthanasia রচনার অনুবাদ করেছেন 'সুখমৃত্যু' নাম দিয়ে।

Lafecadio Hearn-এর 'Kimiko' গল্প অবলম্বনে 'রেণুকা' গল্পটির জন্ম। বিখ্যাত জাপানী গেশা রেণুকা প্রেমের যাদুস্পর্শে পাপজীবন থেকে মুক্ত হয়ে পরিব্রাজিকায় পরিণত হল তারই কাহিনী।

(মানসী, শ্রাবণ ১৩২২)

'আর আসে না' (মানসী, আশ্বিন ১৩২১) গল্পটি সম্ভবত প্রিয়ম্বদা দেবীর মৌলিক রচনা। অতি সাধারণ, মামুলি গল্প।

দুটি নাটক অনুবাদ করেছিলেন প্রিয়ম্বদা দেবী। একটি সংস্কৃত ও একটি রুশ নাটক।

'স্বপ্ন বাসবদত্তা' নাটকটি অনুবাদ করার কারণ ভূমিকায় নিবেদন করেছেন : "এই স্বল্পায়তন স্বপ্নসুন্দর নাটকখানির কাব্যরসই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। 'রম্যাণি' একা ভোগ করিলে পরিতৃপ্তি হয় না, তাই সকলের সহিত সে আনন্দ ভাগ করিয়া লইবার জন্যই নাটকখানি ভাষান্তরিত করিয়াছি।"

(মানসী, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩২৯)

'অন্তিমে' নাম দিয়ে যে রুশ নাটকটি ভাষান্তরিত করেছেন, তার বিষয় নির্বাচন প্রশংসনীয়।

(ভারতী, শ্রাবণ ১৩২০)

প্রিয়ম্বদার ভাষার স্বচ্ছন্দতায়, কাহিনীর দ্রুতগতিতে এটি শিল্পশ্রী ধারণ করেছে। এটি ভাষানুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। সুতরাং লেখিকার কৃতিত্ব অনেকখানি। আবৃত্তি সব তাঁর নিজস্ব রচনা। এগুলিও স্থানোপযোগী হয়েছে। শেষের কবিতাটি উল্লেখযোগ্য—

যাও তবে, অম্বরে চন্দ্রমা, তবু প্রান্তর আঁধার
পলাতক ক্ষিপ্র মেঘ পান করি স্বর্ণ কিরণ,
আসন্ন ঝটিকা ডাকে, তিমিরের, তরঙ্গ অপার
নিশীথের যবনিকা আবরিল তারা অগণন।

আরেকটি রচনার উল্লেখ করে প্রিয়ম্বদা দেবীর আলোচনা সমাপ্ত হবে। এটি রবীন্দ্র-পরিষদে পঠিত রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি' কাব্যের সমালোচনা। 'চৈতালি' কাব্য রচনার সময় রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যাহ্ন দীপ্তি। এই কাব্যের রসমাধুর্য, কবি-হৃদয়ের অনুভব তুলনাহীন। প্রিয়ম্বদা দেবী কাব্যটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনিও কবিশিল্পী, তাঁর মনের সূক্ষ্মতারে 'চৈতালি' কাব্যের অনুরণন সহজেই ঝংকার তুলেছে। এই সমালোচনাটি ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত। প্রিয়ম্বদা দেবীর জীবন পরিক্রমা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বহু অভিজ্ঞতায় তাঁর জীবন সমৃদ্ধ। এই সমালোচনায় যা বলেছেন, রবীন্দ্র কাব্য সম্বন্ধে সে সব কথা বহু দীর্ঘ আলোচিত। তাঁর সুচিন্তিত মতামতেই এই আলোচনার সমাপ্তি টানব।

"ভগবানের বিভূতি যেমন অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ কবিচিত্তের অনুভূতির মধ্যে আমরা তাহারি পরিচয় লাভ করি। তুচ্ছতম হইতে শ্রেষ্ঠের সহিত সহানুভব এই কাব্যখানিতে, তাই গৃহকোণে তাঁহার আশার সীমা আসিয়া পড়িলেও আবার অসীম আকাশও ছাড়াইয়া যায়; কখনো কখনো তাই বলিয়াছেন

সব পাই যদি তবু নিরবধি
আরো পেতে চায় মন,
তারে যদি পাই, তবে শুধু চাই
একখানি গৃহ-কোণ।"

উপসংহার

পূর্বের অধ্যায়গুলিতে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায় ও প্রিয়ম্বদা দেবীর জীবন বৃত্তান্ত এবং কবিত্রয়ীর সাহিত্যিক-কর্মের পূর্ণাংগ মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান কবিতার ভাবজগৎ উক্ত তিন কবির কাব্য সংস্কার থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। কবিতায় প্রসঙ্গ ও প্রকরণের এই পরিবর্তন কালধর্মেই ঘটেছে। তবু বাংলা লিরিক কবিতায় আজও যে তুচ্ছ আটপৌরে বিষয়ের সংগে রোমাণ্টিক ভাবনা-কল্পনার অনুমিশ্রণ দেখা যায়, তার পূর্বাভাস বিশ-শতকের প্রথমার্ধের কবিদের রচনাতেই সুপরিস্ফুট। আমাদের আলোচ্য তিন কবির রচনাতেও বাংলা গীতি কবিতার এই সাধারণ লক্ষণটি বহু বিচিত্র ভংগীতে ধরা পড়েছে। এখানেই উক্ত কবিত্রয়ীর সংগে বর্তমান বাংলা গীতি কবিতার অচ্ছেদ্য যোগসূত্র।

কবি রবীন্দ্রনাথ বেদের 'সহস্রশীর্ষ' পুরুষের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু তিনি যেমন মহামহীয়ান, তাঁর কাব্যের সমুন্নত মহিমা বুঝিতেও পাঠকের কিছু বুদ্ধি ঐতিহ্যবোধ ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন। কাব্য পাঠকের কাছে বিশ-শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশক পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশে দুর্বোধ্য ছায়াচ্ছন্ন ছিলেন। সাধারণ পাঠকের বুদ্ধি ও মান অনুযায়ী কাব্যরস পরিবেশনের দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আলোচ্য কবিত্রয়ী বিশিষ্ট আসন দাবী করতে পারেন। আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটি বিশেষ সময় পরিধির প্রতিনিধিরূপে এই কবিত্রয়ীর ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশ্লেষণ এই নিবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য।

একমাত্র প্রিয়ম্বদা দেবীর রচনা অনেকাংশে দীপ্তিগুণাশ্রিত; সেখানে নারী-মনের বিশেষ স্পর্শ—'The feminine touch' হয়তো নেই কিন্তু গিরীন্দ্রমোহিনী ও কামিনী রায়ের কবিপ্রতিভা একান্তভাবেই নারীহৃদয়ের সৌকুমার্য ও স্নিগ্ধতায় অভিষিক্ত। রুক্ষ, কঠোর, বন্ধুর জীবনে নারীর প্রেমপ্রীতি, বাৎসল্য যে ছায়া-শীতল স্নিগ্ধ আশ্রয় নীড় রচনা করে, আলোচ্য তিন কবির রচনাবলীর অনুসরণে সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। উক্ত কবিত্রয়ীর রচনাবলীর সমাহারে বাংলা কবিতার একটি বিশেষ মহলে যথাসাধ্য আলোক-সম্পাত করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট—১

(গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী)

(ক)

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে লিখিত পত্রখানির প্রতিলিপি

মযিমহৎরঞ্জন নক্ষমতা
কিমুত্বৎ প্রশংসাৎ হাহারতা
দোষান্‌ পরিহায় দ্রষ্টবুধা
প্রভাকরস্য মম্বুজ প্রকাশতাং
প্রেক্ষ প্রফুল্লতেচ্ছয়া সরোজ সন্নিধানে
ভ্রমন্তং তদ্রূপং ময়েচ্ছাম্‌।

(আমি মহত্ত্বের মহত্ত্ব রাখিতে অক্ষম কিন্তু সাধুকে প্রশংসা করিতে তবু রত হইয়াছি। যাহা হউক দোষ পরিত্যাগ করিয়া দেখুন পণ্ডিত। সূর্য্যের কমল প্রকাশ শক্তি দেখিয়া খদ্যোৎ সূর্যের প্রকাশ ইচ্ছাতে পদ্মের নিকটে ভ্রমণ করিতেছে সেইরূপ সাধুর গুণব্যাখ্যা করিতে আমি ইচ্ছা করিতেছি)।

গুণিগণানুগণ্য বদান্যাদি গুণসম্পন্ন হিতকর বান্ধববর শ্রীযুক্তবাবু মহেন্দ্রলাল সরকার এম ডি মহানুভবকে এই সামান্য পত্রিকাখানি উপহার প্রদান করিলাম। মহাশয় অনুকম্পা পুরঃসর দৃষ্টি করিলে বাধিত হই।

মহোদয়েষু :—

মহাশয় একান্ত বাসনা হইয়াছে আপনার কিঞ্চিৎ গুণকীর্ত্তন করি। কিন্তু সহসা সাহস হইতেছে না। ঊর্ণনাভের কড়ি আশ্রয়ের ন্যায় করিতেছি। যাহা হউক মহাশয় যদিও এ সামান্যাবলার অক্ষমতাজনিত ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি সাধারণের হস্তে করিবার যোগ্য হয় নাই; তথাচ, মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিলে বাধিত হই। মহাশয়, সেদিন মুমূর্ষুপ্রায় শিশুর জীবনদান করিয়া যে মহোপকার করিয়াছেন, তাহা জীবিতাবোধি কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না মহাশয়ের নিকট যাবৎজীবন কৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ রহিলাম। আপনি যদ্রূপ উপকার করিয়াছেন তাহার শতাংশের একাংশও এ সামান্যা নারী পরিশোধ করিতে পারিবে না, যদি সমুদ্র মস্যাধার, মন্দার মেরুলেখনী ও চতুর্মুখ লেখক হইতেন তাহা হইলে মহাশয় যে কতদূর স্নেহ ও উপকার করেন তাহা বর্ণন হইত কিনা সন্দেহ এবং ভবদীয়োপকারোযোগ্য এমৎ কোন দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হইল না যে মহাশয়কে অর্পণ করিয়া চিহ্নপ্রকাশ ও আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করি এবং আপাতমনোরম্য লোচনানন্দদায়ক দ্রব্য আপনাকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিনা কারণ, মহাশয়ের যোগ্য নহে, এই সামান্যা স্ত্রী ইহা বিবেচনা করিয়া এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি

প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছি। হে গুণিসত্তম! হায় এই সামান্য পত্রিকা যে আপনার সন্তোষসাধন করিবে এই দুরাশা মদীয় ধর্মপিপাসিত হৃদয়কে মরুভূমে মরীচিকা ন্যায় হইয়া প্রতারিত করিয়াছে বোধ হয় অচিরাৎ হতাশা হইব। মহাশয়, আপনি বাঙ্গালী গৃহে অবতীর্ণ হওয়াতে আমাদের যে কতদূর মুখোজ্জ্বল হইয়াছে বলিতে পারি না। আপনার ন্যায় দয়া ও ধর্ম্মপরবশ লোক আমাদের বঙ্গভূমিতে অত্যল্পমাত্র। মহাশয় যে বিজ্ঞানসভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহাতে যে দেশের কতই মঙ্গলসাধন করিবেন বলিতে পারি না। অবৈতনিক চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া প্রতিদিন যে কতশত দীন আতুরের জীবনদান করিতেছেন তাহা বর্ণনাতীত মাত্র। সর্বাপেক্ষা দয়ার পাত্রের মধ্যে পাপী মূর্খ আতুর অনাথ ইহারাই অধিক কৃপার্হ। পাপীকে ধর্মোপদেশ দান মূর্খকে বিদ্যাদান, পঙ্গুকে ঔষধ দান করিতেছেন, ইহাপেক্ষা মহত্ত্ব আর কি হইতে পারে? হায় আমাদের দেশে যদি সকলেই আপনার ন্যায় দয়ার্দ্রচিত্ত হইত তাহা হইলে আমাদের সুখবর্ত্তি ত্বরায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভারতভূমির দুর্নীতান্ধকার দূরিত হইত। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি ধর্ম্মপরবশ হইয়া ভারতমাতাকে অচিরাৎ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত করুন। মহাশয় বলিয়া থাকেন 'শিশুটির উপর আমার অধিকার আছে' তাহা আমি অবশ্য স্বীকার করি। শিশুটিকে আপনাকেই সমর্পণ করা হইয়াছে, মহাশয় উহাকে যেরূপ স্নেহ করেন, ভরসা করি তাহা কখনই বিচলিত হইবে না।

(খ)

দেবেন্দ্রনাথ কবি ভগিনী গিরীন্দ্রমোহিনীকে লক্ষ্য করে লিখেছিলেন,—

চিনেছি, চিনাতে আর হবে না তোমায়।
বঙ্গের বিধবা তুমি আজন্ম দুঃখিনী।
শ্মশান হইতে আনি একমুষ্টি চিতানল,
জ্বালিয়া রেখেছ বক্ষে দিবস যামিনী!
চিনিয়াছি, চিতানল পার্শ্বে দাঁড়ায়ে কৌতুকে
পবিত্র সে চিতা-রজঃ আগ্রহে দুভুজে ধরি,
মাখিলে আননে বক্ষে চরণে অনেক।

* * * *

চিনিয়াছি; খ্যাতি তব বিশ্ব চরাচরে।
শ্মশান মন্দির-তটে তরঙ্গিণী তীরে;
রূপকান্তি, সুখশান্তি, বিচিত্র নৈবেদ্যরাশি,
ভক্তিভাবে বিসর্জিলে জাহ্নবীর নীরে।

চিনিয়াছি, তবে মোর কেন এ ক্রন্দন?
হে ভগিনী এই দেখ মুছিনু নয়ন।

স্বামীর আছিলে আগে, হে সুন্দরি, এবে তুমি
বিপুল বঙ্গবাসীর আপনজন।
চিনিয়াছি ; তাই বনতুলসীর মালা
আনিয়াছি তব তরে, দেবতপস্বিনি
তোমার শ্রীকণ্ঠে উঠি আমার এ বনমালা,
ধরিবে অপূর্ব শোভা, হে কবি ভগিনী।

সাহিত্যে তস্করতা

নববিভাকর সাধারণী

২৯-এ কার্তিক, ১২৯৪

অক্ষয় চন্দ্র সরকার সম্পাদিত

যে বীচেতেই চাষ হউক না ভালরূপে ফসল জন্মাইলেই ভাল। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তৃণঘাস অনেক জন্মিয়াছে কিন্তু তাহাতে বেশী অনিষ্ট বড় করিতে পারিবে না—উপড়াইয়া ফেলিয়া দিলেই হইবে। এক-আধটা কীটও ঢুকিতেছে, এখন হইতে সাবধান হইলে আর বড় একটা ঢুকিতে পারিবে না। এই সকল উৎপাত ছাড়া আবার তস্করের উপদ্রব আছে। এত আপদ-বিপদ কাটাইয়া তবে চাষীকে ফসল রক্ষা করিতে হয়। স্ত্রীলোক চাষীর পক্ষে এই সকল বিপদ কাটাইয়া উঠা দুষ্কর কার্য্য।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত বংশের কুলবধূ—বঙ্গবিধবা, সুতরাং তিনি কুলদেবী। ভগবান ও পতিধ্যানেই বঙ্গবিধবা মনের শান্তিপ্রাপ্ত হয়। গিরীন্দ্রমোহিনীর ভগবান ও পতিধ্যান ত আছেই, আবার মাঝে মাঝে বাক্‌দেবীর আরাধনা করিয়াও অনেক শান্তিলাভ করেন। বাল্যকাল হইতে তাহার কবিতা লেখার অভ্যাস। বঙ্গ কুলবধূর পুস্তক প্রকাশ সহজ কথা নহে। তিনি বহুত কবিতা লিখিয়াও সে সকল প্রকাশ করিতে পারেন নাই—অনেক বিঘ্ন বিপত্তি কাটাইয়া দুই-একখানি কবিতা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি 'অশ্রুকণা' নামে একখানি তাহার পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে।

গিরীন্দ্রমোহিনী কতকগুলি কবিতা লিখিয়া তাঁহার হস্তলিখিত পুস্তকখানি অক্ষয় চন্দ্র বড়ালের হস্তে প্রদান করেন। অক্ষয়বাবু একজন কবি—কেবল কবি নহেন অল্প বয়স হইলেও সুকবি—একজন বঙ্গের উদীয়মান কবি। তাহার উপর আমরা অনেক আশা-ভরসা করি। অক্ষয়বাবুও সম্প্রতি "ভুল" নামে একখানি কবিতা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি গিরীন্দ্রমোহিনীর হস্তলিখিত পুস্তকের কতকগুলি কবিতা বাদ দিয়ে 'অশ্রুকণা' নামক গিরীন্দ্রমোহিনীর নূতন পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। হস্তলিখিত পুস্তকের সকল কবিতাই অশ্রুকণায় প্রকাশ হয় নাই।

অক্ষয়বাবু সেইগুলিতে একটি করিয়া শূন্য দাগ রাখিয়াছেন। হস্তলিখিত পুস্তকে "ছায়া' নামক কবিতাটি যেরূপ আছে সেরূপই প্রকাশ করিলাম।

আঁধার ঘরে কে তুইরে
প্রেতের মত দিবানিশি
লুকোচুরি উঁকি ঝুঁকি
নিয়ত নিয়ত আসি ;
অকালে কে গেছিস মরে !
মনের আশা থাকতে মনে
সাহস হারা বিরশ পারা
কেন বেড়াশ কোণে কোণে
ভাঙ্গা চোরা আঁধার ঘরে
কেনরে তোর কিসের মায়া
প্রাণ হারা, স্মৃতি ভরা
কায়া ছাড়া কায়ার ছায়া।

গিরীন্দ্রমোহিনীর হস্তলিখিত পুস্তকে আর অক্ষয়বাবুর 'ভুল' নামক ছাপান যে পুস্তকখানি গিরীন্দ্রমোহিনীকে দান করিয়াছেন সেই দুই পুস্তক হইতে এই দুইটি কবিতা আমরা উদ্ধৃত করিলাম। দুই-চারি কথা ছাড়া দুই কবিতাই এক। বঙ্গবিধবা গিরীন্দ্রমোহিনী তাঁহার সাধের সম্বল হইতে যৎকিঞ্চিৎ লইয়া ভুলিয়া কি "ভুলে" পুরিয়াছেন? না বালকে যেরূপ বাল-চাপল্যবশত লোভ সামলাইতে না পারিয়া চাষীর ক্ষেত্র হইতে শশাটা, কড়াইশুঁটিটা ছিঁড়িয়া লয়েন সেইরূপ অক্ষয়-বাবু বিধবার সামান্য সম্বলটুকুতেও লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না ?

অক্ষয়বাবুর 'ভুল' নামক পুস্তকে ছায়া বলিয়া এই কবিতা আছে।

ছায়া

আঁধার ঘরে আঁধার ক'রে
প্রেতের মতন দিবানিশি,
কে তুই আসিস, কে তুই শ্বাসিস
সঙ্গে আমার রইতে মিশি ?
অকালে কি গেছিস ম'রে
মনের আশা থাকতে মনে ?
সাহস হারা বিরস পারা
উঁকি ঝুঁকি কোণে কোণে !
ভাঙ্গা চোরা হানা ঘরে
কেনরে তোর কিসের মায়া ?
প্রাণে মরা স্মৃতি ভরা
কায়া ছাড়া কায়ার ছায়া।

প্রতিবাদ

নববিভাকর সাধারণী
৬ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৪

(লেখকের অনুরোধক্রমে এই প্রতিবাদ 'যথা লিখিত তথা স্থাপিত' ভাবে ছাপা গেল। আমাদের কথা পরে বলিব।)

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী
ও
অক্ষয় কুমার বড়াল

গত সংখ্যায় নববিভাকর সাধারণীতে দেখিলাম 'ছায়া' নামক কবিতা ধরিয়া আমার উপর তস্করাপবাদ দেওয়া হইয়াছে। আমাকে আসামী শ্রেণীতে দাঁড় করান হইয়াছে। এ প্রবন্ধের চাকচিক্যে অনেকে ভুলিবে, "অশ্রুকণা" যথেষ্ট কাটিবে। কিন্তু কে এই প্রবন্ধ লেখক, আমি জানিনা। যিনিই হউন, দেখিতেছি, তিনি আমা অপেক্ষা গিরীন্দ্রমোহিনীকে কম জানেন।

গিরীন্দ্রমোহিনীর অনেকগুলি কবিতা আমার হাতে পড়ে বটে এবং সেই কবিতাগুলিই আমা কর্তৃক নির্বাচিত ও সংশোধিত হইয়া 'অশ্রুকণা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। 'অশ্রুকণা' নাম, তাহাও আমি দিয়াছি।

গিরীন্দ্রমোহিনী স্বয়ং এবং তাঁহার দেবর আমার প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত গিরীন্দ্রমোহিনীর কিছু পূর্ব্বে প্রকাশিত কবিতা পুস্তক 'ভারত কুসুম' আদৌ বিক্রয় হয় না দেখিয়া আর কবিতা পুস্তক প্রকাশ করিতে নিতান্ত নারাজ ছিলেন। "অশ্রুকণা' প্রকাশিত হইয়াছে, আমার অনুরোধে—আমার ভরসায়। আমিই পিপেলস লাইব্রেরীর সহিত ছাপাই খরচের সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করিয়া দি।

১২৯৩ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'কল্পনা'য় গিরীন্দ্রমোহিনীর যে 'ছাই' প্রকাশিত হয়, তাহা রবীন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক সংশোধিত। এবং কার্ত্তিক মাসের শেষাশেষি 'কল্পনা'র ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাদ্বয়ে একটি কবিতা প্রকাশ করিবার জন্য গিরীন্দ্রমোহিনী তাঁহার একখানা কবিতা আমাকে দেন। আমি 'মরীচিকা' নির্ব্বাচন ও সংশোধন করিয়া দি। প্রবন্ধ লেখক খাতাখানায় আমার হাতের লেখা ও যথেষ্ট কাটাকুটি দেখিতে পাইবেন।

সেই সংশোধন দেখিয়া এবং আমা কর্ত্তৃক উৎসাহ পাইয়াই গিরীন্দ্রমোহিনী আমাকে পুস্তক সম্পাদনের ভার দেন এবং গোবিন্দবাবু বারম্বার বলেন "দেখো, গিরীন্দ্রমোহিনীর যে কোন লেখাতে রবিবাবু এবং তোমার (অর্থাৎ আমার) ছায়া দেখিবে; সেগুলো যেন বাদ দেওয়া হয়" এবং গিরীন্দ্রমোহিনীও আমাকে পত্রে লেখেন, "প্রেম সম্বন্ধে অনেক লেখা আছে তার মধ্যে যদি কিছু বাইরে রাখা হয়,

খুব ভালো করে বিবেচনা করে রাখবেন যেন লোকে স্ত্রীলোকের লেখা বলে দোষ না ধরে।"

গিরীন্দ্রমোহিনী পুস্তকখানির নাম দিয়াছিলেন 'প্রেমাঞ্জলি'। পাছে লোকে মনে করে আমার কনকাঞ্জলির অনুকরণ সেইজন্য নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া দি। প্রবন্ধ লেখক দেখিবেন, ভারতীতে প্রকাশিত গিরীন্দ্রমোহিনীর কয়েকটা কবিতারও স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছি এবং কয়েকটা পরিত্যাগও করিয়াছি।

এই ত গেলো একদিকের কথা। আমার 'ভুলে' দুই ধরনের কবিতা আছে। ১ম কবিতাটি বড় হউক বা মাঝারি হউক, সমস্তটার ধরণই আসিবে। অর্থাৎ যে ধরণে সকলেই কবিতা লেখে, সে ধরণে গিরীন্দ্রমোহিনী 'অশ্রুকণা লিখিয়াছেন, আমি 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি' লিখিয়াছি। ২য় কবিতাটা ছোট হইবে, শেষের দুই এক ছত্রে বা শেষ ছত্রের দুই-একটা কথায় কবিত্বটুকু থাকিবে। জার্ম্মান কবি গোটের গুটিকয় এবং হায়নে (Heine) অনেকগুলি কবিতা এই শেষোক্ত ধরণের। আমি "ভুলে" এই ধারার অনুকরণ করিয়াছি। বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যে এই ধরণের কবিতা আমিই প্রথম লিখিয়াছি, 'ভুলেই' তাহার প্রথম প্রকাশ। 'ছায়া'ও এই ধরণের।

সকলেই জানেন, গিরীন্দ্রমোহিনী বাঙ্গালা ভিন্ন কোনও ভাষা জানেন না। তবে তিনি এ ধরণটি পাইলেন কোথায়? তবে কি গিরীন্দ্রমোহিনী গ্যেটে বা হায়নের মত একজন প্রতিভাশালী। প্রবন্ধ লেখক "ছায়া"র সহিত "ভুলে" প্রকাশিত আমার অন্যান্য কবিতা মিলাইয়া দেখিবেন "ছায়া" কাহার? কিম্বা গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রকাশিত কোনও কবিতা পুস্তক হইতে এই ধরণের একটি কবিতা বাহির করিবেন!

ভুলের এই ধরণের কবিতাগুলো লিখিত হইয়াছে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। "ছায়া" ফেব্রুয়ারী মাসের লেখা। বিশ্বাস হয় কি!

গোবিন্দবাবু যেদিন কল্পনা সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার সহিত আলাপ করাইয়া দিতে আসেন, তাহাদের দুইজনকে আমার এই ধরণের কবিতাগুলি শুনাই। হরিদাসবাবু বলেন, এ ধরণের কবিতা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইতে পারে না। এবং হরিদাসবাবু খুঁজিয়া খুঁজিয়া বড় গোছের দুটি কবিতা বাহির করেন, তাহাও সে ধরণের নহে। 'বৃন্দাবনে' ও 'মথুরায়'। 'বৃন্দাবনে', ৯২ সালের মাস মনে নাই, ভারতীতে এবং 'মথুরায়' কল্পনার ঐ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়।

আরও গোবিন্দবাবুর বাড়ীতে এই কবিতাগুলি মধ্যে মধ্যে পড়া হইয়াছে এবং রবীন্দ্রবাবু প্রভৃতি আমার অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবকে পড়িয়া শুনান হইয়াছে এবং এই ধরণ লইয়া অনেক কথাবার্ত্তাও চলিয়াছিল। 'অশ্রুকণা'র কবিতা আমার হাতে আসিবার অনেক পূর্ব্বে 'ভুল' লিখিত হইয়াছে; অনেকে জানেন। গিরীন্দ্রমোহিনী

নিজেও জানেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভুল" ছাপা হইলে অশ্রুকণা ছাপাইবেন। আমি স্বীকৃত হই নাই, তখন আমার অর্থের বিশেষ টানাটানি পড়িয়াছিল।

তারপর ৯৩ সালের বর্ষাকাল (মাস মনে নাই) গিরীন্দ্রমোহিনীকে আমার খাতা দেখিতে দিয়াছিলাম। কোনগুলো ভালো দাগ দিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। সে খাতা এখানে আছে, তাহার দাগ ও হাতের লেখা এখানে আছে, "ছায়া" এখনো আছে। এখন মানো আর নাই মানো।

আর একদিনের কথা। আমি গোবিন্দবাবুর বাড়ীতে গোবিন্দবাবুর ভাগ্নে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর নিকট দুপুর বেলায় বসিয়াছিলাম; গিরীন্দ্রমোহিনী আমাদের কাছে তাহার একখানা খাতা পাঠাইয়া দেন। (গিরীন্দ্রমোহিনীর ১০।১৫ খানা খাতা) তাহাতে গিরীন্দ্রমোহিনীর 'ছায়া' ছিল। এ কি সেই ছায়া? মনে আছে সেই ছায়া পড়িয়া আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিয়াছিলাম। সে "ছায়া" তো আমার ছায়াকে বক্ষে করিয়া ছায়ার ভাব—একটা লোকে মন্দ অভিপ্রায়ে দিনরাত্রি কবিকে উঁকিঝুঁকি মারে। তাহার শেষছত্র (আমার ধরণকে গমন রহস্য করা উচিত)। এখনো মনে পড়িতেছে—'রাম রাম রাম'—ছাড় ছাড় ছাড়—গয়ায় যাব পিণ্ডি দিতে।" সেই খাতায় রবিবাবুর "কে" কবিতার রহস্যের উত্তর আছে—"সে" বলিল। আরো অন্যান্য রহস্য আছে, তাহার দুই-একটি ভারতীতে দেখিয়াছিলাম। আরো মনে পড়ে, আমার "যাই-যাও", "অলস জোছনাময়ী নিথর যামিনী", "বৃন্দাবনে" প্রভৃতির অনুকরণে তাঁহার অনেকগুলি কবিতা আছে। অনুকরণের কবিতাগুলি 'অশ্রুকণা'য় স্থান দি নাই গোবিন্দবাবুর কথায়, রহস্য কবিতা দি নাই গিরীন্দ্রমোহিনীর কথায়। কিন্তু নববিভাকর সাধারণীতে প্রকাশিত গিরীন্দ্রমোহিনীর, এই "ছায়া" আমি এ জন্মে দেখি নাই। দৈবচক্ষু কোথায় পাইব?

আমারো সুপরিচিত অর্ধপরিচিত অনেকগুলি বন্ধুবান্ধব তাহাদের কপি দেখান; কেউ বা পাঠান, কেহ কেহ সংশোধন করিতেও দেন। দু'একজন কবিবন্ধু স্ত্রীলোকও আছেন। কই এ পর্য্যন্ত এমন কথা তো কেউ তুলে নি। আজ এ ঢাক-ঢোল কেন? মান আর নাই মান গিরীন্দ্রমোহিনীকে মানুষ করিয়া দিয়াছে কে?

প্রবন্ধ লেখককে বলি, হাঁড়ি ভাঙ্গে ভাঙ্গে হইয়াছে। এখনো কি আবার "পাশা খেলে পাকা গুটি কাঁচাবে?"

কলিকাতা
২রা অগ্রহায়ণ

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল

নববিভাকর সাধারণী
১৩ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৪

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী

ও

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল

প্রতিবাদ

নববিভাকর সম্পাদক দেখাইয়া দিয়াছেন অক্ষয়কুমার বড়াল লোভপ্রযুক্ত কোন বঙ্গবিধবার সঞ্চিত সম্বল হইতে কিঞ্চিৎ সরাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। অক্ষয়বাবু বলেন, "এমন কাজ আমা হইতে হয় নাই—কারণ আমি একজন মস্ত কবি। আমি গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতা সংশোধন করিয়াছি এবং তাঁহার বই ছাপিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছি।" সংশোধন করিয়া কি মহৎ উপকারটা করিয়াছেন তাহা ভবিষ্যতে পাঠকদের বিচারাধীন করিবার ইচ্ছা রহিল—ছাপার কতদূর সুবিধা করিয়াছেন তাহাও বিবেচ্য—কিন্তু তৎসত্ত্বেও চুরী অপবাদ দূর হইবার নহে। তাহার প্রধান কারণ ঘটনাটি সত্য। পাঠকেরা সম্পাদক মহাশয়ের মুখে যথাস্থানে ইহার প্রমাণ পাইবেন—বিচারের স্থলে আমরা নিজের মুখের কথা সাধারণকে বিশ্বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারি না। আমার ভ্রাতৃজায়া ঠাকুরাণীর স্বহস্ত লিখিত খাতা এবং তাহাতে অক্ষয়বাবুর সংশোধন এখনও আছে—সম্পাদক মহাশয়ের হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়াছি—এবং তাহার বিচারের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। অক্ষয়বাবু বলিয়াছেন—যে খাতায় তিনি 'ছায়া' কবিতা লিখিয়াছেন সে খাতায় গিরীন্দ্রমোহিনীর হস্তাক্ষর আছে এবং সে খাতাও এখানে তাহার কাছে আছে। যদি থাকে ত তিনি সেই খাতা সম্পাদক মহাশয়কে দেখাইবেন এই আমাদের অনুরোধ। কারণ আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এ খাতা তাহার নিকট নাই এবং কোনকালে ছিল না। যে খাতায় গিরীন্দ্রমোহিনী দাগ দিয়াছিলেন সে অন্য খাতা।

হাইনে এবং গ্যেটের ন্যায় অসাধারণ প্রতিভা অক্ষয়বাবুর আছে কিন্তু সকলের নাই একথা মানিলেও, ছোট কবিতা লেখা হাইনে, গ্যেটে এবং অক্ষয় বড়াল ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে অসম্ভব ইহা আমরা মানিতে পারি না। বিশেষতঃ 'ছায়া' নামক ক্ষুদ্র কবিতাটি বড়ালবাবু এবং উক্ত জর্ম্মাণ কবিদ্বয় ছাড়া আর কেহই লিখিতে পারেন না এমন কথা প্রমাণ করিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন—'আমারো' সুপরিচিত, অর্দ্ধ পরিচিত অনেকগুলি বন্ধুবান্ধব তাহাদের কপি দেখান, কেউ বা পাঠান, কেহ কেহ সংশোধন করিতেও দেন। দু'একজন কবিবন্ধু স্ত্রীলোকও আছেন। কই এ পর্য্যন্ত এমন কথা কেউ তুলে নি, আজ এ ঢাক-ঢোল কেন? এ সম্বন্ধে দু'টি কথা বক্তব্য আছে। স্ত্রী কবি আমাদের দেশে অল্পই আছেন—তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত কুলবধূ। অক্ষয়-

বাবুর সঙ্গে তাহাদের বন্ধুত্ব থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়—লোকে যখন প্রথম চুরি করে তখন পূর্ব্বে চুরি করে নাই বলিয়া যে ঢাক-ঢোল বাজিবে না এরূপ প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা। অক্ষয়বাবুর সুপরিচিত এবং অর্দ্ধ-পরিচিত বন্ধুগণ এখন হইতে সাবধান হইবেন। আমরাও এককালে অক্ষয়বাবুর সুপরিচিত বন্ধু ছিলাম কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ঢাক-ঢোল বাজাইবার কোন অবসর উপস্থিত হয় নাই—এমন ঘটনাসূত্রে ধর্ম্মের ঢাক আপনিই বাজিয়া উঠিয়াছে।

সমালোচকেরা বলেন, গিরীন্দ্রমোহিনী স্বাভাবিক প্রতিভাশালিনী। অক্ষয়বাবু তাঁহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন এরূপ দাম্ভিকতা অক্ষয়বাবুর মুখেই শোভা পায়। কিন্তু চুরি না করিয়া যদি অহঙ্কার করিতেন তবে মানব-স্বভাব সুলভ দুর্ব্বলতা করা মার্জ্জনা করা যাইত কিন্তু এখন ইহার মার্জ্জনা নাই।

কবিবর তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহারে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য ভাবে "হাঁড়ি ভাঙ্গা" এবং "পাকাগুটী কাচানর" উল্লেখ করিয়া গভীর রহস্যপূর্ণ কাল্পনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু হাঁড়ি কোথায়, কাহার হাঁড়ি, কে ভাঙ্গে এবং সম্প্রতি যে হাঁড়িটি ভাঙ্গিয়াছে ও তাহার মধ্য হইতে কাহার চোরামাল বাহির হইয়াছে ইহার বিচার কে করিবে? যাহা হউক এরূপ নিগূঢ় অর্থ অথবা অনর্থপূর্ণ রূপক চোরবাগান বিহারী কবির পক্ষে খেলা উপদ্রব। আমরা অ-কবিবর্গ, সাদা কথা বুঝিতে পারি এবং সাদা উত্তর দিতেও পারি।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত

বড়াল কবিমহাশয় নিজের সাফাই জন্য অনেক বকিয়াছেন—তবে আলাত-পালাতই বেশী। গোবিন্দবাবুর এজেহারেও তিনি 'ছায়া' অপহরণ করিয়াছেন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে! আরও অনেক সাফাই-এ সাক্ষীর নাম করিয়াছেন। কিন্তু 'ছায়া' নামক কবিতাটি তিনি কাহার নিকট পাঠ করিয়াছেন খুলিয়া বলেন নাই—অন্য কবিতা পড়া হইয়াছে বলিয়াছেন। আলাত-পালাতের মধ্যে এক-আধটা কথা কেমন কেমন বলিয়া বোধহয়। বড়াল মহাশয় বলেন যে, শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনীর 'ছাই' নামক কবিতাটি রবীন্দ্রবাবু কর্তৃক সংশোধিত হইয়া "কল্পনা"য় প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমরা অন্যরূপ সমাচার পাইয়াছি। রবীন্দ্রবাবু সংশোধন করেন নাই কতকটা বাদ দিয়া প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন।

বড়াল মহাশয়কে গিরীন্দ্রমোহিনী পুস্তক ছাপাইবার ভার দিয়াছিলেন সে কথার তো কোন গণ্ডগোল নাই। তবে ভার লইয়া তছরূপ করাটা না দোষ হইয়াছে। বড়াল মহাশয় দুটা প্রেতযোনীকে সাথি করিয়া আসরে নামিয়াছেন। সেকালের ওঝাদের প্রেতযোনি পোষা থাকিত। ওঝাগণ তাহাদের নিকট হইতে অনেক সাহায্য লাভ করিত। কিন্তু আপ্তসার না থাকিলে মহা বিপদে পড়িতে হইত। বড়াল মহাশয় দুইটি মামদো প্রেতযোনি পাইয়া আপ্তসার করিয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাই তাহার আজ এত নিগ্রহ ভোগ করিতে হইতেছে।

কবি মাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে নিজ জীবনের ঘটনা কবিতা মধ্যে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। গিরীন্দ্রমোহিনী বঙ্গবিধবা—কবিতা-মধ্যে তাহার অন্তরের মর্ম্ম থাকিবারই কথা। গিরীন্দ্রমোহিনীর "ছায়া" নামক কবিতাটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

আঁধার ঘরে কে তুই রে
প্রেতের মত দিবানিশি
লুকোচুরী উঁকি ঝুঁকি
নিয়ত নিয়ত আসি ;
অকালে কে গেছিস মরে !
মনের আশা থাকতে মনে
সাহস হারা বিবশ পারা
কেন বেড়াস কোণে কোণে
ভাঙ্গাচোরা আঁধার ঘরে
কেন রে তোর কিসের মায়া
প্রাণহারা স্মৃতিভরা
কায়া ছাড়া কায়ার ছায়া।

বঙ্গবিধবার পতির ছায়া এই কবিতাটির প্রতি ছত্রে প্রতি কথায় জড়াইয়া রহিয়াছে কিনা পাঠকগণ দেখিবেন। আর বড়াল মহাশয় "আঁধার ঘরে আঁধার করে" মহা আঁধার করে চোখে ধাঁধা লাগাইবার চেষ্টা কেমন করিয়াছেন ও দেখিবেন। অক্ষয়বাবুর ঘসা-মাজা 'ছায়ায়" গিরীন্দ্রমোহিনীর "ছায়ার" স্বাভাবিক ভাব বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

বড়াল মহাশয় নিজের কথাতেই ধরা দিয়াছেন। তিনি সাফাই পত্রে বলিয়াছেন যে গিরীন্দ্রমোহিনী একখানা খাতা পাঠাইয়া দেন তাঁহাতে "ছায়া" নামক কবিতার "রাম, রাম, রাম, ছাড়, ছাড়, ছাড়, গয়ায় যাব পিণ্ডি দিতে" এই সকল কথা লেখা আছে। বড়াল মহাশয় এই খাতার ছায়া নামক কবিতাটিতেই আপনার হস্তাক্ষরে সংশোধন করা আছে না? বড়াল মহাশয়ের হস্তাক্ষরের সংশোধন করা খাতাখানাই আমাদের নিকট এখনও রহিয়াছে? ইচ্ছা হয়ত একবার দেখিয়া যাইবেন।

বড়াল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে "মান আর নাই মান, গিরীন্দ্রমোহিনীকে মানুষ করিয়া দিয়াছে কে?" কথাটার ভাব এই যে বড়াল মহাশয় তাঁহাকে মানুষ করিয়াছেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম পুস্তক "কবিতাহার"। ১২৮০ সালের বঙ্গদর্শনে সেই কবিতাহারের সমালোচনা প্রকাশ হয় তখন বড়াল মহাশয়ের বয়স আট-দশ বৎসর হইবে। এই গিরীন্দ্রমোহিনীকে বড়াল মানুষ করিয়াছেন।

মহাজন লোকে পরের ধন ঘরে রাখিলেও নিজের বলে পরিচয় দেয় না। হেমবাবু রবীন্দ্রবাবু পরের ধন নিজের বলিয়া পরিচয় দেন নাই। বড়াল

মহাশয় Victor Hugo, Tom Moore প্রভৃতির কবিতা নিজের বলিয়া পাচার করিতেছেন। একদিন তাহা আমরা দেখাইয়া দিব।

"বিদ্যাটা মন্দ নয় তবে বলে না—
বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।"

মহাযাত্রী

(স্বর্গীয় হেমচন্দ্র মিত্র
জন্ম ১০ই শ্রাবণ ১২৭২, মৃত্যু ২৪শে ১৩৩০

সন্ধ্যা কি হ'ল ঘাটেতে তোমার
থাকিতে থাকিতে বেলা—
প্রান্তর হ'তে আসিলে ছুটিয়া
সহসা ভাঙ্গিয়া খেলা !
তুলিয়া লহরী, আসে খেয়াতরী,
বহিয়া বরণডালা ;
রাশি রাশি শুভ্র কুসুমের স্রজ,
—ও কাহার রচিত মালা ?
প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালে সাজিয়ে
হাসিয়া মুক্তির হাস ;
লুকানো কোথাও নাহি অশ্রুকণা,—
বাসনা-কুহেলি-রাশ ?
থাকে যদি কিছু যাও ঝেড়ে ফেলে
মরতের মাটী ধূলি ;
অমর নিকুঞ্জে মোহন বাঁশরী
বাজিছে আহ্বান তুলি।
বিশ্বরাজের দরবার হ'তে
এসেছে সাদর ডাক ;
ওরে দিও না বিদায় নয়নের নীরে,—
গম্ভীরে বাজাও শাঁখ !
সুযশের ছত্র তুলে ধর শিরে,
ছোট-বড় মিলে সাজি ;
ছড়াও দু'হাতে গমনের পথে
প্রস্ফুট মল্লিকা রাজি।

এস কীর্ত্তনীয়া, মরণ জিনিয়া,
তনু-ত্যাগে দাও নাম ;
অন্তে গঙ্গা-নারায়ণ, বল ব্রহ্ম বল রাম,
আজি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বীর ত্যজে ধরাধাম।
বলহ শ্রীহরি, স্মরহ শ্রীহরি

বিজয়কৃষ্ণ কর্ণধার
লইয়া তরণী শ্রীগুরু আপনি
নিতে পারে, পারাবার।
এস তবে এস পশ্চাতে ফিরি
চেওনা কাহারো পানে ;
সাগর সঙ্গমে ছুটে চল নদী
তুলে মিলন-মঙ্গল গানে !
ওগো ! বিশ্বরাজের আসন হইতে
এসেছে সাদর ডাক,
ওরে দিও না বিদায় নয়নের জলে
বাজাও গম্ভীরে শাঁখ !
তোমারি হৃদয় তব পুরস্কার
মর্ত্ত্য ভুবন তলে ;
এস তবে এস, লহ আশীর্ব্বাদ,
এস পরম বৈষ্ণব-মরণ উৎসব
দেয় জয়মাল্য আজি গলে।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

পরিশিষ্ট—২

(কামিনী রায়)

সাহিত্য, আষাঢ়, ১২৯৮

যমুনা

ধীরে ঊষাকর ধরি, নামিল সুন্দরী
নীল কালিন্দির নীরে, আকণ্ঠ ডুবিয়া,
বিশ্বের পিরীতি নিল অঞ্জলিতে পূরি,
অমৃত করিল পান অবাক্ হইয়া।
সহসা আঁখির জাল গেল তার সরি,
হেরিল সে সবিস্ময়ে, বাজিছে বাঁশরি,
যমুনা উজান বহে আবেশে শিহরি
শ্যাম জলে ভেসে গেল গোপিনী গাগরি।
"কোথায় গাগরি !" বলি চারু চন্দ্রাবলী
করে রঙ্গ, ব্যঙ্গ করে দিয়ে করতালি
রাধা পদ্ম করে লয়ে, রাধার সহেলি
সাজায় শ্যামেরে, হর্ষে হাসে বনমালী !
হে সুন্দরি ওকি ওই যমুনা বহিছে ?
তোমারি কবিতা ওযে গাহিয়া চলেছে ?

দেবেন্দ্রনাথ সেন

The Dawn of a New Poetry in Bengali Literature.

Miss Sen the young lady graduate of the Bethune College, has favoured the public with a collection of poems under the title of "আলো ও ছায়া" (Light and shadow), which is destined to make an epoch in the history of Bengali poetry. The pretty little volume has been published anonymously, but the name of the author has oozed out and there is no good now to make a secret of it. The collection has made an impression in private circles, in the circles of poets and scholars and of graduates and students. The great Bengali Poet, Babu Hemchandra Banerji, has written a preface to it in which, with

a candour and magnanimity, he confesses that he feels jealous of the rising poet.

The characteristic of Miss Sen's poetiy is the purity of her tastes, the elegance of her style, the extreme delicacy and fineness of her feelings, and the depth of her thoughts. Her verses are simple and run easily, and they have a charm which at once captivates. It is not however in the style but in the tone and spirit of her wriiings that she excels. Miss sen's love is of a higher order. It is a passion with her, but it is tempered with the loftiest conceptions of duty and conscience. It has a mournfnl weirdness that haunts the memory long after the words of it have been forgotten. It enters your soul, refines your coarse nature, and elevates you. All the forms and ideas which had pleased her predecessors are found in her, but purified, deepened, modulated, set in simple and pregnant style. She is not as pathetic and sublime as Rabindra Nath Tagore, but they are both artists ; and she has no pedantry or monotony in her ; a touching pathos runs through every vein of her ideas and thoughts ; the young girls and youths weep over her love-passages, the lovers idealize them, and the ardent reformer takes lessons at her feet to fill him with enthusiasm and new ideas. There is a fire of passion in every passage and every thought and sentiment is enlivened by it. Her tenderness softens and sweetens but sustains and spiritualises you. She has the inexpressible grace and loveliness of her precursor, the lamented Miss Taru Dutta, and holds out promises of a deeper natures.

This world of Bengal furnishes infinite subjects for thought and reading, but the artist chooses the flower of things out of them, and recks not the rest. Consider all this, and you will appreciate the artistic talents of Miss Sen. Here is her picture of নীরব মাধুরী (Silent Beauty.)

ওরা কত কথা বলে,
ওরা কত করে কাজ ;
এ সদা নীরবে রহে,
আপনা দেখাতে লাজ ।

In this portrait all is beautiful and pleasant, the heart and senses enjoy it, the sentiments are delicate and deep ; no crudity or incongruity sullies with its excess the harmony of this ideal. The lines.

"এর দুঃখে আছে তীর, এর হর্ষ মানে বাঁধ" as well as "ওরা যাহে বাঁধা পড়ে, সে বাঁধন মানে না এ" are exquisite.

Take another piece, that of অনাহূত (unasked) : A child of beauty calls at a house where there is a gathering of friends. She was not asked to the party, she feels uncomfortable as an intruder, she blushes and begs to withdraw. The poet bursts into a frenzy, asks her to stop, to join the party, to augment their joy. She likens her to flowers and other gifts of nature which gladden without being asked, and she pleads that her beauty itself is an invitation.

দেখ মানময়ী, আরও কত কেহ
অনাহূত উপস্থিত,
শোনলো সুভগে, হৃদয়ের স্নেহ
আপন-আহ্বান-গীত

তোর আগমনে. দেখ দেখি, মণি,
আনন্দ পূরিত গেহে
দ্বিগুণিত কিনা হরষের ধ্বনি
আঁখি আদ্রীভূত স্নেহে ?

The poet is endowed with a great susceptibility to Beauty. Beauty is what she calls the reflection of the soul in the mirror of the body. "সৌন্দর্য আত্মার ছায়া শরীর দর্পণে।"

Elsewhere she sings, "beauty is soiled by human eye ; it blosoms for the Beauty of all Beauties and makes itself an offering to him.

বিধাতার আঁখি তরে ফুটিয়া ধরায়,
সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্য ঝরে সুন্দরের পায়।

Look at the following picture of a melancholy face cherished by the lover in the shrine of his heart :

বিষাদের ছায়া সুচারু আননে,
বিষাদের রেখা আঁখির কোলে,
কুসুমের শোভা বিজড়িত হাসি
তাতেও যেনরে বিষাদ খেলে।

* * * *

কি জানি কেমনে মৃদুল নয়ন
হৃদয়ে আমার বেঁধেছে ডোর ;
শত মন্দাকিনী দেছে ছুটাইয়া
মরুভূমি সম জীবনে মোর।

There is a pathos in these lines which is unrivalled in any poetry written in Bengali...."Her eyes have streamed forth hundred rivulets in this desert heart of mine." Has not Tennyson sung ?

"I strove against the stream and all in vain.
Let the great river take me to the main"

Similar passages expressing artistic beauty abound in the collection before us, and as we proceed we shall see that Miss Sen has touched every line of her poem with the delicate pencilling of an artist.

* * * * *

বিধাতা দেছেন প্রাণ
থাকি সদা ম্রিয়মান
শক্তি মরে ভীতির কবলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

It is not difficult to unravel the philosophy of Miss Sen's Poetry. Duty and love are her watch words and the noble lesson that she teaches to the patriot, reformer, lover and man is that we must live for others. She begins with a groping in the dark or the shadow (ছায়া) and her tender soul awakens with a search for the cause of things.

"নিবিড় বিপিনে হেথা হোথা
দেখা যায় আলোকের রেখা,
কে জানে কে কোথা হতে আসে ?
কারণের কে পেয়েছে দেখা ?

She seems to be contented at first with the few streaks of light that we receive in our dark path of the world,

"অন্ধকার কাননের মাঝে
যতটুকু আলো দেখা যায়,
এস সখে, লভি সেইটুকু,
এস, খেলা খেলিব হেথায়।

But the full splendour comes upon her by inspiration and she bursts with the faith and hope. That we are all children of light and we all burn dimly before the Great Sun of Lights.

"আমরা তো আলোকের শিশু
আলোকেতে কি অনন্ত মেলা
আলোকেতে স্বপ্ন জাগরণ
জীবন ও মরণের খেলা।"

The first thought that troubles her, is that man is destined for sufferings in this world.

"যাতনা-যাতনা-যাতনাই সার
নর ভাগ্যে সুখ কখনো নাই।"

But she recovers her spirit and boldly questions "What ! Is not the happiness meant for man ?" and the light comes to her and she sings :—

"We must sacrifice ourself for others, there is no happiness like that."

"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

* * * *

বিষাদ-বিষাদ-বিষাদ-বলিয়ে
কেনই কাঁদিবে জীবন ভরে
মানবের মন এত কি অসাড় !
এতই সহজে নুইয়া পড়ে ?"

The solution of the great problem of her life is thus vividly expressed in the concluding stanza of her poem সুখ (Happiness)

"আপনারে লয়ে বিরত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

In this she is treading in the foot steps of Tennyson and reaching to those of Browning. In treating of the trials, difficulties and dangers of the heart, she thinks with Tennyson that the most formidable temptation is to indulge in passion at the expense of duty, and and the maxim of life she pledges for it that she will live for others. But like Tennyson, she does not stop there. The enthusiasm of the artist carries her beyond herself to God ; and the intensity of her passion for the good of others creates in her an infinite aspiring which becomes the pledge and fitting initiation of a never-ending movement of advance Godward through the infinite future. An awe steals upon her. She is silent, she hears a voice.

বিশ্বযন্ত্রে কি মধুর গীত
অনুদিন হইছে ধ্বনিত,
পশিতেছে নীরব আত্মায় ;

সুখের মধুর স্বাদ করিতে মধুরতর
দুঃখের বিধান যাঁর, তাঁহারি স্নেহের কর
সংকট কণ্টকারণ্যে, মরুভূমে অন্ধকারে,
যাবে কিনা লয়ে মম দুরবল হাত ধরে ?"

So her ideal—লক্ষ্যতারা (The guiding star) does not allow her to stop at the landmark. She perpetually aims at the highest object of life, which being attained generates a new series of aspirations and new endeavours in her. Her ideal thereforc always recedes from her grasp and raics her from the attainable-the actual.

"দিগন্তের অন্তে গেলে পাব কি ওর।"

It is interesting however to notice that the poet does not lose her energy and enthusiasm in her struggle for the ideal. Her love of the good, her passion for the beautiful sustains her throughout. With the new year, she resuscitates, she buries her past and begins a new life with new aspirations. She is conscious that time is fleeting.

"সাগরে বুদ্বুদ মত উন্মত্ত বাসনা যত
হৃদয়ের আশাশত হৃদয়ে মিলায়ে,
আর দিন চলে যায়।

The past year did not fulfil her hopes, and she describes its passing away with a touch of pathos :

আপনার ভাবে আপনার মনে,
অশ্রুসিক্ত পদে চলিয়া যায়,
শোনেনা কাহারো রোদনের রব,
কারো মুখপানে ফিরে না চায।"

We are all drifting away : "Is there no one, She enquires, "to guide us in this helpless and miserable course ?" A voice within answers 'yes', and she begins the new year with the enthusiasm of a hero, under the clasping arm of the providence.

নূতন উদ্যমে নূতন আনন্দে
আজিতো গাহিব আশার গান
নূতন বরষে আজি নবব্রতে
আবার দীক্ষিত করিব প্রাণ।

The poet may grow weary and old, but she hopes to retain the fire of her spirit. When the body fails, the soul will sustain her, and she returns to the old burdent of her song that she has consecrated her

life for the good of others and that she lives and will for ever live for their weal and woe.

"এ দেহ ভঙ্গুর দেহ, বেঁকে যাক,-ভেঙ্গে যাক্।
সরল এ হস্তপদে বল যাক্-নাই যাক্,
খাটিতে না পারি যদি, দশের জীবন জীয়া,
অপরের সুখ দুঃখে সুখ দুঃখ মিশাইয়া
প্রেমব্রত করিব পালন।"

The patriotic poetry of Miss Sen which consists is three pieces, viz, বিসর্জন বা মা আমার (Renunciation), আশার স্বপন (Dreams of Hope) and রমণীর স্বর (Cry of woman) is inferior to Hem Chandra's and is in imitation of him. The last is an appeal for the oppressed coolie woman and in the first she repeats her now to live for others or for the country.

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে ?
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ, মা আমার, মা আমার।

The young poet when in the flowery field of love, is in her own element and is therefore at her best. In a poet, passion is a master faculty, the art of Composition, good taste, appreciation of truth depends upoon it ; one degree more of vehemence destroys the style which expresses it, changes the character which it produces and breaks the frame work in which it is enclosed. Here in lies the secret of Miss Sen's power, the source of her merit.

Let us take her poem চাহিনা (I don't want). It is delicious food for the soul. It reveals the fine and sympathetic nature of the poet, a heart full of ardent love, and for any particular individual, but for nature and human kind :

কার কাছে যাই কার কাছে গাই
আমার দুঃখের সুখের কথা

চাহিনা চাহিনা কতবার বলি
চাহিনা সুহৃদ চাহিনা সখা।

The poet would not exchange her love with any one. She will love herself, she will love nature-the flower and the sky, the sunny rays and moonbeams that play on water, but her kind and sympathetic nature acts like a load stone and draws her to man and society.

The first yearning in the path of love is for a friend or companion. Emerson says, "We talk of choosing our friends, but friends are self-elected." The like selects the like, the magnanimous the noble, the spiritual the sublime. In her dreamy path of love, the poet selects her fellow-passenger in spirit. It is not by his face that she knows him, but by his soul and heart.

তুমি আর স্বদেশী, স্বজন—
এজনমে কিম্বা জন্মান্তরে
আত্মায় আত্মায় পরিচয়
ছিল, তাই হেন মনে পড়ে।
"মুখ যার চিনে রাখি, চিনি না হৃদয় তার
অকথিত হৃদ্‌ভাষা সাধ্য নাহি বুঝাবার।"

Hereto the fire of love was smoking ; it now bursts into a flame.

"দূর হতে দেখে যারা দেখে তারা ধূমরাশি—
আগুন দেখিবে যদি, দেখ গো নিকটে আসি।"

The bruished heart however does not droop down under the heaviness of disappointment. A sublime hope, a spirit of renunciation sustains her and she presents us the charming picture of a love for the sake love only—the picture of Scott's Rebecca, of George Elliot's Seth Bede or of Aisha of Bankim Chandra's

"তোমারে আপনা দিয়া অতি তৃপ্ত হিয়া
আমি ত চাহি না প্রতিদান।
দূরে রও ঊর্দ্ধে রও, দেবী হয়ে পূজা লও
পূজিবার দেহ অধিকার॥"

The poet is a master of her art and she attempts to give a categorical description of what love is in her সে কি (what is it ?)

"আপনারে বিকাইয়া আপনাতে বাস,
আত্মার বিস্তার, ছিঁড়ি ধরণীর পাশ।
হৃদয় মাধুরী সেই পুণ্য তেজোময়
সে কি তোমাদের প্রেম ?"

মহাশ্বেতা (Mahasweta) and পুণ্ডরীক (Pundarik) are the largest and most finished pieces of our young poet. This time she takes the classical for her subject. She caresses the most tender and delicate feelings with care, hits upon the touching and curious incidents and makes them into pastorals or idyls. The consummate art with which

she points the half blushes, the youthful simplicity and passionate mood of feminine beauty marks out a prominent place for her in the gallery of poet artists. মহাশ্বেতা (Mahasweta) in one of those flowers which only bloom in a virgin imagination. The vase in which the flower appears is oriental, but the plant which produces it has had its sap from the best English Poetry—from Tennyson and Browning, from Shelley and Keats, Wordsworth and Burns.

Being a woman of sound bearing she knows in what true education consists. It is the decision of character "knowledge".

We have done. Want of space and time does not allow us to wander any longer among the flowery field, that this expert gardener, the new poet, has created for us. Our plain prose can give no idea of magnificent aspirations, the glowing thoughts, the brilliant scintillations of genius, the innumerable gem-like passages of pathos and the passionate rushes of language with which her collection is replete. We invite our reader to her pages and ask him to select according to his taste and liking. Let us however recapitulate what impressions she has made upon us : We associate her name with all that is beautiful, with all that is artistic, with all that gives the highest conceptions of life and duty. Her precursor is Rabindra Nath Tagore. Miss Sen takes the cue from him but condenses and pends up her ideas and sentiments. Miss Sen throws out the artificial like canker in a flower. She finds her objects in commonplace things, in an invitation, in a social incident or in a child and when she picks up one, her genius gives it a quite psychological character. Her motto is, 'Life is Duty and Love.' Duty is sweetened by the tenderness and affectionate ardour of her soul and her love is sustained by noble aspirations. She has in fact brought philosophy and life to Bengali poetry ; and in this consists the merit of her production, the secret of revolution that she inaugurates. She brings the same element to Bengali Literature that Cowper and Burns introduced in English poetry and that Shelly and Keats impassioned. She is the child of the age in which she lives—the child of New India, of New life and aspirations of the country. But with the soul of a genius which goes beyond the age, she gives indications of a noble heart that will purify the course present. and of an intellect that will mould the future.

Kedar Nath Roy M.

(গ)

প্রবাসী
পৌষ ১৩২০

মাল্য ও নির্ম্মাল্য

(সমালোচনা)

'আলো ও ছায়া' প্রণেত্রী পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক এক 'মাল্য' রচনা করিয়াছেন। নিবেদন করিয়াছেন বিধাতার শ্রীচরণে।

এক সূত্রে জন্ম মৃত্যু,
আনন্দ বেদন,
মালা গাঁথি শ্রীচরণে দাও।

ইহার সঙ্গে 'নির্ম্মাল্য'ও মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্গভাষায় 'আলো ও ছায়া'র স্থান অতুলনীয়। এমন কোন গ্রন্থ নাই, যাহা ইহার অভাব পূর্ণ করিতে পারে। অনেকে হয়ত বলিবেন—"নিতান্তই অতি-শয়োক্তি। যে দেশে রবীন্দ্রনাথ রহিয়াছেন সে দেশে কি এ কথা শোভা পায়?" এ প্রকার সন্দেহ কিন্তু ঠিক নহে। যে দেশে আমের জন্ম, সে দেশে কি আঙুরের অভাব হইতে পারে না? 'আলো ও ছায়া'র কবি আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই, অন্য কেহ তাহা দিতে পারেন নাই। 'পঞ্চক', 'সে কি'? প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য রত্ন। স্বীকার করি গ্রন্থে আলো অপেক্ষা ছায়াই অধিক। কিন্তু এই দুঃখের গীতিই গ্রন্থকে প্রিয়তর করিয়াছে।

"Our sweetest songs are those,
That tell of saddest thoughts."

মাল্যে ও নির্ম্মাল্যেও সেই পরিচিত স্বর, এখানেও সেই 'মধুর স্বপন', সেই 'আশার কথা' এখানেও

নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।

উভয় গ্রন্থের ভাষাই অতি সরল ও প্রাঞ্জল, অথচ গম্ভীর ও প্রাণস্পর্শী। পাঠকগণ এই নূতন গ্রন্থে অনেক নূতন ভাবের আবেশ দেখিবেন—আবার প্রাচীন ভাবেরও নূতন বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। আলো ও ছায়ার ভাব মাল্য ও নির্মাল্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে; একে অপরের প্রপূর্ত্তি। আলো ও ছায়ার কবি 'নবীন', মাল্য ও নির্মাল্যে কবি 'প্রবীণ'। আলো ও ছায়ার ভাব উদ্দাম, শক্তি উন্মাদিনী—মাল্য ও নির্মাল্যের কবিও ভাবে আবিষ্ট, তবে অধিকাংশ স্থলে অপেক্ষাকৃত সংযত ও প্রশান্ত। যাঁহারা আলো ও ছায়া পড়েন নাই, তাঁহারা ইহা পড়ুন। আর যাঁহারা পড়িয়াছেন—তাঁহাদিগকে মাল্য ও নির্মাল্য পড়িতে অনুরোধ করি। পড়িলেই বুঝিবেন—কিংপ্রকার সরল ও সরস ভাষায় কত উচ্চ ও গম্ভীর ভাব ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে ১১০টি কবিতা আছে, ইহার মধ্যে ৪৯টি নির্মাল্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখানে পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করা অসম্ভব। আমরা কেবল দুই একটা কবিতা লইয়া আলেচনা করিব।

(১)

প্রথম কবিতার নাম 'মাঙ্গলিক'। নিদারুণ শীত চলিয়া গেল; মধুমাস আসিয়া উপস্থিত। বসন্তের সুমঙ্গল গীত শুনিয়া কবি বলিতেছেন;

"যে দেশে আছিস্ তোরা সৌন্দর্যে্যর শেষ নাই,
জরা যথা শিশু যৌবন
পুরাতন নাহি সেথা নূতনের চির লীলা
জীবনের জনক মরণ।

একদেশে সূর্য্য অস্তমিত হয়, কিন্তু অপর দেশে সেই সূর্য্যেরই শৈশবাবস্থা, কিংবা প্রথম যৌবন। একদেশে সূর্য্যের মৃত্যু, অপর দেশে সেই সূর্য্যেরই জন্ম। উদ্ভিদ্-জগতেও ইহা সত্য। উদ্ভিদ্ জরাগ্রস্ত হইল; রহিয়া গেল বীজ, সেই বীজই নূতন উদ্ভিদের শৈশব অবস্থা। এক উদ্ভিদ্ মরিয়া গেল, তাহার স্থলে উৎপন্ন হইল নূতন বৃক্ষ। মৃত্যু জীবনের জনক হইল। কবি যে রাজ্যের কথা বলিতেছেন—সে রাজ্যে জরাই যৌবনের শৈশবাবস্থা এবং মরণই জীবনের জনক।

(২)

জীবনের আদর্শ বিষয়ে এই গ্রন্থে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে। "আশীর্ব্বাদ" নামক কবিতাতে কবি নব যুগের নব সাধনার দিকে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কবিতা রচিত হইয়াছে "অক্টোবর ১৮৯১"। কবির জন্ম ১২ই অক্টোবর। তাই মনে হয় নিজ জন্মদিন উপলক্ষ্যেই কবি জীবনের আদর্শ বিষয়ে, যে সত্য লাভ করিয়াছেন তাহাই এই কবিতাতে লিপিবন্ধ হইয়াছে। যে ব্যক্তি কেবল ভাবে "আমি কিছু নই", "আমি কিছু নই" কালে তাহার জীবনও তদ্রূপই হইয়া যায়। সেইজন্য কবি বলিতেছেন—

আপনার অযোগ্যতা আজিকার দিনে আর কর না স্মরণ
ভক্তিভরে আপনাতে প্রতিষ্ঠিত দেবতারে করগো বরণ।
আছে শক্তি তোমা মাঝে, করিও না অবহেলা দেবের সে দান
তোমারি ভিতর দিয়া তোমার বাহিরে তাহা সাধিবে কল্যাণ।

বর্ত্তমান যুগে আমরা কেবল আপনাকে লইয়া থাকিতে পারিতেছি না, জগতের কল্যাণ এবং আমাদের প্রত্যেকের কল্যাণ এক সূত্রে বাঁধা। জগতের সেবা আমাদের উন্নতিরই একটি অঙ্গ। তাই "আশীর্ব্বাদ" এই—

দিব্যদৃষ্টি দিব্যকণ্ঠ, অক্ষয় জীবন লয়ে, মন্দাকিনী সম
... ...
তোমা হতে ভস্মসার কত সগরের বংশ সমুদ্ধার হবে।

'কবির কামনা'তেও এই আদর্শ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কবি মাতা ও পিতার আদর্শে জীবন গঠন করিতে চাহিতেছেন ঃ—

"মায়ের বুকের শুভ্র ক্ষীর ধারা
যেই কণ্ঠে করিয়াছি পান,
সেই কণ্ঠে যেন গেয়ে যেতে পারি
অনিন্দ্য মধুর গান।"

জগতের সেবার দিকে কবির দৃষ্টি জাগ্রত। সেই পরম দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

হে সুন্দর তব অনুরাগে
দিব ঢেলে, যদি কাজে লাগে
বিন্দু বিন্দু জীবনের লোহ।

Browning বলিয়াছেন—

"All service ranks the same with God
.........there is no last, nor first."

এ কাজ ছোট, এ কাজ বড়—এভাবে কার্য্য করিলে চলিবে না। যাহা কর্ত্তব্য—তাহা কর্ত্তব্যই। আমাদের কবির 'আকাঙ্ক্ষা'তে এই ভাবই প্রকটিত হইয়াছে।

যাই করি, কিছু যেন করি ;
স্বপন না ভাল লাগে আর,
সাধিয়া একটি ক্ষুদ্র ব্রত
সাঙ্গ হোক জীবন আমার।

মানব। তুমি পৃথিবীতে আসিয়াছ কিছু করিবার জন্য—বৃথা কল্পনায় সময় নষ্ট করিবার জন্য নহে। তাই কবি আবার বলিতেছেন—

শুধু আয়োজন, কাজ হল কই ?
নাহি প্রবাসের দিন দুই বই, জাগ না।

নূতন জীবন, শকতি অক্ষয়
তা' না হলে কেন আসিবে।

(৩)

কবি 'আধঘুমে' যাহা বলিয়াছেন. তাহা আধঘুমের কথা নহে ; তাহা অধ্যাত্ম জগতের গভীর তত্ত্ব।

"একবার আমি যেন শুনেছিনু কার
আহ্বান সঙ্গীত—'এস'। খুলি গৃহদ্বার
... ...
তার দিক লক্ষ্য করি চিনে যাব পথ
তবেই সার্থক হবে সর্ব মনোরথ।

তাঁহারই বাণী শ্রবণ করিবার জন্য, তাহারই দর্শন লাভের জন্য কবি বসিয়া আছেন।

তুমি কত দূরে কোন্ সৌরপুরে
কোন্ দীর্ঘ পথ ধরি
আসিছ একেলা শূন্য সিন্ধুবেলা
আলোক তরঙ্গে ভরি।

যাঁহারা সত্যানুসন্ধানী, সত্য তাঁহাদিগের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করেন। প্রথম প্রথম বিজলীর ন্যায় দেখা দিয়া দূরে পলায়ন করিতে পারেন, কিন্তু কালে ধরা দিতেই হয়। কবি তাঁহার জন্য পাগল হইয়াছেন, তাঁহাকে জানিবার জন্য আত্মা ব্যাকুল।

সেই অজানারে হবে জানিতে
যে পলায় দূরে, তারে বিশ্বঘুরে
নিজপুরে হবে আনিতে।

তারে ভাল করে হবে জানিতে।

ইহা শুনিয়া কেহ বলে, 'তোমার দেখিবার ভুল হইয়াছে।' কেহ বলে, 'তুমি পাগল হইয়াছ'—কিন্তু কবি এসব কথা গ্রাহ্য করিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন—

নারি কা'রো কথা মানিতে
অজানারে হবে জানিতে।

তিনি মাঝে মাঝে দেখা দেন, কিন্তু আবার কোথায় চলিয়া যান। তখন জগৎ অন্ধকার।

ঘনীভূত অন্ধকারে ফেলে
ওগো তুমি কোথা গেলে চলে

মানুষ যাহা চায়, তাহা পায় না ; যাহা পায়, তাহাতে প্রাণের পিপাসা মিটে না।

যাহা পেতে চাই যাহা হাতে পাই
সদা ভিন্ন এ উভয়,
বঞ্চিত প্রকৃত, স্বপ্ন জাগরণ
কোথা পেলে এক হয় ?

মানুষ অপূর্ণ ; এই অপূর্ণ 'আমি' লইয়া কেহ তৃপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু এই অপূর্ণতার মধ্যেই পূর্ণতার বীজ নিহিত রহিয়াছে।

"আমি এ অতৃপ্ত অপূর্ণ আমি
আমার সম্পূর্ণ আমারে চাই,
... ...
তেমনি এ মোর মাঝারে তাহারে
নেহারি বর্ত্তমান।"

যিনি এই প্রকার অনুভব করেন, তিনি নির্জনে থাকিয়াও স্বপ্নমূর্ত্তি আঁকিতে পারেন না। জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে করিতেই তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন।

"এই চির ব্যাকুল হৃদয়
এই নিত্য মিলনের সাধ,

যতদিন চোখে দৃষ্টি থাকে
যতদিন চলে এ চরণ,
অনুসরি চলিব তাঁহাকে
আত্মা যারে করেছে বরণ।"

কবি যাহাকে বরণ করিয়াছেন, আজ তাহার আহ্বান শুনা যাইতেছে।

আসিতে বলিলে যদি
এই আমি আসিতেছি তবে,
বল দেখি কোন্ দেশে
কতদূর যাইবার হবে ?

কবি সংসারে পর পারে যাইবার জন্যও প্রস্তুত, তাই বলিতেছেন,

তোমার নিদেশ যাহা
তাহাই আমার মনোরথ।

সখা আজ প্রাণে উপস্থিত, হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। সে ভাষা কোথায়, যাহা দ্বারা সমুদয় হৃদয়খানা বুঝান যাইতে পারে ?

বুঝাইব কোন কথা দিয়া
এ আমার সমুদয় হিয়া
তোমারে যে করিয়াছি দান
কেমনে গাহিব আমি গান ?

মহাকবি সেক্সপীয়র বলিয়াছেন—

The lunatic, the lover, the poet
Are of imagination all compact.

যাহারা পাগল তাহারা একটি ভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা কবি, তাঁহারাও ভাবাবিষ্ট; কিন্তু এ ভাব উন্মার্গগামী নহে—ইহা সত্য সম্পর্ক জনিত। এই দেহভাণ্ড এত ভাব ধারণ করিতে পারে না। ভাবের তরঙ্গে দেহ বিচলিত হইয়া উঠে। লোকে বলে, এ যে একটা পাগল। আমাদের কবিও মাঝে মাঝে এইরূপ পাগল হন।

"আমার কি হ'ল ভাই
তোমাদের কি এমন হয়?
আমি যেন নহি আপনার
প্রাণে মোর অশান্তি সদাই।"

আমরা চাই নিজের সুখ, সত্য-স্বরূপ আমাদের নিজের করিয়া লইতে চাহেন। অনেক সময় ইহা আমাদের প্রীতিকর হয় না, তাঁহার উপস্থিতি অসহ্য বলিয়া মনে হয়।

নেহারি অনন্ত বর্তমান
অমৃত পূরিত ত্রিভুবন।

যখন সেই অন্তরাত্মা আমাদিগের প্রাণ অধিকার করিয়া বসেন, তখন অতীত-ভবিষ্যতের পার্থক্য ঘুচিয়া যায়। আমরা সমুদয়ই বর্তমান দেখি

সে শুভ মুহূর্ত্তে ভাই
স্বর্গ পানে দুটি আঁখি তুলে
বিধাতার যেন দেখা পাই।

ইনি এত কাছে অথচ সম্পূর্ণ মিলিতই বা হন না কেন, তিনি কেন ব্যবধান রাখেন?

কে মোরে বলিবে ভাই
কে সে জন সাথে ফিরে হেন,
... ...
আমাতে মিলিত নহে কেন?

কবি ইহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

তুমি কহ তোমারে সুধাই
ওহে মম নিত্য সহচর
... ...
কেন মাঝে রাখ এ অন্তর
ওগো মোর আমা হতে আমি।

প্রকৃতপক্ষে সেই অন্তরাত্মাকেই বলিতে পারি

ওগো মোর আমা হতে আমি।

আমি নিজে আমার তত আপনার নই, তিনি আমার যত আপনার।

(৪)

Browning, "The Statue and the Bust" নামক একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন। একজন রমণী নব-বিবাহিতা হইলেন, কিন্তু তিনি অনুরক্তা হইলেন Great Duke Ferdinand-এর প্রতি। Ferdinand-ও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। উভয়েরই ইচ্ছা পলায়ন করিয়া পরস্পর মিলিত হন। ইঁহারা কাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। আজ না কাল, কাল না পরশু এইভাবে সময় কাটিয়া গেল। ফল হইল এই যে, ইঁহাদের প্রেমাগ্নি অল্পে অল্পে নির্বাপিত হইয়া গেল। উভয়েই ভাবিতে লাগিলেন—তাহাদিগের সে প্রেম কি স্বপ্ন? কবি এজন্য ইহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন। কবির এই ভাব অনেকে পছন্দ করেন না—

উদ্দেশ্য ভাল হউক বা মন্দ হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, যদি সংকল্প করিয়া থাক সেই পথে অগ্রসর হও। আমাদের কবি ঠিক বিপরীত শিক্ষা দিতেছেন! দুইটি আত্মা প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে একজন অপরকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাহার পর বুঝিতে পারিলেন বড়ই ভুল হইয়াছে।

একদিকে প্রেমের আকর্ষণ, অন্যদিকে নীতির বন্ধন—এখন যান কোনদিকে?

নীতির বন্ধন জীর্ণ ছিঁড়িতে কতক্ষণ?
তবুও ছিঁড়িতে সরে না কেন মন।
কি জানি নীতির ডর কাহার ছুটে যায়
কর্ত্তব্য-কঠিন-বন্ধ কাহার টুটে যায়।

সুতরাং সংসারে মিলন সম্ভব নয়।

কর্ত্তব্য ও লোকশিক্ষার দিকে আমাদিগের কবির দৃষ্টি সর্বদাই জাগ্রত। 'আলো ও ছায়াতে'ও ঐ ভাব। শ্বেতকেতু পুণ্ডরীককে বলিতেছেন,—

"সযতনে সর্ব্ববিদ্যা শিখাইনু তোরে
... ...
ধরি কর্ত্তব্যের পথ চলিবে আপনি।"

প্রেম যদি কর্ত্তব্যের অন্তরায় হয়, প্রেমের বন্ধনও ছিন্ন করিতে হইবে। 'কর্ত্তব্যের অন্তরায়' নামক কবিতাতে কবি এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন—

কে তুমি দাঁড়ায়ে কর্ত্তব্যের পথে
সময় হরিছ মোর,
কে তুমি আমার জীবন ঘিরিয়া
জড়ালে স্নেহের ডোর।

প্রেম যখন কর্ত্তব্যের অন্তরায় হইতেছে, তখন প্রেমাস্পদের নিকট হইতে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। সেইজন্য শেষ কথা এই :—

তোমার মমতা অকল্যাণময়ী
তোমার প্রণয় ক্রূর,

যদি লয়ে যায় ভুলাইয়া পথ,
লয়ে যাবে কতদূর ?
এই স্বপ্নাবেশ রহিবার নয়,
চলে যাও হে নিষ্ঠুর।

জীবন-পথে অগ্রসর হইতে হইতে অনেক সময় ভুল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে এবং এজন্য আবার নূতন কর্ত্তব্যের ভাবও বহন করিতে হয়। এই সময় অনেকে ইতস্ততঃ করেন, মনে ভাবেন এ পথে থাকি, না ফিরিয়া যাই। কবি বলিতেছেন,—

যেদিকে চলিয়াছিলে, চল সেই দিক,
ইতস্ততঃ ক'র'না আবার
ভুল যদি করে থাক, ভুলে থাকা ঠিক
ভুল হতে ভুলেতে যাবার
নাহি কাজ।

'পরীক্ষা' নামক কবিতাতে কবি একজন পতিব্রতা নারীর চরিত্র অংকন করিয়াছেন।

বাক্য কার্য্যেই পরিণত হইল। Mrs. Browning-এর Rhyme of the Duchess May নামক একটি অতি সুন্দর কবিতা আছে। 'পরীক্ষা' ইহার অনুরূপ না হইলেও উভয়েরই আদর্শ এক।

'প্রতিভার প্রতি প্রেম' নামক কবিতাতেও নিঃস্বার্থ প্রেমের দৃষ্টান্ত। পত্নী প্রতিভাশালী স্বামীকে বলিতেছেন—

তুমি আলোকের মালা তুমি সকলের তরে
আমি ক্ষুদ্র শুধু আপনার
সকলে পশ্চাতে রাখি দাঁড়ায়ে সম্মুখে তব
ধন্য হব ভুল নাই তার,
... ...
কাছে থেকে দূরে গিয়া বাড়িবে আঁধার মোর
তুমি তত হইবে উজ্জ্বল।
সবার পশ্চাতে থাকি শুনিব তোমার জয়
সম্মুখের হর্ষ কোলাহল।

'নিরুপায়' নামক আর একটি কবিতা। স্বামী স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করে না, কার্য্যে ও বাক্যে ব্যবহার বড়ই রুক্ষ ও তীক্ষ্ন। কিন্তু স্ত্রী বলিতেছেন,

প্রিয়তম, কহ তুমি যাহা ইচ্ছা তব
যত রুক্ষ তীক্ষ্ন বাণী আছে গো ভাষায়
সব আনি হান প্রাণে, আমি সয়ে রব

তব অবিচার হতে বিচারের তরে।

অবোধ নারী জানে না প্রণয়ের প্রথম উচ্ছ্বাসে মানুষ কত কি বলিয়া থাকে। সেই প্রেমের আজ কত পরিবর্তন। এইসব কথা মনে করিয়া স্ত্রী আজ দুঃখ করিতেছে। কিন্তু তাহার প্রেম অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। তাই সে বলিতেছে—

আমি বারমাস
তোমার পিঞ্জরে পাখী, ওহে মহাভাস।

'পঙ্ক ও পঙ্কজ' নামক কবিতাও অতি সুন্দর। পঙ্ক হইতে পঙ্কজের জন্ম; পঙ্কেই ইহার মূল; উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ—পার্থক্যও কত। উপরি-উক্ত দৃষ্টান্ত দিয়া জননী বলিতেছেন—

জীবনের তব প্রথম অঙ্কুর উঠেছে আমারি দেহে
যতদিন আছ, জীবনের মূল গুপ্ত এ আঁধার গেহে।
... ...
মাটিতে জনমি, বিমল শরীরে রাখনি মাটির লেশ
তোমার গৌরব আমার গৌরব ভাবি আমি নির্বিশেষ।

'হিসাব' নামক কবিতাতে প্রেমের লাভ-লোকসানের হিসাব। প্রেমিক যুবক দরিদ্রের সন্তান, আর কুমারী ধনীর পুত্রী। 'প্রেমের লাগিয়া কেহ প্রেম লয় না'—এ কথা সে যুবক জানিত না। কুমারী সেই ভুল ভাঙ্গাইয়া দিল। যুবক সেই সমুদয় কথার উল্লেখ করিতেছেন—

তুমি বুঝাইলে আমার হয়েছে হিসাবে দারুণ ভ্রম,
প্রাচীন প্রাচীর উলংঘিতে নাহি প্রণয়ের পরাক্রম।

'হিসাব' পাঠ করিলে স্বভাবতই Barret Browning-এর Courtship of Lady Geraldine-এর কথা মনে পড়ে। সংসারে সব সময় মিলন সম্ভব নয়, 'হিসাবে'র কবিও প্রকার চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু Lady Geraldine কবি Bertram-এর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। Bertram-কে সম্বোধন করিয়া Lady বলিতেছেন—

"It shall be as I have sworn !
Very rich he is in virtues,
Very noble—noble Certes ;
And I shall not blush in knowing
That men can call him lowly born."

হিসাবে এখানেও প্রথমে ভুল হইয়াছিল। এই গ্রন্থে নরনারীর প্রেম-সংক্রান্ত কয়েকটি অতি সুন্দর কবিতা আছে। লুব্ধা, শৃঙ্খলিতা, বিস্মিতা, ভিখারিণী, কর না জিজ্ঞাসা ইত্যাদি কবিতা মনোমোহকর এবং হৃদয়স্পর্শী। হৃতাভিজ্ঞান পদধ্বনি ইত্যাদি কবিতাতে বিশেষ বিশেষত্ব আছে।

আমরা 'মাল্য ও নির্মাল্য' পাঠ করিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়াছি। কাব্যরসগ্রাহী পাঠকগণও যে পরিতৃপ্ত হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মহেশ চন্দ্র ঘোষ।

পরিশিষ্ট—৩

(প্রিয়ম্বদা দেবী)

(ক)

রেণু রচয়িত্রী

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী / গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়

বাংলা মাসিক পত্রিকাগুলির একটি কোণ আলো করিয়া বহুদিন হইতে রেণু রচয়িত্রীর স্বাক্ষরে ছোট ছোট কবিতা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। বোধহয়, এতদিনে তাঁহার নাম ও রচনা বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছে। সাময়িক সাহিত্যে কবিতা, বিশেষতঃ ছোট কবিতা এরূপ সমাদৃত হওয়া অল্প কবিরই ভাগ্যে জোটে ; কবিতাগুলির নিম্নে নিম্নে তাঁহার নামের স্বাক্ষর না থাকিলেও লেখিকাকে চিনিতে কষ্ট হয় না।

রেণুর কবিতাগুলির বিশেষত্ব তাহার ক্ষুদ্রত্ব। কবিতাগুলি সুন্দরীর অশ্রু-বিন্দুর মত করুণ। বালকের হাসিবিম্বের মত মধুর—বিধবার আশীর্বাদভরা দৃষ্টির মত স্নিগ্ধ। ছোট হইলেও, তাই সহজেই হৃদয় স্পর্শ করিয়া যায়। সেই সহজ সুরের ঝংকারের মত, ভোরের অসমাপ্ত স্বপ্নের মত কবিতাগুলির রেশ হৃদয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জাগিয়া থাকে। যেন একটু অসমাপ্তি, যেন একটু সুদূরে অতৃপ্তি। যেন একটু নিষ্ফল ব্যাকুলতা কবিতাগুলির 'জান'।

রেণু পরস্পর বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিসমষ্টি হইলেও সুন্দর মালিকার মত ; একটি সূক্ষ্ম সূত্রের দ্বারা সুনিপুণভাবে গ্রথিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রচ্ছন্ন একটি কথা হাজার সুরের বিচিত্র ছন্দ লীলার অন্তরাল দিয়া হিল্লোলিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম শরতে জলস্থল আকাশে, লতাপাতায় মুকুলে, পুষ্পপল্লবে নবোদ্ভিন্ন শস্য-শীর্ষে বর্ষাধৌত দূর্বাক্ষেত্রে যেমন একই বৃহৎ আনন্দের সুর হাজার রাগিণীতে ধ্বনিত হইতে থাকে—গীত গন্ধ বর্ণ শোভায় যেমন একই পুলকতরঙ্গ নানান ছন্দে ছড়াইয়া পড়ে, রেণুর ছোট ছোট কবিতাগুলির মধ্যে তেমনই যেন একটি কথারই সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। বিশেষত্ব ও নৈপুণ্য এই, কোথাও স্খলন বা অসংযম নাই।

পূতসংযম এবং তপস্যার ভাব সমস্ত গানগুলিতে কেমন একটি মহিমা, অনাড়ম্বর ঐশ্বর্য, কোমল মাধুর্য আনিয়া দিয়াছে—অথচ লেখিকার কল্পনা শেলী অপেক্ষা ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত, জগতে সমস্ত বন্ধন বর্জন করে নাই। ধূলামাটির যা-কিছু, দুদিনের যা-কিছু, সাধারণ ও প্রতিদিনের যা-কিছু, কবি সেগুলিকে এমনি একটি দিব্য আনন্দের বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন যে, সেগুলির মধ্যে

স্বর্গের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। হাসি, অশ্রু, ব্যাকুলতা, বিরহ-ব্যথা, প্রেমের বেদন, অতি পুরাতন এই কটি ইষ্টক-প্রস্তরে কবি চিরসুন্দর মন্দির গাঁথিয়া তাঁহার দেবতাকে তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া পাশের যাত্রিগণ তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত নিভৃত হৃদয়-দেবতার বন্দনা গানের অস্পষ্ট মধুর ঝংকার শ্রবণে পুলকিত হইয়া যেন তাঁহারি কণ্ঠের সহিত সুর মিলাইয়া গাহিতে ব্যাকুল হইয়া ওঠে।

রেণু একখানি In memorium বলিলে কবির প্রতি অবিচার করা হয় কিনা জানি না, তবে নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে নিশ্চয়ই দু'খানির মধ্যে একটি সুমধুর সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। দু'খানিরই উদ্দেশ্য একই। যে ব্যথার অসহ্য তীব্রতায় হৃদয়বীণার তন্ত্রীগুলি ছিঁড়িয়া যায়, যে ব্যথায় পরিদৃশ্যমান বাহিরের কিছুই দেখা যায় না—অথচ রুদ্ধ অন্তরের দ্বার আপনাআপনি খুলিয়া যায়, রেণু সেই ব্যথারই গান, যে ব্যথায় দৃশ্য ও অদৃশ্য এক হইয়া যায়, স্বর্গকে মর্ত্যের কাছাকাছি আনিয়া দেয়, 'রেণু' সেই দিব্য ব্যথার, অমর শোকের গান।

হইতে পারে In memorium বিদেশী মহাকবির স্বর্গীয় বন্ধুর সূক্ষ্ম কারু-কার্যখচিত সমাধিস্তম্ভ আর 'রেণু' একটি দুর্বলা বাঙালী নারীর কম্পিত হস্তরচিত ক্ষুদ্র দেবমন্দির। বিলাপ দুখানিরই প্রাণ, এ বিলাপ বিচ্ছেদ-ব্যথার নামান্তর মাত্র নহে; এ বিলাপ অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে দেবতার প্রতি আত্ম-সমর্পণ হেতু ব্যাকুলতা, বিপুল নিখিলের তোরণদ্বার রুদ্ধ করিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়-প্রকোষ্ঠে দেবতার জন্য ভক্তের বিরামহীন বন্দনা।

মোটের উপর অসংকোচে বলিতে পারা যায়, 'রেণু' বঙ্গভাষার একখানি উচ্চ-শ্রেণীর কবিতাগ্রন্থ। বিচ্ছিন্নভাবে না দেখিয়া সমগ্রভাবে পাঠ করিলে গ্রন্থখানির মাধুর্য ও মূল্য সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

* * * * *

রবীন্দ্রনাথ ১২৮ নং পত্রে প্রিয়নাথ সেনকে লিখছেন, "তোমার লেখনী থেকে রেণু গ্রন্থের সমালোচনা পাবার জন্যে তার লেখিকা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এর থেকে বুঝতে পারবে তোমার সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে।"

১২৯ নং পত্রে লিখছেন,

"আজ রেণু রচয়িত্রীর একখানি চিঠি পেয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন তাঁর লেখা তোমার কেমন লাগলো। আমি উত্তর দিয়েছি তোমার ভাল লাগবে—এ সংবাদটা আমি কোথা থেকে পেলুম সে প্রশ্ন তিনি জিজ্ঞাসা করবার পূর্বে বোধহয় তোমার একটা অভিমত তাঁকে জানাতে পারব। ইতি

১৪ই আশ্বিন (১৩০৭)

প্রিয়নাথ সেনের উত্তর ঃ

"তোমার প্রেরিত 'রেণু' পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা পাঠ করিবার খুব ইচ্ছা ছিল। বইখানি পাইয়া সে ইচ্ছা মিটিবে—মিটিকে বলিবার অর্থ এই যে এখনও পড়িবার অবসর পাই নাই।"

" 'রেণু' সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশ্য সমালোচনায় বলিবার ইচ্ছা আছে—কিন্তু তোমাকে যখন লেখিকা আমার মত জানিবার জন্য উত্যক্ত করিয়াছেন, তখন মনের কথা আর চাপিয়া রাখিতে পারি না। তোমাকে সত্য বলিতে কি? আমাদের কোন স্ত্রী-কবিরই লেখায় আমি কবিত্বের স্বচ্ছ, সুন্দর বিকাশ দেখি নাই—মৌলিকতা ত নাই-ই। কেহই ঠিক সুরটি লাগাইতে পারেন নাই—কাঁচা ভাষা—অপরিণত ভাব—কাব্যকলার মধ্যে আমরা যে পূর্ণতা—উচ্ছ্বাসের সঙ্গে যে সংযম দেখিতে চাই তাহা কাহারও নাই। আর সংযম বা কিসে আশা করা যাইতে পারে—যাহার দুরন্ত উচ্ছ্বাস আছে তাহারই তো সংযম চাই—এদের কাহারও ভিতর আমি ভাব বা অনুভূতির গভীরতা—আবেগ বা আবর্ত্ত দেখি নাই—নিজের করিয়া কিছু দেখিবার ক্ষমতা নাই—সুতরাং সংযমের পরিবর্তে ভাব-দরিদ্র কবিত্বহীন ভাষা কেবল চীৎকার করিয়া মরিতেছে। 'রেণু'র লেখিকা কেবলমাত্র একজন স্ত্রী-কবি যাঁহার দেখিবার চক্ষু আছে—বলিবার কথা আছে—সুতরাং তিনি আমাদের যাহা দিতেছেন তাহা উচ্চ দরের হোক বা না হোক তিনিই কেবল তাহা দিতে পারেন—অপরে পারেন না। তাঁর ভাষাটি বড়ই সুন্দর এবং বেশ পরিণত। তিনি পরে আমাদের আরও বিচিত্র এবং উচ্চশ্রেণীর কবিতা দিতে পারেন—কিন্তু তাঁহার ভাষার ভবিষ্যতে আর যে কি উৎকর্ষ হইতে পারে—আমি ভাবিতে পারিতেছি না। চিরবিস্ময় নামক Sonnet-টি আমার মতে যে কোন প্রথম শ্রেণীর কবির উপযুক্ত। 'রেণু' সমালোচনার জন্য আমি অপর স্ত্রী-কবিদের কবিতা পাঠ করিতেছি—প্রমথবাবুর কাছ থেকে 'আলো ও ছায়া' আনিয়াছি—কিন্তু নিজেকে আর শাস্তি দিতে পারি না—বইখানা পড়ে ওঠা আমার অসাধ্য। 'রেণু'র লেখিকা বাস্তবিক কবি—অনেক বঙ্গীয় পুরুষ কবির উপরে তাঁহার আসন—স্ত্রী-কবিদের তো কথাই নাই—তিনি ছাড়া আর প্রকৃত স্ত্রী-কবিই বা কই? কিন্তু হে পুরুষসিংহ, এ কথাটা আমার সমালোচনায় প্রকাশ্যে বলিলে আমার জীবন সংশয় হয়ে উঠবে। বাঘের হাত থেকে পরিত্রাণ আছে কিন্তু বাঘিনী? —সমস্ত বিদুষী সীমন্তিনীরা আমাকে তাঁহাদের খরলোচনের শরাঘাতে খরতর বচন-বাণে ধরা-ছাড়া করিয়া দিবে—তখন তোমার কবিতা পাঠেও সান্ত্বনা পাব না এবং তুমি বোধহয় একটা farce-এর মশলা সংগ্রহ হল দেখে বন্ধুর নির্য্যাতনে বেশ একহাত হেসে উঠবে।

(খ)

রেণু !

সাহিত্য—অগ্রহায়ণ, ১৩০৭

কাব্যখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ কবিতাই চতুর্দ্দশ-পদী—সনেটজাতীয়। বঙ্গের কাব্যামোদী বিদ্বজ্জন রচয়িত্রীর প্রতিভার সহিত একেবারে অপরিচিত নন। মাসিক পত্রে তাঁহার রচনা সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়; কিন্তু এই প্রচারিত পুস্তকখানি পাইয়া তাঁহারা যে তদীয় প্রতিভার সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার যথেষ্ট অবসর ও সুযোগ লাভ করিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং অপরিমিত আনন্দের বিষয় এই যে, "রেণু" এই বিনয়-ব্যবহৃত নামটি সার মাধুর্য্যে ও প্রকৃতি সৌন্দর্য্যে, আপনার দীন অর্থ সর্ব্বপ্রকার অন্যথা করিয়াছে। বস্তুত "রেণু" পুষ্পপরাগ—সুকোমল ও সৌরভময়—তুচ্ছ ধূলি নহে।

ছন্দোময়ী শব্দমালিকায় যদি ভাব-সৌরভ না থাকে, যদি তাহাতে একতম রসেরও আস্বাদ না পাই, চিত্তরঞ্জিনী সৌন্দর্য্য সৃষ্টি তাহার সামর্থ্যের বহির্ভূত হইলে, তাহা বাস্তবপক্ষে ব্যর্থ। অবশ্য, সুনিপুণ শব্দ সমাবেশ রচনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, যথাস্থানে যথাযোগ্য কথাটির প্রয়োগ শ্রেষ্ঠ 'রচনা-রসিক'-গণেরই সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু ললিত কোমল শব্দবৃন্দের অন্তরালে ভাব বা রস না থাকিলে রচনা নিষ্ফল, প্রাণহীন, শুষ্ক। সুন্দরতম মানবদেহ যদি মনোহীন বা জীবন-বিরহিত হয়, তাহা হইলে উহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্যরাশি বৃথা নয় কি?

ইহা অতি পুরাতন ও সুধীসম্মত কথা। কিন্তু আজি-কালিকার কবিতায় শব্দ-ঝঙ্কারই বেশী শুনিতে পাই। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে অনেকেই রবিবাবুর শব্দ-সম্পদের সুষমায় মুগ্ধ হইয়া, কেবলমাত্র ভাল ভাল শব্দ গাঁথিয়া মিলাইয়া জোর করিয়া কবি হয়েন। কি বিড়ম্বনা! যদি তাঁহারা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে রবিবাবুর অসাধারণ ভাব-বৈচিত্র্য ও নবরসোদ্ভাবন শক্তির কণামাত্র অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিতেন! তাঁহাদের লেখা পাঠককে তন্ময় করে না, কারণ তাঁহারা স্বয়ং বিষয়-বিশেষের শোভায় বা কল্পনার ধ্যানে পরমানন্দ পাইয়া তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়েন না। এরূপ চেষ্টা-রচিত রচনায় ছন্দভাষা থাকিতে পারে, কবিত্ব থাকে না। সুখের বিষয় বক্ষ্যমান গ্রন্থে, সুনির্ব্বাচিত শব্দের ও বিবিধ প্রকার মনোহর ভাবের একত্র সন্নিবেশ হইয়াছে। ভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইয়া ভাষা অনাদৃত হয় নাই এবং ভাষাকে লইয়া নাড়িতে-চাড়িতে লেখিকা ভাবকে হারান নাই।

আমাদের অন্তঃকরণে সময়ে সময়ে এমন কতকগুলি সুখ বা বেদনা আনন্দ বা অবসাদ, তৃপ্তি বা অভাব অনুভব করি, যাহার নাগাল কোন ভাষাই সহজে পায় না, হৃদয় নিজেই সেই বিচিত্র সুখানন্দের বা ব্যথাবসাদের সত্তাটুকু আপনার আয়ত্ত করিতে পারে না—তাহা grasp করিতে পারে না। হৃদয় যখন এইরূপ সুখে অভিভূত, বা বেদনায় নিপীড়িত, তখন আমরা বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করিতে অক্ষম হইয়া পড়ি, আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলি। কবির তখন লিখিবার সময় নয়। তারপর, যখন পুনর্বার আপনাদিগকে ফিরিয়া পাওয়া যায়, প্রকৃত কবি প্রতিভাবলে তখন সেই অনুভূতিকে ভাষায় মূর্ত্তিমতী করেন। যে বিচিত্র সুখদুঃখ বাসনা আমাদের চিরপরিচিত, অথচ সম্যক ধারণার অতীত, যাহা আমরা মনে করি, ভাষার বন্ধনে ধরা দিবে না, কবি তাহাই সোনার ছন্দে বাঁধিয়া পাঠকের নয়ন সম্মুখে আনিয়া দেন। ইহাতে যে নিপুণতা ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, রেণু-রচয়িত্রীর তাহা যথেষ্ট আছে। পাঠক নিম্নের কবিতাটি পড়িলেই কবির ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন—

প্রত্যাগমন

একদা বাদল ঘেরা শ্রাবণ-নিশীথে,
আজন্মের ব্যর্থ সাধ বাঁধিয়া আঁচলে
গিয়েছিনু একাকিনী বিসর্জ্জন দিতে
পরিপূর্ণা জাহ্নবীর সর্বনাশা জলে।
অজানা-আঁধার পথে, দুঃস্বপ্ন বিহ্বল
কম্পিত হৃদয় শেষে উত্তরিনু আসি
জনশূন্য নদীতটে, খুলিয়া অঞ্চল
যেমনি ফেলিতে যাব, বিদ্যুতের হাসি
উঠিল চমকি, আমি দেখিনু চাহিয়া
সব ব্যথা সব দুঃখ মিলিয়া মিশিয়া
এঁকেছে উজ্জ্বল করি তোমারি আনন
ফেলিতে নারিনু তাই, সজল নয়ন,
তাহারে চাপিয়া ধরি বক্ষের উপরে,
শ্রান্তপদে সিক্ত দেহে ফিরে এনু ঘরে।

এই কবিতাটি ইতিপূর্বে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। অধুনা বহুতর মাসিকে অনেক কবিতা প্রচারিত হইতেছে, অগণ্য নূতন পুস্তকেরও প্রকাশ হইতেছে। অধিকাংশই পড়িবার সুযোগ পাই, কিন্তু প্রায় সবগুলিই পরক্ষণে চিত্তগৃহ হইতে 'বেমালুম' অপসৃত হয়। এই কবিতাটির সৌন্দর্যরেখা কিন্তু এতদিনেও চিত্তপট হইতে মুছিয়া যায় নাই; ইহার সুরের রেশ তদবধি কানে

বাজিতেছে। আজ পুনরায় উহা পড়িয়া পূর্ববৎ নিবিড় প্রীতি অনুভব করিতেছি। কবি স্বয়ং যেমন তন্ময়চিত্তে লিখিয়াছিলেন, পাঠক তেমনই উহা পড়িয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। কবিতাটি পাঠকের মনে একটি সুন্দর স্থায়ীভাব রাখিয়া যায়। শব্দগুলি কেমন যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট—যেখানে যে বিশেষণটি বসাইলে জিনিসটি ক্ষিপ্রগতিতে পাঠকের মনোরাজ্যে প্রবেশ করে, লেখিকা অনায়াস-নৈপুণ্য সহকারে তাহা বসাইয়াছেন। পক্ষান্তরে ভাবটি মৌলিক, রচয়িত্রীর সৌন্দর্য-সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে।

বহু চেষ্টা করিয়া, বহু বাক্য ব্যয় করিয়া সাধারণে যে মনের কথাটি ব্যক্ত করিতে না পারে, ক্ষমতাশালী কবি, তাহা সহজেই স্বল্পকথায় প্রকাশ করিতে সমর্থ। লেখিকা এ বিষয়ে বেশ সফল হইয়াছেন। তিনি দুটি মাত্র ছত্রে আপনার মনের ভাব কি সুন্দর তুলনামূলক ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

সম্পূর্ণ রাগিণী তুমি, শুধু ক্ষণতরে
আমি তারি মাঝখানে মূর্ছনার মায়া।

বস্তুত ভাব ও ভাষা উভয়ে মিলিয়া যে অলৌকিক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে, তাহাতে হৃদয়বান জনকে মোহিত হইতেই হইবে। ইঁহার কাব্যখানির দ্বারা যে স্নিগ্ধতা, যে কারুণ্য, যে অনাবিল স্ত্রীজনোচিত কোমলতা সঞ্চারিত হয়, তাহা বস্তুতই শান্তিপ্রদায়ক প্রাণস্পর্শী এবং বিচিত্র সুখবেদনার উৎপাদক। কবিতার একটি যে প্রধান গুণ—suggestiveness, তাহাও রেণুতে যথেষ্ট আছে।

রচনাবিশেষে কতকগুলি শুদ্ধ আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করিলাম বলিয়া যে ভাবকে স্ফুটতর করিবার জন্য তাহাদের সহিত কথিত শব্দ নিবিষ্ট করিতে পাইব না—এই বিধি মানিয়া চলিতে অক্ষম। যে কোন রসাত্মক শব্দ অন্তরের ভাবটি ব্যক্ত করিতে পারে, তাহাই সংস্কৃত লিখিত কথার সহিত একত্র বসিবার সর্ব্বথা-যোগ্য—প্রচলিত কথিত শব্দ হইলেই বা। লেখিকা যে বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয় না রাখিয়া এইরূপে শব্দাবলী সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কবিতার ভাব বিশদ হইয়া উঠিয়াছে—ভাষা অন্তরের অনুভূতিময় মৌনবাণীকে পরিস্ফুট করিয়াছে। বঙ্গের মহাত্মা কবি ৺বিহারীলাল চক্রবর্তী ইহা ঠিক বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার রচনা এমন মনোগ্রাহিণী—ভাবের আভিজাত্য তাঁহার লেখায় তো আছেই।

একটিমাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি বলিয়া কেহ ভাবিবেন না, কেবলমাত্র একটিই উল্লেখযোগ্য। "রেণু"র অধিকাংশ কবিতাই এইরূপ সুন্দর। কল্পনার মায়াময় করস্পর্শে কবিতাগুলি সঞ্জীবিত লেখিকার ভাষায় উৎফুল্ল; ইহারা পাঠকের হৃদয়কে প্রীতি উৎসারিত করিতেই যেন উন্মুখ। 'ম্লানিমা', 'প্রেমের অবনতি', 'মমতা', 'অন্বেষণ', 'অবিচার', 'আশঙ্কা', 'তুমি ও আমি', 'প্রেম কোজাগর', 'চির-বিস্ময়', 'স্মৃতিলোপ', 'লজ্জা' প্রভৃতি কবিতাগুলি সুধাসিক্ত। কাব্যানুরাগী সহৃদয় পাঠকবৃন্দ এই অমৃত উপভোগ করিতে অবহেলা করিবেন না।

সমস্ত বইখানিতেই যে চিত্তাকর্ষণী প্রতিভার বিকাশ দৃষ্ট হইল, তাহা শান্ত, সরল, সংযত। সুরটি যথার্থই অঙ্গনাজনসুলভ। কবিতাগুলির আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, প্রায় সব ক'টিই মানসিক বেদনাব্যঞ্জক, একান্ত করুণরসাত্মক, পাঠকের মন বিগলিত করে! পড়িয়া মনে হয়, কবি যেন প্রিয়জনবিরহে 'ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং' দেখিতেছেন। যেটি দেখিতেছেন, যাহা বলিতেছেন, তাহাতেই সেই মুখ, সেই হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে অথচ ভিন্ন ভিন্ন বেশে এবং অলৌকিক কিন্তু পরিচিত রূপোচ্চয় সংঘাতে নিরুপম। তিনি 'যে নামে, যে ছলে' প্রাণের বীণাটি বাজাইতে গিয়াছেন, আপনার দুর্লভ দর্শনেরই 'সাড়া সারা ভুবনে' পাইয়াছেন। তচ্চিন্তা-মগ্ন হইয়া নিজের তুলিটি ধরিয়া যেমন একখানি চিত্র আঁকিতে গিয়াছেন, অমনি তাহাতে তাঁহারই মূর্ত্তি,

> সহসা জাগিয়া ওঠে বিদ্যুৎ আকারে
> বিস্তারি' সকল বিশ্বে, জীবনের পরে
> অসীম সুন্দর শোভা—।

করুণাবিমুখ মৃত্যু যে সুমহান্ ক্ষতি করিল, বঙ্গ গৃহলক্ষ্মী তজ্জন্য ঈশ্বরে অবিশ্বাস না করিয়া, কিংবা অভিশপ্ত জীবনের প্রাণান্তকারী বিষ-কণিকাগুলি দেব-লোকোদ্দেশে বা মর্ত্ত্যগৃহে না ছড়াইয়া, সকরুণকণ্ঠে আপনার হৃদয়ের নিকট বা অদৃশ্য বপু হৃদয়াধিকের নিকট তাহার গুরুত্ব প্রশ্নের উত্তরে ভাবে ভাষায় জানাইয়াছেন। দুর্ব্বল হৃদয়ের সেণ্টিমেণ্টালিটি নাই—আছে শুধু নম্র-গভীর ভালবাসার পরিচয়, হারাণ প্রেমের জন্য সুকঠোর তপোশ্চরণ স্বীকার। এই কাতর সুরের জন্য 'রেণু' সমধিক মনোজ্ঞ হইয়াছে। প্রমথবাবু 'গীতিকা'য় গাহিয়াছেন,

> "যে গানটি লাগে কানে অতি সুমধুর
> তারি মাঝে বাজে কোন অশ্রুসিক্ত সুর।"

ইহা বড়ই সত্য। ভীরু কোমল-স্বভাব বাঙালী বলিয়া যে 'অশ্রুসিক্ত সুর' ভালবাসি তাহা নয়; সহৃদয় মানব মাত্রেরই নিকট অশ্রুসিক্ত সুর মধুরতম। একথা শুরী পাশ্চাত্যেরাও স্বীকার করেন।

ইহাতে বীরাঙ্গনা অস্ত্র-ঝঞ্চনাধ্বনি বা অম্বরবিদারী স্বদেশ-হিতৈষণার চীৎকার নাই সত্য—নাই বা থাকিল। প্রেম যদি বর্ণে-চিত্রে-ছন্দে-গীতে-কণ্ঠে-যন্ত্রে নবনব মোহিনী মূর্ত্তি, অলোক সামান্য কলাশ্রী, বিচিত্র লাবণ্যপ্রভা লইয়া, মানস কাননে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠে, দিকবিদিকে গন্ধামোদ বিকীর্ণ করে; মানবকে পঙ্কিল পার্থিব চিন্তা হইতে আলোকময় মহান্-ভাবরাজ্যে লইয়া যায়—তাহা হইলেই জীবনের মুহূর্তগুলি স্পৃহণীয়, মধুময়। প্রেম সকলই দিতে পারে, জাতীয় উদ্দীপনা দিতে কি অসমর্থ? যদি বাঙ্গালী জাগে, প্রেম মাত্রেই জাগিবে। বক্তৃতার কশাঘাতে বা কলমের খোঁচায় 'more than dead' এ জাতিট

জাগিবে কি? অতএব হে মাতৃভূমি সেবাব্রত আর্য্য। এ কাব্যে জাতীয় সঙ্গীত রব নাই বলিয়া ঘৃণা করিও না; খুঁজিয়া দেখ, উজ্জ্বলতম মহার্ঘ্যরত্ন ইহার ভিতর রহিয়াছে। আজকাল কতকগুলি Puritan বঙ্গীয় "প্রেম" নামে প্রেমাত্মক কবিতায় শিহরিয়া উঠেন; তাঁহারা চান, গম্ভীরনাদী 'জাতীয় সঙ্গীত', 'বীররসাত্মক কবিতা দুন্দুভি' ইত্যাদি। তাঁহারা যেন এসকল কবিতা পড়িয়া লেখকগণকে অনুগ্রহ না করেন।

প্রেম আর লালসা এক নহে love এবং lust দুটি বিভিন্ন জিনিস—উভয়ের মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান রহিয়াছে তাহু অনেকে ভুলিয়া যান, বা দেখিতে পান না। প্রেমের বিরাট স্বরূপ সাধারণের সংকীর্ণ ভোগাবিল জীবনে সহজে প্রতিভাত হয় না। 'রেণু' রচয়িত্রী যে শুদ্ধ উদার সুনিপুণ ভাষায় প্রেমের মহিমাময় প্রকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না,—

ব্যর্থ চেষ্টা।

শুধু চতুর্দ্দশ পদে বাখানিতে চাই
যে প্রেমের অন্ত নাই, নাহি যার শেষ,
প্রতি ছত্রে, প্রতি ছন্দে, তাই বাধা পাই,
তাই মোর কবিতায় হেন দীন বেশ;
এ যেন মুকুর তলে ব্রহ্মাণ্ডের ছায়া,
অসীমেরে টেনে আনা সীমার মাঝারে,
নিত্য নব রূপময়ী প্রকৃতির মায়া
গড়িয়া রাখিতে চাই মর্ম্মর আকারে।

নির্ঘণ্ট